

ষষ্ঠ অধ্যায়

নাট্যবিশ্লেষক ও প্রাবন্ধিক : শম্ভু মিত্র

শম্ভু মিত্র শুধুমাত্র নাট্যকার, নট, নাট্য পরিচালক, চলচ্চিত্রাভিনেতাই নন, একজন নাট্যবিষয়ক প্রাবন্ধিক। বাংলা নাট্যক্ষেত্রে তিনি যেমন নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান রচনা করেছিলেন ঠিক তেমনি বাংলা নাট্যজগৎ ও নাট্যব্যক্তিত্ব বিষয়ে যে প্রবন্ধগুলি তিনি রচনা করেছেন তা বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে যুগান্তকারী সৃষ্টি, তাঁর রচিত বাংলা নাট্য জগৎ ও নাট্যব্যক্তিত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ গ্রন্থ গুলি হল—

।। এক।। অভিনয়-নাটক-মঞ্চ (১৯৫৭ খ্রীঃ)

।। দুই।। সম্মার্গ সপর্যা (১৯৯০ দ্বিতীয় সংস্করণ)

।। তিন।। কাকে বলে নাট্যকলা (১৯৯১ খ্রীঃ)

।। এক।। অভিনয়-নাটক-মঞ্চ (১৯৫৭ খ্রীঃ)

নব নাট্য আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতকে সহজভাবে বোঝার জন্য প্রাবন্ধিক শম্ভু মিত্র যুদ্ধোত্তর যুগের লেখা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে ‘অভিনয়-নাটক-মঞ্চ’ প্রবন্ধ গ্রন্থটি রচনা করেছেন। তিনি এই প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশের পেছনে খালেদ চৌধুরীর অবদান স্বীকার করে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বলেছেন—‘প্রবন্ধের মধ্যে এমন অনেক কথা আছে যা তাঁরই আলোচনা থেকে আহরণ করা।’ তিনি এই গ্রন্থটি প্রিয় জ্যোতিনাথদাকে উৎসর্গ করেছেন।

‘অভিনয়-নাটক-মঞ্চ’ গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৬৪ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে। অর্থাৎ ১৯৫৭ সালের শরৎকালে। সম্ভবত এই প্রবন্ধ গ্রন্থটিই তাঁর নাটক ও নাট্যসম্বন্ধীয় প্রথম সংকলিত রচনা। এই গ্রন্থটি পুনর্বীর ছাপতে আগ্রহী হয়েছিল সপ্তর্ষি প্রকাশন। গ্রন্থটি যাকে উৎসর্গ করেছিল সেই জ্যোতিনাথ ঘোষের সঙ্গে ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে শম্ভু মিত্রের সম্বন্ধ ছিল আমৃত্যু অটুট। শম্ভু মিত্র এই জ্যোতিনাথ ঘোষের ল্যান্স ডাউন রোডের বাড়ি থেকেই নাট্যজগতে পদার্পন করেন।

মূল গ্রন্থটি হারিয়ে যাওয়ায় শ্রীমতী সুমিতা সামান্ত লেখাগুলির ফটোকপি করে শম্ভু মিত্রের

কন্যা শাঁওলি মিত্রের কাছে পাঠিয়ে দেন। তার ফলে পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় পরে বইটি পুনর্মুদ্রিত হবার সুযোগ পায়। তবে পুস্তকটি পুনর্বীর প্রকাশ করতে লেখক কেন আগ্রহী হননি তা যেমন অজ্ঞাতই থেকে গেছে, তেমনি আরও অজ্ঞাত রয়ে গেছে যে, কেন পরবর্তীকালে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ ‘প্রসঙ্গ নাট্য’ এবং ‘সন্মার্গ সপর্যায়’-তে তাঁর অনেক প্রবন্ধই অসংকলিত থেকে গেল।

এই ‘অভিনয়-নাটক-মঞ্চ’ প্রবন্ধ গ্রন্থটি দশটি প্রবন্ধের সমন্বয়ে সংকলিত। এই গ্রন্থেরই ‘প্রস্তাবনা’ নামক লেখাটি ‘প্রসঙ্গ নাট্য’ ও ‘সন্মার্গ সপর্যায়’—এই দুটি গ্রন্থেই সংকলিত হয়েছে। ১৯১৩ সালের ১লা জানুয়ারি ‘সন্মার্গ সপর্যায়’-র ভূমিকায় তিনি ‘প্রস্তাবনা’ নাম বদলে রাখেন ‘ক্ষণস্থায়ী তবু—’। তবে সম্পাদিত হয়ে গ্রন্থের আকার ছোটো হয়ে যায়। এছাড়াও ‘পপুল্যারিটি’ লেখাটি ‘প্রসঙ্গ নাট্য’-তে স্থান পেলেও ‘সন্মার্গ সপর্যায়’ স্থান পায়নি। ‘প্রসঙ্গনাট্য’তে লেখাটির রচনাকাল ১৯৬৩ সাল বলে উল্লেখিত হলেও এটি প্রথম সংকলিত হয়েছিল ১৯৫৭ সালে। তাই এই নিয়ে কিছু বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। তবে ‘অভিনয়-নাটক-মঞ্চ’ গ্রন্থে এই রচনাটির রচনাকালের কোনো উল্লেখ নেই। ‘অভিনয়-নাটক-মঞ্চ’ থেকে আরো দুটো লেখা যথাক্রমে ‘বাংলা থিয়েটার’ (১৯৫১) এবং ‘আন্দোলনের প্রয়োজন’ (১৯৫৬) ‘সন্মার্গ সপর্যায়’ গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এই সময়েই থিয়েটার দলের সঙ্গে একসাথে কাজ করতে না পারা নিয়ে তাঁকে যে সমালোচনার সামনে পড়তে হয়েছিল, তার উত্তরে তিনি বলেন—

“সকল মানুষ সকল ক্ষেত্রে একই সঙ্গে কাজ করবে এরকম আশা করা তখনই শোভা পায় যখন দেখব দেশে এক বই রাজনৈতিক দল নেই, এক ছাড়া ধর্ম নেই, একছাড়া জীবনবেদ নেই। প্রতি পাড়ায় তিন হাত অন্তর বারোয়ারি পুজোর মন্ডপ তৈরি হয় যে দেশে (এবং এটাকে সাহায্য করেন তাঁরা যাঁরা ভোটে দাঁড়ান)। যেখানে দেশের সমূহ বিপদের দিনেও রাজনৈতিক কর্তারা একসঙ্গে কাজ করতে পারেন না, অসংখ্য দলে বিভক্ত হয়ে কেবল সত্যোপলব্ধির পথটাকেই শক্ত করে তোলেন তখন কেবলমাত্র নাট্য প্রতিষ্ঠানের সংখ্যায় অপবাদ দিই কোন মুখে?”^১

এই গ্রন্থেই সংকলিত তাঁর অভিনয় কেন্দ্রিক আরো দুটি রচনা হল ‘চরিত্রচিত্রণ : স্ট্যানিসল্যাভস্কি’ থেকে অনুবাদ অপরটি ‘অভিনয় কী’। তবে এই দুটি প্রবন্ধই পরবর্তীকালে অন্য কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয়নি। এই গ্রন্থেই সংকলিত হয় তাঁর নাটক সম্বন্ধে প্রথম প্রবন্ধ ‘রক্তকরবী’। ‘প্রসঙ্গ নাট্য’ ও ‘সন্মার্গ সপর্যা’ গ্রন্থেও ‘রক্তকরবী’ নামে প্রবন্ধ থাকলেও তা ভিন্নধর্মী। এছাড়াও পরবর্তীকালে প্রকাশিত শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতার সংকলন ‘নাট্যভাষ’ (১৯৭৭) গ্রন্থেও ‘রক্তকরবী’ নিয়ে বিশদ আলোচনা রয়েছে। তিনি এই কালজয়ী নাটকটি সম্বন্ধে তাঁর ভাবনাকে বারবার প্রকাশ করেছেন ভিন্নরূপে।

‘অভিনয়-নাটক-মঞ্চ’ গ্রন্থে শিশিরকুমার ও তৎকালীন নাট্যাভিনয় সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করলেও শম্ভু মিত্র শিশিরকুমারের অভিনয় বিশ্লেষণ করে তাঁকে মহৎ অভিনেতা বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। একাধারে নট-নাট্যকার ও নাট্য পরিচালক শম্ভু মিত্র ‘যুদ্ধোত্তর যুগে বাংলা মঞ্চ সংকট’ প্রবন্ধটি লেখার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের ‘মুক্তধারা’ মঞ্চস্থ করলেন কিন্তু মঞ্চ সাফল্য লাভ করতে পারেননি। এরপর রবীন্দ্রনাথেরই ‘চার অধ্যায়’ ও ‘রক্তকরবী’ মঞ্চস্থ করার পর পাঁচের দশকে পুনরায় ‘মুক্তধারা’ মঞ্চস্থ করলেন। কিন্তু আবারও অসফল। তাঁর লেখা ও সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, ১৯৪১-৪২ সালে জাপানি বোমার ভয়ে যখন কলকাতা শহর ফাঁকা, তখন নিস্তব্ধ রাত্রিতে তাঁর প্রিয় ‘জ্যোতিনাথদা’কে ‘রাজা’ পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। সেই পাঠ শুনে মুগ্ধ হয়ে শ্রীজ্যোতিনাথ ঘোষ সবিনয়ে বলেছিলেন—‘হ্যাঁ-হে শম্ভু! এইরকম নাটক লেখা হয়?’

এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিতে শম্ভু মিত্র মঞ্চসজ্জার অপরিহার্যতা, সেই সম্পর্কিত ভাবনার ভিত্তি, অভিনয় শিক্ষা ও সর্বোপরি নাট্যশিল্প সমাজে গুরুত্বপূর্ণ কেন—সবই স্পষ্টভাবে আলোচনা করেছেন।

অর্ধশতক পার করে বাংলার নাট্য তথা শিল্পসচেতন মানুষের কাছে শম্ভু মিত্রের ‘অভিনয়-নাটক-মঞ্চ’ বইটি পুনরায় প্রকাশ করেছে সপ্তর্ষি প্রকাশন। এই প্রকাশন সংস্থাকে গ্রন্থটি প্রকাশের অনুমতি দিয়ে ছিলেন শম্ভু মিত্রের কন্যা শাঁওলী মিত্র ও মূল প্রচ্ছদ ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন

শ্রী খালেদ চৌধুরী। এছাড়াও এই গ্রন্থটি প্রকাশের পেছনে যাঁদের অবদান স্মরণীয় তাঁরা হলেন—
প্রনবেশ মাইতি, শেখর সমাদ্দার, শুভঙ্কর দে এবং অর্পিতা ঘোষ।

গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশের তথ্যগুলি হল—

প্রকাশকাল: ৬ আশ্বিন, ১৩৬৪। প্রকাশক : সত্যব্রত লাইব্রেরি, ৭বি, রাজেন্দ্রলাল স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০০০৬। ব্লক নির্মাণ—স্ট্যান্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং, কলকাতা-৭০০০০৯। মুদ্রক
: লোকসেবক প্রেস, ৮৬এ, লোয়ার সারকুলার রোড, কলকাতা-৭০০০১৪। সাইজ : ডবল ডিমাই।
প্রচ্ছদ : খালেদ চৌধুরী।

প্রস্তাবনা:

শম্ভু মিত্রের ‘অভিনয়-নাটক-মঞ্চ’ প্রবন্ধ গ্রন্থের ‘প্রস্তাবনা’ প্রবন্ধটি ‘চতুরঙ্গ’ পত্রিকায়
১৩৫৯ সালে বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যায় ‘নবনাট্য আন্দোলনে ভবিষ্যৎ’ শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

এই প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন যে, ‘কালনিরবধি এবং পৃথ্বী বিপুলা’—একথা লেখক
ও চিত্রকরদেরই মানালেও অভিনেতা-তের একথা মানাই না তার উপরে ভবিষ্যৎকালের স্বীকৃতিও
অভিনেতাদের জন্য নয়। অভিনেতারা কেবলমাত্র বর্তমানের। নাট্যজগতে আজ যারা মহান রূপে
বিরাজমান রয়েছেন পরবর্তীকালে তারা কিংবদন্তি মাত্র। অভিনেতাদের অস্তিত্ব তাদের নিজের
যুগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর তাঁদের সেই সমসাময়িক কালকেই তাঁরা আপন দেহ-মন-আবেগ
দিয়ে অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন মঞ্চে। কেউ কেউ এই অভিনয়ের মাধ্যমেই জনপ্রিয়তার
শিখর স্পর্শ করে আবার অনেকেই তা পারে না। যারা পারে না তারা এই অভিনয়কে কেন্দ্র
করেই সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সঙ্গী করে নাটকের মঞ্চ আঁকড়েই পড়ে থাকে। হয়তো এভাবেই
তাদের বাকি জীবনটা অতিবাহিত হয়।

বাংলার নাট্য শিল্পের বিকাশের অন্তরায় ছিল প্রচুর। প্রথমত, ভাষা বাংলা হওয়ায়
‘ভারতীয় মসনদি মহলে’ বাংলা নাটক ছিল অবজ্ঞাত। প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন, একবার তাঁরা একটি
বাঙালি শহরে নাট্যনুষ্ঠানের জন্য সেখানকার এক বিহারী পুলিশের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলে,

তার আদেশ হয় যে অভিনয়ের তিনটি নাটকেরই হিন্দি তর্জমা পেশ করতে হবে। লালবাজার থেকে পাওয়া অনুমতি দেখানো সত্ত্বেও কোনো লাভ হল না। অন্যদিকে টাকার অভাবে কোনো হিন্দি লেখককে দিয়ে নাটকের তর্জমা করানোও তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং তাঁদের সেখানে যাওয়া ও নাট্যাভিনয় দুই-ই বন্ধ হলো।

এছাড়াও প্রমোদ করের চাপ ও মঞ্চ ভাড়া না পাওয়াও নাট্যশিল্প বিকাশে বাঁধার সৃষ্টি করেছে। এত বাঁধা সত্ত্বেও কলকাতা তথা সমগ্র বাংলাদেশে সেই সময় নাটকের দলের সংখ্যা কম ছিল না। তাঁরা কিন্তু পূর্ব অভিনিত জনপ্রিয় নাটকের অভিনয় না করে নতুন নাটকেরই অভিনয় করেন। বাংলাদেশে শিল্প সংস্কৃতি অধঃপতিত হচ্ছে বলে যে কলরব উঠেছিল সেই কলরবের মাঝে দাঁড়িয়েই সমস্ত নাট্যদলগুলো চেষ্টা করেছে নতুন নাটক রচনা ও নতুন অভিনয় ভঙ্গির অবতারণা করার। সবার চেষ্টা হয়তো সফল হয়নি তবে যারা সফল হয়েছে তারা যে শুধু সেই অসময়ে টিকে ছিল তাই নয় বরং পরবর্তীকালে তারা শক্তি বাড়িয়ে আরো শক্তিশালী হয়েছে।

পঞ্চাশের মতান্তরের পরে নবজীবনে উত্তরণের জন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। শিল্পের ক্ষেত্রেও নতুন পথে চলে নতুন কিছু করার তাগিদ অনুভূত হয়। নবনাট্য আন্দোলনের শুরুও তখন থেকে। আর এখানেই বাঙালি প্রমাণ করেছে নাট্যাভিনয়ের প্রতি তার গভীর অনুরাগ। এই সময়ে অভিনয় ও প্রযোজনায় অনেক ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও নতুন নাটক ও উপস্থাপন রীতির বৈচিত্র্যের জন্য তা দর্শকদের আনন্দদানের সহায়ক ছিল। তবে পরবর্তীকালে দেশের সাহিত্যিকদের নাট্যসাহিত্যের প্রতি অবহেলার জন্য অভিনয়যোগ্য নাটকের অভাব দেখা দেয়। আর তাছাড়া বিজন ভট্টাচার্যের ‘নবান্ন’ নাটকের অভাবনীয় সাফল্যের পরে লেখকদের মধ্যে একটি ভ্রান্ত ধারণার জন্ম নেয় যে—‘নাটক লেখাটা দৈবীশক্তি নির্ভর।’

চালু ব্যবসা হওয়ার কারণে গল্প, উপন্যাসের প্রকাশক পাওয়া সহজ, অথচ নাটক ছাপানোর প্রকাশক পাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর। বিখ্যাত নাটক তুলসি লাহিড়ীর ‘ছেঁড়াতার’ ছাপাতেও কোনো প্রকাশক এগিয়ে আসেনি। শেষপর্যন্ত লেখকই নিজ অর্থব্যয়ে ও উদ্যোগে প্রকাশ করেন। এত কিছুর পরেও নাট্যকাররা নাটক লেখা বন্ধ করেননি। বরং ‘ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে

আত্মতৃপ্তির জন্যই তারা শুধু নাটক রচনা করে গেছেন—এখানেই আমাদের গর্ব। কবি ও ঔপন্যাসিকরা মূলত ভবিষ্যতের জন্য সৃষ্টির জাল বোনেন। কিন্তু নাট্যকাররা তাঁর সমসাময়িককালের মানুষের জন্য পসরা সাজায়। তাই একটা চাপা টেনশন থেকেই যায়—

“এই বুঝি লোকের বিভ্রান্তির সুযোগ নিচ্ছি। এই তাদের কুসংস্কারকে স্তোক দিয়ে নিজের কোলে ঝোল টানছি।”^২

তাই নিজেরা একটু সতর্ক থেকে মানুষকে আনন্দ দেওয়াই মূল লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নবনাট্য আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে যখন কোনো ‘সরাইখানায়’ উপস্থিত হয়ে নাটক অভিনয় করে মানুষকে আনন্দ দেবার চেষ্টা করেন নাট্যকার ও অভিনেতারা তখনই সেখানকার দর্শকরা কেউ কেউ বলে ওঠে—‘বড্ড ইনটেলেকচুয়াল!’ এই সমালোচনাগুলোকেই পাথেয় করে পরবর্তীকালে নানা ভাবনা-চিন্তার পরেই আবার তারা নতুন নাটকের সৃষ্টি করেন।

যুদ্ধোত্তর যুগে বাংলা মঞ্চে সংকট:

বাংলা ১৩৫৪ সালে ‘পরিচয়’ পত্রিকায় পৌষ সংখ্যায় শম্ভু মিত্রের ‘যুদ্ধোত্তর যুগে বাংলা মঞ্চে সংকট’ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।

এই প্রবন্ধে প্রাবন্ধিকের মতে, পরস্পরের মতবিরোধী বাঙালিদের মধ্যে একটি বিষয়ে অন্তত মতৈক্য রয়েছে, সেটি হল—থিয়েটারের অধঃপতন নিয়ে। সব ধরনের মানুষই থিয়েটার সম্পর্কে একই মন্তব্য করেন যে—‘থিয়েটার জাহান্নামে গেছে।’ আর প্রাবন্ধিক থিয়েটারের জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হিসেবে ভালো নাট্যকার ও নাটকের অভাবকেই দায়ী করেছেন। অথচ বেশির ভাগ বাঙালি নাটক দেখতে ভালোবাসে ও সুযোগ পেলে অভিনয় করারও চেষ্টা করে। তবুও একজন নামী নাট্যকারের অভাব থেকেই গেল। সাহিত্যের অন্যান্য লেখা কাব্য, গল্প, চিত্র, নৃত্য এগুলোর আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষার কোনো কমতি নেই। নতুন নতুন সৃষ্টির প্রচেষ্টারও কোনো অভাব নেই। অথচ এগুলো ততটা জনপ্রিয় নয় যতটা থিয়েটার জনপ্রিয়। তবে কেন থিয়েটারের আজ এমন হাল? এর উত্তরও প্রাবন্ধিক দিয়েছেন—

“তার কারণ বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনের যে শ্রোত চলেছে কাব্য-গল্প-চিত্র-
নৃত্যের মধ্য দিয়ে, মঞ্চ তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। জাতির সাংস্কৃতিক
জীবন থেকেই সে ছিন্ন।”^৭

অভিনয় শিল্পের এই অবনতির জন্য ভালো নাটকের অভাবই মূলত দায়ী। মঞ্চনাট্যকার,
অভিনেতা ও দর্শক—এই তিনেরই সম্পত্তি। কিন্তু যদি মঞ্চ কেবল মাত্র অভিনেতার সম্পত্তি
হয়ে ওঠে এবং নাটক কেবল তাঁর উপলক্ষ্য হয়ে দাড়ায় তাহলে থিয়েটার ব্যঙ্গের বস্তুতে পরিণত
হয়। তবে অনেকে প্রশ্ন তোলেন যে, ভালো অভিনেতা কোথায়? তার উপরে একথা বলতে
হয় যে, ভালো অভিনেতা তৈরী করতে পারে কেবলমাত্র ভালো নাটক। এটা ভুললে চলবে না
যে নাটক ও অভিনেতা পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পরস্পর অভিন্ন। আর আমাদের এও
মনে রাখা দরকার শিশিরকুমারের মতো অভিনেতার কথা। যিনি নাদিরশাহ, আলমগীর, রঘুবীরের
মতো চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে ও ‘দ্বিগ্বিজয়ী’, ‘রমা’, ‘সীতা’ নাটকে প্রয়োগ নৈপুণ্যের দ্বারা
দর্শক হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছিলেন। এবং মঞ্চনবযুগের সূচনা করেন। অনেকে রবীন্দ্রনাথের
সাথে শিশিরকুমারের তুলনা করে বলেছেন—‘একই পংক্তির যেন দুটো নাম।’ সুতরাং যোগ্য
অভিনেতা যে ছিল তা তো বলাই বাহুল্য, আর এই যোগ্য অভিনেতাও শরৎচন্দ্রের নাটকের
পর অভিনয়যোগ্য নাটকের অভাবে তাঁর নাট্য প্রতিভাকে আর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলো না।
এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রাবন্ধিকের মনে হয়েছে—

“একটা ভাঙা ফিউড্যালি আবহাওয়া যেন মাকড়সার জাল দিয়ে আমাদের
প্রত্যেকটা মঞ্চকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।”^৮

থিয়েটারের এমন বেহাল অবস্থা কিন্তু গিরিশ ঘোষ বা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফির সময়ে
ছিল না। তখন ছিল ‘থিয়েটারের যুগ’। নতুন কিছু করে দেখাবার দুঃসাহসের যুগ। সেই যুগের
সূর্য যত অস্তমিত হতে লাগল নাট্যকার ও নাটকের অভাবও প্রকট হতে শুরু করল। আর এই
অস্ত যাওয়া থিয়েটারের যুগেই কিছুটা আধুনিকতা নিয়েই আর্বিভূত হন শিশির কুমার। শরৎচন্দ্রের
নাটকগুলিকে জনপ্রিয় করে তোলার পাশাপাশি মধ্যবিত্ত জীবনের রোমান্টিকতাকে চরিত্রের মাধ্যমে

ফুটিয়ে তুললেন তিনি মঞ্চে। তবে পরবর্তীকালে এই মঞ্চগুলিতে পুরোনো আঙ্গিকে পুরোনো নাটকের অভিনয় দেখে যে সমস্ত নতুন শিল্পী নতুন কিছু করার অনুপ্রেরনা নিয়ে এসেছিলেন তারাও মঞ্চ থেকে দূরে থাকতে শুরু করেন। তারা অভিনয় দেখে আনন্দ পান। হাততালিও দেন কিন্তু মঞ্চকে কেন্দ্র করে যে নতুন কিছু বলা যায়—তা তাদের মনে হয় না।

একসময় যে বাংলা থিয়েটারে সপ্তাহ শেষের (শনি-রবি) মাত্র দুটি রাতেই তিন-সাড়ে তিন হাজার টাকার টিকিট বিক্রি হত, পরবর্তীকালে সেই থিয়েটারেই মাত্র আঠাশ টাকার টিকিট বিক্রি হওয়ায় মিথ্যে বলে অভিনয় বন্ধ করার উদাহরণও পাওয়া যায়। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষদিকে পুনরায় থিয়েটারে দর্শকদের আগমন ঘটতে থাকে। তবে যে কারণে দর্শকদের পুনরায় মঞ্চসুখী হওয়া ঠিক সেই কারণের গোড়াতেই আঘাত পড়ায় মঞ্চগুলি আবার টলোমলো হয়ে ওঠে। দু-এক জন লোকের চরিত্র স্থলনই বাংলা মঞ্চের এমন টালমাটাল অবস্থার জন্য দায়ী। তার এমন কথাও শোনা যায় যে—

“থিয়েটারের লোকমাত্রেরই খারাপ, তাই তো মঞ্চের আজ এই দশা।”^৫

প্রত্যেক যুগেই শিল্পীদের নৈতিক চরিত্র নিয়ে ঝড় উঠেছে। তাঁদের নিয়ে চলেছে অপপ্রচার। তাই বলে শিল্প বন্ধ হয়ে যায়নি। তার মালিকদের অতিরিক্ত লোভের কারণে শিল্প ক্রমশ জৌলুসহীন হয়ে পড়ছিল এমনটাও নয়। কারণ চারটির মধ্যে অন্তত দুটো অভিনয় সম্প্রদায়ের মালিক হলেন দুজন অভিনেতা। তবুও মঞ্চের বাংলা থিয়েটার মঞ্চগুলির এমন দুর্ভাবস্থা। ইয়েটস বলেছেন—

“The play that is to give them a natural pleasure should tell them either of their own life, or of that life of poetry where every man can see his image.”^৬

আর এটাই আজ কাম্য। কোনো শ্রেণি বিশেষের জীবন নয়, সমগ্র জাতির, সমস্ত শ্রেণির সুখ-দুঃখ-আশা-আনন্দ নিয়ে যে মহৎ জীবন রচনা করে রাখছে ভবিষ্যৎ জীবনের পটভূমি সেই মহৎ

জীবন বোধকেই তুলে ধরতে হবে মঞ্চে। সেই জীবনাদর্শে দর্শককে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। যদি তা করা যায় তাহলেই বাংলা থিয়েটারের সুদিন আসবে। আর তারজন্য সর্বপ্রথমে ভালো নাটক লিখতে হবে। অবশ্য সেই নাটককে সর্বশ্রেণির বোধগম্য করে, সকলকে আনন্দদানের উপযোগী করে রচনা করতে হবে। অর্থাৎ মানুষের মনের কাছাকাছি পৌঁছতে হবে নাট্যকার ও অভিনেতাকে। আর গল্প উপন্যাস অপেক্ষা মঞ্চে মাধ্যমেই তা করা অত্যন্ত সহজ ও সরল। এখনও আমাদের দেশে বেশিরভাগ মানুষ নিরক্ষর। তাই লিখিত ভাষার দ্বারা তাদের কাছে পৌঁছানো না গেলে মঞ্চে কথ্য ভাষার অভিনয়ের দ্বারা খুব সহজেই তাদের কাছে পৌঁছানো যায়।

সুতরাং নাট্যকারকে বর্তমান দিনের হতে হবে। তিনি আজকের দিনটাকে যত ভালোভাবে নিজের নাটকে প্রতিফলিত করতে পারবে ততই তাঁর নাটক সাধারণের কাছে সত্য হয়ে দাঁড়াবে। বলা যায়—

“থিয়েটার হল একটা কারখানা যেখানে নাটক তৈরি করা হয় এবং নাট্যকারের কাজ হচ্ছে সেই তৈরির কাজে সাহায্য করা।”^৭

অর্থাৎ নাট্যকারকে মঞ্চ অভিনেতা-অভিনেত্রী ও দর্শকদের কথা মাথায় রেখেই নাট্য রচনা করতে হবে। অভিনেতা-নেত্রীরা কে কোন ভূমিকায় অভিনয় করতে পারবে, তাদের মুখে কোন ধরনের কথা বসালে অভিনয় আরো সহজ হবে, দর্শকরা কোন বিষয়টিতে হাসবে, কোন বিষয়টিকে মনযোগ দিয়ে শুনবে, কোন বিষয়ে উৎকর্ষিত হবে এছাড়াও মঞ্চে নাটকের কতটুকু দেখানো যাবে, আর কতটুকু দেখানো যাবে না সবকিছু মাথায় রেখে তবেই নাটক লিখতে হবে।

এককথায় বলা যেতে পারে নাট্যকার হলেন কারুশিল্পী বা বিশেষজ্ঞ। তাঁর আসল কাজ হল নাটকটার একটা পূর্ণ অবস্থান দাঁড় করানো। যে বিষয়কে আশ্রয় করে নাটকের বাকি ঘটনাগুলো ঘটছে তার একটা ছক এঁকে দেওয়া। তবে অনেকে নাটকের সংলাপটাকেই ‘নাটক’ বলে ভেবে বসেন। আসলে কিন্তু তা নয়। সংলাপ হল নাটকের আনুষঙ্গিক মাত্র, গৌণী। কেবলমাত্র ভালো সংলাপ দিয়েও একটা খারাপ নাটককে মঞ্চ সফলতা এনে দেওয়া যায় না। তবে আনুষঙ্গিক হলেও নাটকের সংলাপ অন্যান্য সংলাপের থেকে আলাদা। সংলাপে থাকে

নাটকের অর্ধেক গল্প, আর বাকি অর্ধেকটা থাকে অভিনয়ে। তাই কোনো লেখক যদি নাটক লিখতে চান তো প্রথমেই তাকে অ্যাকশন ছকটাকে উপলব্ধি করতে হবে। এই অ্যাকশন মানে কিন্তু অভিনেতার মূকাভিনয় নয়, এর আসল মানে হল, নাটকে একটা ঘটনার ফলে নাটকের চরিত্রগুলোর মধ্যে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং পুনরায় তার ফলে যে নতুন ঘটনার জন্ম নেয়। এই রকম কতগুলো বড়ো ঘটনার মধ্যে অসংখ্য ছোটো ঘটনার সমাবেশে চরিত্রগুলোর প্রকাশ এবং তার মাধ্যমে বড়ো ঘটনাগুলি অনিবার্য হয়ে ওঠা—এই সমস্ত মিলিয়েই তৈরি হয় নাটকের অ্যাকশন ছক।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে যখন আমাদের বাংলায় মানুষের জীবনবোধের মানদণ্ডটা মুখ খুবড়ে পড়েছে, মানুষের চিন্তা-ভাবনাগুলো এলোমেলো হয়ে গেছে, সমস্ত মানুষ এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছে, চাওয়া-পাওয়া হীন, বাস্তব জ্ঞানহীন সেই মানুষগুলোকে উপযুক্ত পরিস্থিতিতে নিজের স্বরূপকে চেনানো, বাস্তব সম্পর্কে জ্ঞানপ্রদান করাই হল শিল্পীর আসল কাজ। আর মঞ্চের মাধ্যমে সেই জীবনবোধকে সর্বসাধারণের মধ্যে নির্ভীক চিত্তে উন্মোচন করার জন্যই আজ যোগ্য শিল্পীর প্রয়োজন।

বাংলা থিয়েটার:

প্রাবন্ধিক শম্ভু মিত্রের ‘অভিনয়-নাটক-মঞ্চ’ প্রবন্ধ গ্রন্থের তৃতীয় প্রবন্ধ ‘বাংলা থিয়েটার’ ‘পরিচয়’ পত্রিকায় ১৩৫৭-৫৮ বঙ্গাব্দে চৈত্র-বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশ পায়। এই প্রবন্ধটি ‘সম্মার্গ সপরিচয়’ প্রবন্ধ গ্রন্থেও একই নামে সংকলিত হয়েছে।

এই প্রবন্ধানুসারে অনেকের মতে থিয়েটার আমাদের দেশীয় নয়, সে বিলেতের দান। তাই বিদেশী দ্রব্য নিয়ে মাতামাতিতে নাকি পরাধীন ভারতবাসীর অনেকের আত্মাভিমান আঘাত লাগে। বিদেশী জিনিস দিয়ে লোককে উদ্ধুদ্ধ করার যে প্রয়াস ‘যাত্রা’র মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল তা আমাদের দেশের সর্বসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। তাই যাত্রা থিয়েটারের পদক্ষেপ অনুসরণ করেই থেকে গেছে প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াতে আর পারল না। অথচ বাঙালি থিয়েটার দেখতে ভালোবাসে। শুধু শহরের বাবুরা নয়, গ্রামের চাষাভূষা মানুষগুলোও থিয়েটারের প্রেমে মশগুল।

একটি নির্বাকচিত্রে দেখানো হয়েছিল একদল সাদা চামড়ার বণিকরা পালতোলা জাহাজে করে এসে দাঁড়ায় কালোচামড়ার মানুষদের আদিম সভ্যতা ঘেরা একটি ছোট্ট দ্বীপে। সেখানে বণিকরা সামান্য মূল্যের দ্রব্যের বিনিময়ে দ্বীপের অধিবাসীদের থেকে সংগ্রহ করতে থাকে দামী মুক্ত। আর এই মুক্তের অসীম লোভই ছোট্ট দ্বীপে গড়ে তোলে উপনিবেশ। ক্রমেই সেই আদিম সভ্যতা তার অপরূপ আদিমতা হারিয়ে বিনাশের পথে এগিয়ে চলে। সেখানকার পুরুষেরা তাদের কৌপিন ছেড়ে ধরে প্যান্টালুন, নারীরা স্বদেশি পোশাক ছেড়ে গায়ে তুলে নেয় বালিশের খোলার মতো অদ্ভুত গড়নের কুৎসিত ছাপা পোশাক। ঘরের তৈরি হালকা পানীয়ে নিজের গলা না ভিজিয়ে মাতাল হতে যায় বিদেশী ‘ভাঁটিখানায়’। তারা আর তার নিজেদের গ্রামে পালা-পার্বণে অনুষ্ঠিত নাচ-গানে আনন্দে বিভোর হয়ে ওঠে না। এসব নাচ-গান এখন তাদের কাছে ছেলেমানুষি। বরং তাদের ভালোলাগে ‘জ্যাজ’ রেকর্ড শুনতে। নির্বাক চিত্রের মতোই লাল-নীল আলো দিয়ে মঞ্চসজ্জার বিদেশী চাকচিক্যের কাছে হেরে যায় আমাদের দেশীয় ‘যাত্রা’।

অবশ্য আমাদের দেশের লোকই যখন বিদেশী চাকচিক্যকে আপন করে নিয়েছে, তখন তাদের আনন্দ দেবার জন্যইতো শিল্পকে তাদের মনের মতো করে সং সাজিয়ে তাদের সামনে পরিবেশন করতে হবে।

তবে বিদেশী জিনিসের ‘গ্ল্যামারাস’ এর মোহ যেদিন কেটে যায় সেদিনই আবার স্বদেশী শিল্পের প্রতি ভালোবাসা জেগে ওঠে। আর সেই কারণেই আমাদের দেশের নাট্যকরারা দেশাত্মবোধের অনুপ্রেরণা সঞ্চয়ের জন্য শিবাজিকে নিয়ে, সিরাজদৌল্লাকে নিয়ে, রানা প্রতাপকে নিয়ে আরও কত ঐতিহাসিক চরিত্রদের নিয়ে নাটক রচনা করে পরাধীনতার জ্বালাকে ভাষায় প্রকাশ করে বাংলা থিয়েটারের মাধ্যমে সর্বসাধারণের সামনে তুলে ধরেছেন। আর এই দেশাত্মবোধকে অভিনেতারা তাদের অভিনয়ের মাধ্যমে মূর্ত করে তুলতে পেরেছিলেন বলেই শাসকদের রক্তচক্ষুর সামনে, নীতিবাগিশদের নিন্দার সামনে, কেবলমাত্র স্বদেশী হওয়ার কারণে এদেশীয় বড় ব্যবসায়ীদের অবহেলা উপেক্ষা করেও বাংলা থিয়েটার স্বমহিমায় আশি বছর নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছে। যাত্রা কিন্তু তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারেনি।

অবশ্য আজও অনেকে যাত্রার কথা মনে করে থাকে। তার কারণ অবশ্য থিয়েটারের কর্ম দ্রষ্টতা দর্শকও এর প্রতি অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছে। তবে এর থেকে মুক্তির কেবলমাত্র যাত্রার মাধ্যমেই সম্ভব। তবে পুরোনো যাত্রা রীতির মাধ্যমে নয়। নতুন কোনো রীতির মাধ্যমেই সম্ভব। এর জন্যই এমন নাট্যশিল্প রীতির সূচনা করতে হবে যা একান্তভাবে বাঙালির। যেন এই নতুন আঙ্গিকে রচিত নাটকের অভিনয় দেখে কারো ‘চতুর্থ’ শ্রেণির বিদেশি থিয়েটার’ বলে মনে না হয়। বাংলার ছবি, বাংলার গান, বাংলার কাব্য, বাংলার ঐতিহ্যকে এইসব নাটকের প্রাণে পরিণত করতে পারলেই তা কেবলমাত্র বাঙালির থিয়েটার হয়ে উঠতে পারবে।

কিছু কিছু মানুষের যাত্রা সম্পর্কে মতামত শুনে যাত্রার দুটো বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হয় যা তাদের অস্বচ্ছ দৃষ্টির পরিচয় দেয়। সেই বৈশিষ্ট্য দুটি হল—

ক) যাত্রায় নাকি মঞ্চ ও দৃশ্যসজ্জার প্রয়োজন নেই।

খ) যাত্রা নাকি কেবলমাত্র গ্রামেই হয়।

—একথা ঠিক যে দৃশ্যসজ্জা ও আলোক সজ্জার সাহায্যে থিয়েটারের মঞ্চের উপরে এমন একটি আবহ তৈরি করা সম্ভব যা যাত্রার মঞ্চ সম্ভব নয়। তবে সেই আবহ যে যাত্রায় প্রকাশ পায় না এমনটা নয়, তার প্রকাশ রীতি আলাদা। যাত্রা ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাহন।

বর্তমানে বাংলা নাটকে বুদ্ধির আবেদন বর্জন করে হৃদয়ের আবেদন প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে দেশাত্মবোধের নাটকগুলিতে হৃদয়ের আবেদন বেশি থাকে। অথচ হৃদয়বৃত্তির সঠিক চর্চা বুদ্ধি চালিত পথেই।

আমাদের বাংলা নাটকের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল শিল্প সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি। আর এই রুচি বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ পায় রবীন্দ্রনাথের নাট্যানুষ্ঠানে। প্রতীকের বিরল সংস্থানে মঞ্চ-সজ্জায় আসে রুচি, আসে অর্থ-নিগূঢ়তা। রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ রুচিজ্ঞান তাঁকে এই কর্ম সম্বন্ধে সচেতন রেখেছে। অপরদিকে তখন সাধারণ রঙ্গালয়ে দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশ ঘোষের নাটক অভিনীত হচ্ছে। সেগুলোয় ‘ঠাকুর বাড়ির’ রুচিবোধ না থাকলেও তার দাম কম ছিল না। আর আজও তা

মূল্যবান। এই সমস্ত নাটকে তৎকালীন বাংলার মাটির গন্ধ অনুভূত হয়। শিল্পের সত্যতা সেখানেও বর্তমান। রবীন্দ্রনাট্যাভিনয়ে সেই মাটির গন্ধ অনুভূত হয় না বরং তাঁর রুচিবোধ সাধারণের কাছে ‘কাব্যিক বাড়াবাড়ি’ বলে মনে হয়েছে। তিনি সাধারণের রসাস্বাদন ঘটান নি। আর এই সাধারণের রসাস্বাদনের পথটাকে প্রশস্ত করেছে সাধারণ রঙ্গালয়।

বাংলা নাটকের মতো সংস্কৃত নাটকের অভিনয়ের মধ্যেও ছিল বিদেশি প্রভাব। তবে নাটকটি ছিল এদেশীয়। আর কিছু বৈশিষ্ট্যতো এদেশেই ছিল। যেমন—প্রতীকভঙ্গি। এক রাজা ‘রথারোহন নাটয়তি’। অর্থাৎ রাজা রথে আরোহন অভিনয় করলেন। এখানে না রথের প্রয়োজন হল না ঘোড়ার। কিন্তু দর্শক ঠিক বুঝলেন যে, রাজা রথে আরোহন করলেন। এই প্রতীকভঙ্গি আজও চীন ও জাপানে প্রচলিত আছে।

বাংলার মানুষের আর এক অদ্ভুত সৃষ্টি হল কীর্তন গান। যা বাঙালির নিজস্ব সম্পদ। আর এই কীর্তনগানের মধ্যে আসর দেওয়ার রীতিটি বিশিষ্ট। প্রবল ভাবের মুহূর্তে গায়ক গানের কাঠামো ভেঙে আসরের মধ্যে বিস্তার লাভ করেন। যাত্রাতেও এই ধরনের রীতি প্রচলিত ছিল। প্রবল ভাবের মুহূর্তে অভিনয় গানে বিস্তৃত হয়। এর জন্য যাত্রায় থাকত জুড়ি তারা আসরের মধ্যে উঠে গান ধরত। এরই কিছু কিছু প্রকাশ পাচ্ছে সিনেমার নায়ক-নায়িকার হঠাৎ করে গান গেয়ে ওঠার মাধ্যমে।

এমনই সব ভাবপ্রকাশের বিভিন্ন শিল্পরীতি রয়েছে বাংলা থিয়েটারে। কিন্তু উপযুক্ত ব্যবহারের অভাবে সেগুলো আজ মৃতপ্রায়। তাই আজ নাট্যকারদের দায়িত্ব হল ‘ভাঁড়ার ঘর’ থেকে সেই শিল্পরীতিকে যতগুলিকে সম্ভব মেজে ঘষে আধুনিক করে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য করে তোলা।

এই যে, দেশিয় বনাম বিদেশির যে তর্ক ওঠে তার ভিত্তি অত্যন্ত গভীর। ইংরেজরা যখন এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করতে এসেছিল তখন তার মধ্যে ছিল প্রগতি। আর তা হল—সমাজ বিবর্তনের প্রগতি। সেই নির্বাক দৃষ্টির উপনিবেশের মানুষগুলো যখন বিদেশিদের বিরুদ্ধে কঠোর হয়ে ওঠে, স্বদেশি স্বদেশি বলে যখন বাড়াবাড়ি করে তার মধ্যেও আছে প্রগতির ঝাঁক।

পরাজিততার বেড়া ভেঙে স্বাধীন হওয়ার চেষ্টার মধ্যেও রয়েছে সেই প্রগতির ঝাঁক। তাই আলাদা করে স্বদেশি বা বিদেশির কোনো সত্যতা নেই। আসল সত্যতা এই দুইয়ের সংমিশ্রণে। স্বাচ্ছন্দ মিলনে। উভয়ের গুনগুলো গ্রহণই বাঞ্ছনীয়। আর এই পথ ধরে এমন এক প্রকাশভঙ্গির সূচনা হওয়া দরকার যা একান্ত বাঙালির সম্পদ হয়ে উঠবে। যা গভীরভাবে বাঙালির হলেও যাকে সাদরে গ্রহণ করবে সমগ্র পৃথিবী।

কয়েকটি অভিনয়ের জন্মকথা:

এই প্রবন্ধ ‘চতুরঙ্গ’ পত্রিকায় ১৩৬০ বঙ্গাব্দে প্রকাশ পায়।

প্রবন্ধের শুরুতেই প্রাবন্ধিক একটি সুন্দর কথা বলেছেন—

“অভিনয়ের জন্য নাটক নির্বাচন করা আর গরীব কেরানির একমাত্র মেয়ের জন্য পাত্র নির্বাচন করা একই ব্যাপার। যা মনে ধরতে পারে তা নাগালের বাইরে, আর যারা নাগালের মধ্যে তাদের সম্পর্কে মন যেন কেমন নিরুৎসাহ। ... হাতে সময়ও এত দ্রুত অপসৃত হচ্ছে যে রয়ে বসে খোঁজার উপায় নেই। অতএব শেষ পর্যন্ত যার হাতে হোক চক্ষু বুজে সম্প্রদান করে কেরানি নিজের মনকে আশ্বাস দিয়ে বলেন—‘বিধাতার লিখন।—দেখা যাক কী হয়।’”^৮

এই কন্যাদায় গ্রন্থ কেরানি পিতার মতই অবস্থা প্রতিটি থিয়েটার দলের। তাই তাদের উচিত নাট্যকারদের উৎসাহ দেওয়া যাতে তাঁরা আরো ভালো নাটক রচনা করতে পারেন। আর যে নাট্যকারদের নাটক অভিনয়ের জন্য নির্বাচিত হয়, তাঁকে নাটক অভিনয়ের পরে কিছু ‘royalty’ পাইয়ে দেওয়া উচিত। এই ‘royalty’ প্রদানের মাধ্যমেই নাট্যকারকে সম্মান প্রদর্শনের চেষ্টা করা হয়।

শম্ভু মিত্র এই প্রবন্ধে বিভিন্ন ধরনের নাটকের কথা বলেছেন। প্রথমত, এমন নাটক যাতে গল্পটা ভালো, কিন্তু চরিত্রগুলো স্পষ্ট নয়, আবার অসংগতিপূর্ণও। দ্বিতীয়ত, এমন নাটক যার চরিত্র বা গল্প কোনটাই আকর্ষণীয় নয়। তৃতীয়ত মনোহারি গল্প-চরিত্র সম্বলিত মহানাটক। তবে

এই ৩য় শ্রেণির নাটকের সংখ্যা নিতান্তই নগন্য। আর নাটুকে দলের লোকেরা এই তিনটি গুনের যে কোনো একটিকে পেলেই সাধ্যমতো একটা নাটক অভিনয়ের চেষ্টা করেন। গল্পে যদি কোনো ত্রুটি থাকে বা কোনো কমতি থেকেও থাকে তাহলেও সকলে মিলে ত্রুটি মুক্ত করার প্রয়াস করেও নতুন কোনো সংগতিপূর্ণ ঘটনা সংযোজন করে গল্পটিকে হৃদয়গ্রাহী করে তোলে। এর উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় বহুরূপীর ‘পথিক’ নাটক। প্রথম লেখায় কোলিয়ারি দুর্ঘটনার কোনো কথাই ছিল না। তার ফলে পুরো নাটকটার শেষটাই ছিল অন্যরকম। তখন দলের সবাই মিলে আলোচনা করলেন কীভাবে নাটকটির নাটকীয়তা বাড়ানো যায়। আলোচনা শেষে সবাই তুলসী লাহিড়ীর কাছে আবেদন করলেন আর তার পরেই তুলসী লাহিড়ী দলের পরামর্শের সাথে আরো কিছু নিজস্বতা সংযোজন করে লিখলেন নাটকটির দ্বিতীয় অঙ্ক। এর ফলে নাটকের শেষটাও বদলে গেল। তুচ্ছ, নগন্য বাউরি চরিত্রগুলোই হয়ে উঠল নায়ক। নাটকের মহৎ কথাগুলো তাদের মুখ দিয়েই বর্ণিত হল।

তবে সবসময়ই যে তাড়াতাড়ি এমন মহানাটক অভিনয়ের জন্য পাওয়া যাবে এমনটা নয়। তাই ত্রুটিপূর্ণ নাটককেও অভিনয় যোগ্য নাটকে পরিণত করে মঞ্চস্থ করতে হবে। তবেই মহানাটকের পথ প্রশস্ত হবে। যে নাটকের গল্পটি ভালো কিন্তু চরিত্রগুলো অসংগতিপূর্ণ ও সংলাপ দুর্বল সেখানে নাটকের দলের কাজ হল অভিনয়ের দ্বারা নাটকের গল্পটিকে ফুটিয়ে তোলা। উপযুক্ত চরিত্র নাটকের গতি বজায় রাখতে যা বলাবে, তাই হবে সংলাপ।

সামাজিক ব্যবহারেই মানুষের আসল পরিচয় প্রকাশ পায়। তেমনি নাটকের পাঁচটি চরিত্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক অভিনয়ে যতটা প্রকাশ পাবে অভিনয়ও ততটাই মনোহারী হবে। আর সেখানেই নাটকের গতি পরিণতি লাভ করবে। এর জন্য গল্পে গ্রহণ বর্জন কাম্য। নাটকের আর একটি অপরিহার্য অঙ্গ হল সংলাপ। অভিনেতার মানস চরিত্রের সাথে যদি নাট্যকারের সংলাপ না মেলে আর তাতে যদি অভিনয় ব্যাহত হয় তাহলে ভাষা বদলিয়ে বা অন্য শব্দ ব্যবহার করে সংলাপকে অভিনেতার উপযুক্ত করে নেওয়া হয়।

নাটক রচিতই হয় অভিনয়ের জন্যই। আর এই অভিনয়ে যে কেবল অভিনেতা,

অভিনেত্রীরাই থাকেন তা নয়। দৃশ্যসজ্জা, আলোক নিয়ন্ত্রন, এমনকি অঙ্কের শেষে প্রচ্ছদ প্রক্ষেপনও অভিনয়ের অঙ্গ। তাই নাটক অভিনয়ের গোড়াতেই নাটকটির একটি কাঠামো পরিকল্পনা করে নিতে হবে যাতে নাটকটি আরো সুন্দর ভাবে পরিবেশন করা যায়। তাই নাটকের উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করতে হলে প্রথমে নির্বাচিত করতে হবে সমান জিনিস যা সেই পরিবেশকে সাহায্য করবে অথচ নাটকটির মান ক্ষুণ্ণ করবে না। তার ফলে খরচের পরিমাণও কমবে। উদাহরণ স্বরূপ প্রাবন্ধিক বলেছেন—তিনি ‘নবান্ন’ নাটক অভিনয়ের সময় দৃশ্যপট হিসাবে পর্দার বদলে চট ব্যবহার করেছিলেন। তিনি আরো জানান এই পর্দা ব্যবহারে অনেক অসুবিধা রয়েছে।

প্রথমত: বিভিন্ন মঞ্চের মাপ বিভিন্ন হওয়ায় এক মঞ্চের জন্য আঁকা পট বা পর্দা অন্য মঞ্চে হয় ছোটো হয় নাহলে বড়ো হয়।

দ্বিতীয়ত: প্রতিটা দলের পক্ষে কোনো চিত্রকরকে আনিয়ে রং তুলি খরচ করে একটি বড়ো পর্দাকে আঁকানো সম্ভব ছিল না।

তৃতীয়ত: এই পট অন্য কোনো জায়গায় মানালেও কোনো জীবন্ত মানুষের পেছনে এই পট মানায় না। যেন অন্তরঙ্গ হয় না।

আর এই কারণেই অ্যাডলফ অগ্নিয়া এই আঁকা পর্দা বা দৃশ্যপটের বদলে মঞ্চে অভিনেতাদের পাশে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করার মতো জিনিস রাখলেন। যেমন—সিঁড়ি, থাম ইত্যাদি।

তবে প্রতিটি নাটকের পটভূমি অনুযায়ী এমন সব জিনিস ব্যবহার করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। তবে যে সমস্ত নাটকের পটভূমি একটা সেখানে উপযুক্ত জিনিস দিয়ে পরিবেশ তৈরি করা সহজ ও কম ব্যয়বহুল। উদাহরণ হিসাবে প্রাবন্ধিক ‘পথিক’ ও ‘উলুখাগড়া’ নাটকের অভিনয়ের কথা বলেছেন। যেমন—‘পথিক’ নাটকের একটাই পটভূমি। তাই পুরো নাটকটিকে খেয়াল করে একেবারেই মঞ্চকে সাজিয়ে ফেলা যায়। আবার ‘উলুখাগড়া’ নাটকের প্রথম দৃশ্য বাদ দিলে বাকি পটভূমি এক। ফলে মঞ্চে আলমারি, বই, তক্তপোশ, চেয়ার, টেবিল দিয়ে সাজালেই যেমন মঞ্চটা

সাজানো দেখানো তেমনি অভিনেতাদের পক্ষেও অভিনয়ের সুবিধা হত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আসবাবপত্র যত বেশি জরুরি হয়ে উঠল আস্তে আস্তে দৃশ্যপট তত নগন্য হতে লাগল। থাকল এই প্রসঙ্গেই প্রাবন্ধিক ‘ছেঁড়াতার’ নাটকের অভিনয় সম্পর্কে বলেছেন, এই নাটকের তিনটি অঙ্কের মোট ৯টি দৃশ্যের বেশির ভাগ দৃশ্য হল গ্রাম্য পথ ও রহিমুদ্দির বাড়ি। আর দুটি দৃশ্যের একটি হল একজন এগ্রিকালচারাল অফিসারের বসবার ঘর আর। একটি হল গ্রাম্য জোতদারের ঘর। এই দৃশ্যগুলির জন্য মঞ্চ সাজানো ঠিকঠাক না হলেও নাটকের ও অভিনয়ের গুণে নাটকটি মঞ্চ সফলতা পায়।

এরপর থেকেই অভিনয় সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের ধারণা পাল্টায়। তিনি বুঝলেন—

“অভিনয়ই আসল বস্তু। তাতেই অনেকখানি দর্শকের মনকে টানে।”^৯

যদি দৃশ্যের শুরুতেই স্থানটা বলে দেওয়া হয় তাহলেই অভিনয় চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। আর এরপরেই তিনি কোনো কিছু না নিয়েই নাটক অভিনয় করার কথা ভালবেন এবং করলেন ‘বিভাব’ নাটক। তাতে শুধু দৃশ্যপট নয় চরিত্র অনুযায়ী পোশাকের ব্যবহারও তিনি করলেন না। যেমন—পুলিশের চরিত্রে জন্য অভিনেতার এমনি পোশাকের উপর ক্রসবেস্ট পরিয়ে দিলেন। তাতেই ইঙ্গিতটা তিনি ঠিকঠাক দিলেন। আর টিকমতো ইঙ্গিতটা দর্শকদের বোঝাতে পারলেন বলেই নাটকটা সফল হয়েছিল।

এত কিছু পরেই প্রাবন্ধিকের মনে প্রশ্ন জেগেছিল একটি পরিপূর্ণ বাঙালি নাটকের চেহারা নিয়ে। কারণ বাঙালি বিদেশী নাটকের অনুকরণে নাটক দেখতে অভ্যস্ত। বাংলা নাটকের চরিত্র, সংঘাত, নাটকীয়তা সমস্ত কিছুই বিদেশী নাটকের অনুকরণে। তবে ইবসেনের নাটকের ভাবানুবাদ ‘দশচক্র’ দেখে প্রাবন্ধিকের মনে হয়েছিল যে প্রাচ্য চিত্রশিল্প মোটেও পাশ্চাত্যের শিল্পের অনুকরণে রচিত নয়। প্রাচ্য শিল্পের নিজস্ব একটা ভঙ্গি আছে। নাটকে বিদেশী ছাপ থাকতে পারে কিন্তু নাটকের কাঠামো অবশ্যই এদেশীয়। এই প্রসঙ্গ প্রাবন্ধিক ‘রক্তকরবী’ নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে বলেছেন—

“মনে হল পাওয়া গেছে একখানি বাঙালি নাটক। এর আদ্যোপান্ত সমস্তটাই বাঙালি।”^{১০}

পপুল্যারিটি :

প্রাবন্ধিক শম্ভু মিত্রের ‘অভিনয়-নাটক-মঞ্চ’ প্রবন্ধ গ্রন্থের প্রবন্ধ ‘পপুল্যারিটি’, ‘চতুরঙ্গ’ পত্রিকায় ১৩৬১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

প্রাবন্ধিকের মতে ‘পপুল্যারিটি’ শিল্পীদের কাছে এক ‘বিদ্যুৎগর্ভ কথা’। শিল্পীরা তাঁদের চিন্তার কথা, আনন্দের কথা, সকলের সঙ্গে ভাগ করে উপভোগ করতে চায়। আর এই উপভোক্তার সংখ্যা বাড়ে, ততই ব্যবসায়ীর আর্থিক উন্নতি ঘটে। সেই কারণেই ব্যবসায়ীরা উপভোক্তা বাড়ানোর একটা ফর্মুলা তৈরী করে শিল্পীদের উপরে চাপ দেয় সেই ফর্মুলা অনুযায়ী সৃষ্টি করার জন্য। ব্যবসায়ীদের কাছে শিল্পী হলেন ‘মুনাফা আনার মেশিন’। ফলে শিল্পী তাঁর আপন আবেগকে তাঁর রচনার মধ্যে ফুটিয়ে তোলার যে চেষ্টা করেছিলেন তা হারিয়ে গিয়ে সেস্থলে পড়ে থাকে শুধু দালালদের অনুজ্ঞা। আর অনুশাসন।

প্রাবন্ধিক আরো জানিয়েছেন যে—

“জনসাধারণের রায়ই হল সকল ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বিচার।”^{১১}

ফলে অনেক সৎ-নামা শিল্পীও জনপ্রিয় হওয়ার জন্য উৎসুক হয়ে ওঠেন। অপরদিকে লেখক শিল্পীরা যখন বুঝতে পারলেন যে বই লিখে পয়সা উপার্জন করা যায় তখন তারা এও বুঝলেন যে যদি সেই বই সিনেমা উপযোগী হয় তাহলে তা আরও পয়সা উপার্জনে সহায়ক হবে। এর ফলে তারা সিনেমা কোম্পানির ফর্মুলা অনুযায়ী কলম চালালেন। তার ফলে যতগুলি লোক বই কিনলে এক সংস্করণ নিমেষে শেষ হয়ে যায় ঠিক ততগুলি লোকই এখন এক সন্ধ্যাতে একসাথে নাট্যাভিনয় দেখেন। যেহেতু মঞ্চ নাটকের চেয়ে বায়স্কোপ একই সঙ্গে অনেক জায়গায় অনেক বেশি করে দেখানো যায় সেহেতু তাতে খরচ যেমন কম হয়, তেমনি লাভও হয় অনেক বেশি।

শম্ভু মিত্রের মতে, আমাদের বাংলাদেশে দলবিহীন কোনো মহত্তর শিল্পীকে তুচ্ছ করে,

অবজ্ঞা করে, নিন্দা করেও বিশেষ কোনো দলভুক্ত নিম্নস্তরের শিল্পীকে মাথায় তুলে নাচা হয়েছে। তাই বোঝায় যাচ্ছে কোনো দলের সঙ্গে যুক্ত থাকলে প্রচারের সাহায্য পাওয়া যায় অনেক বেশি। প্রসঙ্গ তিনি রবীন্দ্রনাথ ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন কখনও কখনও বস্তু থেকে কোনো লোককে তুলে এনে ফিল্মের নায়ক বা নায়িকা করা হয় এবং তার পূর্ব জীবন সম্পর্কে নানা কাহিনি ও সাম্প্রতিক জীবনের সামাজিক বা অসামাজিক প্রেমের কাহিনি ফিল্ম ম্যাগাজিনে ছাপা হয়। তাছাড়াও তাদের ছবি বড়ো কাপড়ের উপর টাঙানো হয় রাস্তার মোড়ে মোড়ে। আর আমাদের জনসাধারণ বিখ্যাত কোনো লেখক বা কোনো বিজ্ঞানীকে না চিনলেও ফিল্মের এই নায়ক-নায়িকাদের ঠিক চিনতে পারে। আর চিনতে পারে বলেই দেখামাত্রই তাঁদের ঘিরে ভিড় জমায়। এই হল পপুল্যারিটি। প্রাবন্ধিক শুনেছিলেন হলিউডের অভিনেতা অভিনেত্রীরা নাকি হঠাৎ হঠাৎ পালিয়ে যায় বা বিয়ে করে আবার সাতদিনের মধ্যে ডিভোর্সও দিয়ে দেন। এর কারণ নাকি কাগজে ছাপানোর মতো খবর তৈরি করা। যত কাগজে নাম বেরোবে ততই তাঁর জনপ্রিয়তা বাড়বে।

প্রাবন্ধিক এর অপরদিকে এমন মানুষের কথা বলেছেন, যারা বহু সাধারণ মানুষের থেকে বিশিষ্টতা লাভ করবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে থাকে না। প্রাবন্ধিকের মতে এরা হলেন রাজনৈতিক নেতা। কারণ কিছুদিন পর পর এরা এমন এককটি চমকপ্রদ কাজ করেন যে খবরের কাগজগুলোতে কয়েকদিন বেশ হৈ চৈ চলে। আসলে প্রতিটা মানুষই যৌবন পর্যন্ত অচেতন ভাবে বেঁচে মনে করেন চিরকাল শুধু তারাই বাঁচবে। কিন্তু যখন জীবনের রথচক্র অবিরাম খরস্রোতের দিকে একটু একটু করে এগিয়ে যায় তখনই শুরু করেন স্টান্ট মেরে বা বেলেল্লাপনা প্রকাশ করে লোকচক্ষুর সামনে নিজেকে খাড়া রাখা। তার ফলে যদি কোনো লোকের নাম অপরাধমূলক বা কোনো নোংরামিতে জড়িয়ে পরার জন্যও খবরের কাগজে ১৫-২০ বছর ধরে প্রায়শই প্রকাশ পায় তবুও সাধারণ মানুষ লোকটিকে কোনো দামি মানুষ হিসাবে ধরে নেয়। আর এখানেই প্রাবন্ধিকের প্রশ্ন—

“এইভাবে যে সভ্যতায় চিন্তাশীল লোকদের চেয়ে চিন্তাবিহীন লোকেরা বেশি

পার্লিসিটি পায় (এবং নির্বিরোধে) সে সভ্যতার দামী কত?”^{১২}

তবে এর পেছনে প্রাবন্ধিক সাধারণের অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও ছেলেমানুষিকে দায়ী করেছেন। অনেকে নাকি ওস্তাদি গান শোনার জন্য রাত্তিরে ফুটপাথে বসে থাকে। সাধারণত এদের লারেলান্গাই বেশি পছন্দের হয়। তাই উদয়শঙ্করের নাচের চেয়ে ‘শ্যামলী’ই বেশি জনপ্রিয় হয় কলকাতায়। এমনকি শিশিরবাবুর শ্রেষ্ঠকীর্তিগুলিও ফিকে হয়ে যায় ‘শ্যামলী’র বিক্রির হিসেবের সামনে।

প্রাবন্ধিকের মতে ব্যবসায়ীরা সিনিক হন। তাদের মতে—

“একটু হৈ চৈ করে কান্না, একটু ভাঁড়ামি করে হাসি, বেশ বকবাকে পোশাক,
আর এক থাবা সেক্স অ্যাপীল—ব্যস জমে কুলফি হয়ে যাবে। ...
জনসাধারণের মনের মতো না হলে পয়সা দেবে কেন?”^{১৩}

তবে রাজনৈতিক নেতাদের কাছে—‘পিপল স্বর্গ, পিপল ধর্ম, পিপলই পরমমতপ।’ তাই পপুলার না হলে সার্থকতা নেই।

আর এমন অবাঞ্ছিত অবস্থার মধ্যে সামাজিক কর্তাদের কাছ থেকে তারিফ না পেয়ে, সাধারণ লোকের থেকে নাচানাচি না পেয়ে অনেক নাট্যকার ও নাট্যগোষ্ঠীর এমন অবস্থা হল যে তারা দিশেহারা হয়ে পড়েন। শম্ভু মিত্র তাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন যে, ফিল্মের কর্তারা সাধারণত দুই ধরনের ছবি বানায়—একরকম যা স্কুল-কলেজের আধুনিকতার বাতিকগ্রস্ত ছেলেমেয়েদের জন্য। আর একরকম যা পৌরাণিক দেবদেবীদের নিয়ে, এগুলি মূলত মফস্বলের মেয়েদের জন্য। সুতরাং কোনো নাট্যগোষ্ঠী যদি দেখে যে তার ‘তনু-মন-ধন’ কোনো রাজনৈতিক বা ব্যবসায়িক নেতার উপরে নির্ভর করছে তবে তাদের অনুশাসন গুলোকে অনুসরণ করতে হবে। তা সে পলিটিক্যাল লেকচার হোক না সেক্স আপীল।

পারিপার্শ্বিক জীবন শিল্পীর মনে আলোড়ন জাগায় আর এই পারিপার্শ্বিক পরিবেশের যে-সব ঘটনা তাঁর অন্তঃস্থলে গভীর আঘাত হানে সেগুলোকেই তিনি রাঙিয়ে রসিয়ে অপরকে

জানাতে চান। প্রাবন্ধিকের মতে—

“কিছু গভীর কথা যদি গভীর ভাবে বলবার থাকে তার তবেই সে শিল্পী।
আর কেবলই যদি লোকের কোল কেড়ে বসবার চেষ্টা করে সে, কেবল যদি
মনোহরণ করাটাই উদ্দেশ্য হয় তার, তাহলে সে ভাঁড় মাত্র।”^{১৪}

এর কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, জনসাধারণের মন জুগিয়ে চলা শিল্পীর উদ্দেশ্য নয়, শিল্পীর উদ্দেশ্য হল নিজের মনের কথাটা সকলকে বুঝিয়ে দিয়ে তাদের দিয়ে স্বীকার করিয়ে নেওয়া। তা নাহলে সভ্যতার অগ্রগতির কোনোও মানে নেই। কারণ অগ্রগতি মানেই হল বিপ্লব। আর তার প্রতি পদক্ষেপেই নতুনের সঙ্গে পুরাতনের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের বীজ সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সুপ্ত থাকে। ক্রমে ক্রমে তা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে প্রকাণ্ড মহীরুহের মতো সামনে এসে দাঁড়ায়। তখন এই মহীরুহ স্বীকার করে তাকে ঘিরে তৈরী হয় গোঁড়ামির বেদী। রবীন্দ্রনাথকেও এই গোঁড়ামির বেদী দিয়ে ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। সেই কারণেই বহুসংখ্যক ‘রক্তকরবী’ অভিনয়ের অনুমতি নিয়ে এত গন্ডগোল, শুধু ‘রক্তকরবী’ নয়, ‘জলজলা’, ‘বৌঠাকুরাণীর হাট’ মালধের পরও গন্ডগোল।

গোঁড়ামির বেদীতে দেবতাকে চেপে রেখে যে মহাস্তুরা নিজেদের আসন রচনা করেন কিছুতেই এঁদের ইচ্ছা পূরণ হবে না। মহাস্তুরা যেদিন নিশ্চিন্ত হয়ে মিলিয়ে যাবেন অবহেলার ধুলোর সাথে সেদিনই আবার রবীন্দ্রনাথের যৌবন স্পর্শগ্রাহী, দৃষ্টিগ্রাহ্য ও প্রেমগ্রাহ্য হয়ে উঠবে।

প্রাবন্ধিক শম্ভু মিত্র জানিয়েছেন—রবীন্দ্রনাথ লোকপ্রিয় হবার চেষ্টা কোনোদিন করেননি। এমনকি অনেকদিন পর্যন্ত মোটেও তিনি লোকপ্রিয়ও ছিলেন না। শোনা যায় রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর শান্তিনিকেতনে ফিরলে একদল বড়লোক শান্তিনিকেতনে যান তাঁকে মালা দিয়ে অভিনন্দন জানাতে। রবীন্দ্রনাথ সেই মালা ছিঁড়ে ফেলে দেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই জানিয়েছিলেন যে, তিনি চাইলে দেশের লোকের কাছে লোকপ্রিয় হওয়া তাঁর পক্ষে কোনো শক্ত কাজ ছিল না।

তাই শিল্পী কেবল নিজের মনে মশগুল হয়েই শিল্প সৃষ্টি করেন না, বরং যেমন করে লেখকরা পাঠককে, অভিনেতা বা নাট্যকাররা দর্শককে বা আমরা যেমন করে বন্ধুর সঙ্গে বা প্রিয়ার সাথে কেবল তাদের মন জুগিয়ে কথা না বলে আমাদের মনের কথাও তাকে বোঝাতে চায় ঠিক তেমন ভাবেই শিল্পীরা তাঁদের শিল্পকলা সকলকে বোঝাতে চান। প্রত্যেক শিল্পীই তাঁর শিল্প সম্ভারকে সাজিয়ে-গুছিয়ে তোলেন ভোক্তার ভালোলাগার জন্য, যে মন করে একজন স্ত্রী গা ধুয়ে, পরিষ্কার শাড়ি পড়ে, চুল বাঁধে, কপালে ফোঁটা দিয়ে নিজেকে অপরাধী করে তোলেন তাঁর স্বামীর জন্য।

বিজ্ঞানীদের মতে সমাজ নিয়ত পরিবর্তনশীল। আর পরিবর্তনের প্রয়োজন জমে জমে হঠাৎ একদিন বিপ্লবের মধ্যদিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। ক্রমে ক্রমে বিদ্রোহের বীজ গোপনে শক্তি সংগ্রহ করে বাড়তে থাকে। প্রাবন্ধিক এই বিপ্লবের কারণ হিসাবে সময়ের সঙ্গে তাল রেখে কতকগুলো প্রয়োজনীয় পরিবর্তন না ঘটানোকেই দায়ী করেছেন। সুবিধাভোগী কতগুলো লোক নিজের সুবিধা বজায় রাখার জন্য সাধারণ লোককে কথার জালে ভুলিয়ে রাখে তার ফলে শিল্পীরা যখন ভবিষ্যৎকে অনুভব করে সেই কথা সাধারণকে বোঝাতে চান, তখন তারা তা বোঝে না। আর সুবিধাবাদীরা শিল্পীকে রক্তচক্ষে দেখে। এই রক্ষণশীল আর অগ্রচারীদের মধ্যে যুদ্ধ চিরকাল চলবে।

প্রাবন্ধিকের মতে, আমাদের দেশের নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস দেখলে এই পপুল্যারিটির একটা প্রতিফল লক্ষ্য করা যায়। প্রায় এক শতাব্দীকাল ধরে বাংলা মঞ্চে বহু নাটক বহু রাত্রি অভিনীত হয়ে মুদ্রারূপ স্নেহলাভে ধন্য হলেও আজও গৌরব করে বলবার মতো বাংলা নাটকের সংখ্যা নগন্য। যে কয়জন শক্তিদর নাট্যকার গভীর কথা গভীর ভাবে বলবার ক্ষমতা রাখতেন তাঁদের অবর্তমানে মঞ্চ গভীর আনন্দ দেওয়ার ক্ষেত্র থেকে নেমে এসে চমক দেওয়ার ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। শম্ভু মিত্র বলেছেন—

“ক্রমশ সেটা এমন জায়গায় পৌঁছলো যে নাটকের বক্তব্য চুলোয় গেল, তার সমগ্রতা চুলোয় গেল, রইল শুধু বিশিষ্ট অভিনেতাদের নিজস্ব প্যাঁচ দেখাবার

কয়েকটি দৃশ্য। আজও তাই ভাদুড়ি মশায় যে সে লোককে নিয়ে চর্বিচর্বি
করে যাচ্ছেন। কারণ, তিনি ভালো করেই জানেন যে, লোকে তো নাটক
দেখতে আসেন না, লোকে আসে তাঁকে দেখতে, তাঁর পঁচা দেখতে, তাঁর
মুদ্রাদোষ দেখতে।”^{১৫}

এই চমকানির মজায় দর্শকরা মজে থাকলেও অত্যাভিহীন কোনো জীবন প্রতিম নাটকের অভিনয়
দেখলে প্রশংসা করে। তবে একটা ‘কিন্তু’ থেকেই যায়।

প্রবন্ধের সমাপ্তিতে এসে প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন, মঞ্চ মালিক লোকেদের মন জুগিয়ে
পয়সা বানাতে গিয়ে মঞ্চকে করে তুলেছে জাতিভ্রষ্ট। অথচ যদি নির্ভীকভাবে প্রেমের কথা,
জীবনবেদের কথা বলতে চেষ্টা করত তাহলে মঞ্চের অবস্থা আজ গৌরবের হত। কিন্তু যেহেতু
অনেককে এই ক্ষেত্র থেকেই পয়সা রোজগার করতে হয় বাঁচার জন্য। তাই বাঁচতে হবে
অশ্লীলতাকে নিন্দা করে নতুনকে গড়বার প্রেরণা নিয়ে। নাহলে কেবলমাত্র পপুলার হবার চেষ্টা
করলে নিজেদের আত্মমর্যাদা নষ্ট হয়ে যাবে।

দর্শকের দায়িত্ব:

প্রাবন্ধিক শম্ভু মিত্রের ‘অভিনয়-নাটক-মঞ্চ’ প্রবন্ধ গ্রন্থে সংকলিত ‘দর্শকের দায়িত্ব’
প্রবন্ধটি ‘চতুরঙ্গ’ পত্রিকায় ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে মাঘ-চৈত্র সংখ্যায় ‘থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষক’ শিরোনামে
প্রকাশিত হয়।

এই প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন যে, থিয়েটার বা সিনেমা ভালো হচ্ছে না বলে যত
লেখা প্রকাশিত হচ্ছে তাতে বিশেষ কিছু সুফল হবে না। তাই কাজে কিছু করে দেখাবার সময়
এসেছে। সম্প্রতি ‘নতুন ইহুদী’ নাটকের অভিনয় যোগ্য প্রশংসা পেয়েছে, আবার ‘বহুরূপী’
নাট্যদলও প্রশংসা পেয়েছে। কিছুদিন আগে ‘গৈরিক পতাকা’ নাটকে বিভিন্ন অভিনেতার সমাবেশ
হওয়ায় এক সন্ধ্যাতেই সাত হাজার টাকার টিকিট বিক্রি হয়। এছাড়াও শ্রীরঙ্গমে ‘বিজয়া’
নাট্যাভিনয়ে শিশিরকুমার ভাদুড়ি, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলি, সরযুবালা ও স্টার লেখক শরৎচন্দ্রের
উপস্থিতির জন্য খুব বিক্রি হয়েছিল কয়েকদিন। তার এই টিকিট বিক্রিই জনপ্রিয়তার প্রমাণ।

প্রাবন্ধিক বাংলা রঙ্গমঞ্চের ক্রমাগত অবনতির জন্য দর্শক সমাজকে দায়ী করেছেন। তিনি বলেছেন রঙ্গমঞ্চের এই অবনতির জন্য শিল্পী এবং মালিকদের অনেক গালাগালি করা হয়েছে। যতটা দোষ তাঁদের নয়, তার থেকে বেশি তাঁদের দোষ দেওয়া হয়েছে। অথচ দর্শক সমাজ নিজেদের দোষ দেখেন না। মূলত টাকার জন্যই থিয়েটার চালানো হয়, কিন্তু যদি দর্শকরা তাল দেয় তাহলেই থিয়েটার বন্ধ হয়ে যাবে। তবে টিকিট বিক্রির হিসাবে দর্শকরা একথায় জানিয়েছেন যে—শিল্পের ধার তারা ধারে না, রোমাঞ্চ হলেই খুশি আর এই রোমাঞ্চের সঙ্গে খানিকটা গ্লামার থাকা প্রয়োজন। নাটক সম্পর্কে এমন মনোভাব কেবল অশিক্ষিত অনভিজ্ঞ দর্শকদেরই নয় বরং সমাজে যারা ‘অভিজাত শ্রেণী’ বলে পরিচিত সেইসব শিক্ষিত উচ্চচাকরে সদ্বংশজাত আধুনিক ইস্ত ভাবাপন্ন দর্শকদেরও একই মনোভাব। প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন কোনো এক বিখ্যাত অভিনেতা দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন—

“বুদ্ধিমান লোকগুলোও টিকিটের কাউন্টারফয়েলস এর সঙ্গে সঙ্গে আধখানা বুদ্ধি জমা রেখে হলে ঢোকেন। আর যত ন্যাকামি আর নাকিকান্না দেখে হাততালি দেন।”^{১৬}

তাঁর এই কথাটা উড়িয়ে দেবার নয়। তবে অনেকের মতে থিয়েটারে বর্তমানে দর্শক সংখ্যা কম হওয়া এটা প্রমাণ করে যে, দর্শকরা নাটক বোঝে। আর এখানেই প্রাবন্ধিকের প্রশ্ন হল—

“তাই যদি হয়, তাহলে যুদ্ধের মধ্যে অত বাজে বাজে অভিনয়, অত প্রভূত টাকা পেয়েছিল কী করে? সে টাকা কে দিয়েছিল?”^{১৭}

এই প্রশ্নের উত্তরে একজন বলেন যে, যুদ্ধের এই অস্বাভাবিক সময়ে অনেক বাজে লোক প্রচুর পরিমাণে কাঁচা টাকার মালিক হয়ে উঠেছিল। প্রাবন্ধিক এই উত্তর প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—

“... তখন বাজে লোকেরা টাকা পাচ্ছিল আর এখন কাজের লোকেরা—যথার্থ শিল্পবোদ্ধার টাকা পাচ্ছেন।”^{১৮}

অতএব প্রাবন্ধিকের মতে, থিয়েটারের তেমন অবনতি হয়নি। দেশের লোক যেমনটি

চেয়েছেন থিয়েটার তেমনই আছে। কেবল একটু গ্ল্যামারের ঘাটতি রয়েছে। যদি ইংরেজি ‘বলিয়ে কইয়ে’ মেয়ে আরো কিছু থিয়েটারে আনা যায়, আর যদি তাদের দিয়ে একটু ইংরেজি নাচ করানো যায়, তাহলেই থিয়েটারে আর ভিড় রোখা যাবে না। এই কথাটা মর্মান্তিক হলেও সত্য। শম্ভু মিত্র শিশিরকুমারকে অনেকবার বলতে শুনেছেন যে, দেশের লোক শিল্পের দাম দেয় না, মর্যাদা দেয় না। প্রথমে একথা শুনে প্রাবন্ধিক শম্ভু মিত্রের রাগ হলেও পরে তিনি বুঝতে পারেন যে, কতটা সত্য। শিশিরকুমারের অভিনয়ের যে সমস্ত সদৃশ্যগুলি ছিল তাঁর কোনো যোগ্য আলোচনা প্রাবন্ধিক পড়েননি। রঘুবীরের রঘুয়াতে রূপান্তরিত হওয়ার দৃশ্যে শিশিরকুমারের অভিনয়ের তুলনা করতে গেলে পৃথিবীর মহৎ শিল্পীদের সঙ্গে তুলনা করতে হবে। প্রাবন্ধিকের মতে—

“যে ভঙ্গিটা সাধারণ দৃষ্টিতে হাস্যকর, সেইটা কী করে বিরাট climax রচনা করতে পারে তা জানতে গেলে ঐ দৃশ্যের অভিনয় দেখা দরকার।”^{১৯}

একজন বাহন্ন বছরের মানুষ দুই পায়ে মল পরে স্টেজের ওপর দুহাত উপরে লাফালে হাসি পাওয়াই স্বাভাবিক। তবে এই হাসি হারিয়ে যাবে সেই অবিস্মরণীয় অভিনয় এখনো এছাড়াও প্রাবন্ধিক দুর্গাদাস বাবুর অভিনয় প্রসঙ্গে বলেছেন তাঁর খাদের গলায় কাজ করবার আদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। তিনি আবেগকে এমনভাবে প্রকাশ করতেন যা অন্য কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। অথচ তাঁর কথা কোথাও লেখা নেই। কিন্তু বিদেশী অভিনেতাদের শিল্প বিচার করা প্রবন্ধ অনেক পাওয়া যায়। প্রাবন্ধিক সেগুলি পাঠও করেছেন।

প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন যে, তিনি বেশ কিছু বিদেশী অভিনেতার মঞ্চাভিনয় দেখেছেন। তাঁদের মধ্যে সব চেয়ে খ্যাতনামা অভিনেতা John Gielgud এর ‘হ্যামলেট’ নাটকের অভিনয় তিনি দেখেছেন। তিনি এই অভিনেতার অভিনয় দেখে বুঝতে পারেন যে, আমাদের দেশের তৎকালীন প্রথম শ্রেণির অভিনেতারা প্রচুর শক্তিশালী। অথচ এই John Gielgud এর শিল্প সম্বন্ধে যত প্রবন্ধ শম্ভু মিত্র দেখেছেন বা স্যার লরেন্স অলিভিয়ার সম্পর্কে যত বিশ্লেষণ তিনি পড়েছেন, সেই তুলনায় আমাদের দেশের শিল্পীরা অবহেলিত, অবজ্ঞাত। প্রাবন্ধিক আরো জানিয়েছেন যে, আমরা রবীন্দ্রনাথকে খাতির করেছি তাঁর নোবেল প্রাইজ লাভের পর,

উদয়শঙ্করের নাচ দেখে মুগ্ধ হয়েছি তাঁর আমেরিকা, ইউরোপ সম্মানে ঘুরে আসার পর আর শিল্পস্টারদের খাতির করি তাদের রোজগারের পরিমাণ দেখে। এই প্রবন্ধের শেষে প্রাবন্ধিকের মতে—

“দর্শক সমাজের বুদ্ধির উপযুক্ত থিয়েটারই সম্প্রতি আছে, কোনও অধঃপতন হয়নি। কেবল আর একটু হিন্দি বায়স্কোপের মতো ধরণ ধারণ করে নিতে পারলেই কোনও গণ্ডগোল থাকবে না।”^{২০}

চরিত্রচিত্রণ (স্ট্যানিস্ল্যাভস্কি থেকে):

শম্ভু মিত্রের ‘অভিনয়-নাটক-মঞ্চ’ প্রবন্ধ গ্রন্থে সংকলিত সপ্তম প্রবন্ধ ‘চরিত্রচিত্রণ-স্ট্যানিস্ল্যাভস্কি থেকে’ ১৩৫৭ বঃ ‘চতুরঙ্গ’ পত্রিকায় কার্তিক-পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পত্রিকায় প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল—‘অভিনেতার জীবনে নতুন চরিত্রসৃষ্টি’।

প্রাবন্ধিক এই প্রবন্ধে জানিয়েছেন যে, একজন অভিনেতার জীবনে একটি নতুন চরিত্র সৃষ্টি করা যে কতটা বেদনাদায়ক আনন্দের তার একটা উপাখ্যান স্ট্যানিস্ল্যাভস্কির রচনায় পাওয়া যায়। এই উপাখ্যানে রয়েছে একজন পরিচালক তাঁর ছাত্রদের বললেন—

“আগামী পাঠের জন্য ছাত্রেরা যে যার ইচ্ছানুযায়ী এক একটা চরিত্র সেজে সেই চরিত্রানুযায়ী চলনে বলনে অভিনয় করে দেখাবে। তা সে যে চরিত্রই হোক। বণিক হোক, সৈনিক হোক, ইরানি বা স্পেনীয়, অভিজাত মশা বা ব্যাঙ, যা কিছু তোমাদের মনে ভালো লাগে। থিয়েটারের পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যে বেছে খুঁজে যে যার দরকার মতো জিনিস নিয়ে নাও।”^{২১}

এরপর ছাত্ররা পোশাক বিভাগে গিয়ে সকলেই চট্ করে নিজের পছন্দ মতো জিনিস নিয়ে চলে গেল। কিন্তু বিপদে পড়ল দুজন। এই দুজনের একজন হলেন ‘সোনিয়া’ নামের এক মেয়ে। তার বিপদ হল সে একটু লম্বা ধরনের। আর সুন্দর সুন্দর বিভিন্ন রকমের সজ্জাবস্তু দেখে সে মনস্থিরই করতে পারে না। দ্বিতীয় জন হলেন—কসতিয়া বলে এক ছেলে। সে কোন চরিত্রের সাজ সাজবে

তা সে ঠিকই করতে পারে না। তাই পোশাক দেখতে দেখতে কেবলই আশা করছে যে, দৈবাৎ একটা বুদ্ধি তার মাথায় আসবে। হঠাৎই তার নজরে পড়ে একটি ‘মর্নিং কোট’। কোটটি অদ্ভুত কাপড় দিয়ে তৈরি। যেন কিছুটা বালি রং, সবুজ রং ও ধোঁয়াটে রঙের সংমিশ্রন। তার উপরে আবার রঙটা ফ্যাকাসে হয়ে গিয়ে তাতে ধুলো আর ছায়ের দাগ লেগেছে। কসতিয়া ভাবল এই কোটটি পড়লে তাকে প্রেতের মতো দেখাবে। আর তার সাথে যদি মিলিয়ে টুপি, হাতমোজা ও ধুলোপড়া জুতো পড়ে পরচুলা ও মেকআপও যদি সেই ধরনের করতে পারে তাহলে তাকে অমঙ্গলবহ বলেই মনে হবে।

পোশাক-বিভাগের লোকেরা তার জন্য কোটটা আলাদা করে রাখল এবং বাকি জিনিসগুলোও জোগাড় করে রাখবে বলল। তবুও যতক্ষণ সময় বাকি ছিল তার মধ্যেও সে পোশাকের গাদার মধ্যে তন্ন তন্ন করে নতুন কিছু পাওয়ার আশায় খুঁজতে লাগল। সেখান থেকে ফেরার পথে কসতিয়া ভাবতে লাগল যে, সে কোটটি পড়ে কোন চরিত্র ফুটিয়ে তুলবেন? ছদ্মবেশের আসর হওয়ার কথা তিনদিন পরে। এই তিনদিনে কসতিয়া তাঁর নিজস্ববোধ হারিয়ে ফেলে যেন দুজন ব্যক্তিত্বের মানুষে পরিণত হয়েছে। যাকে সে নিজের মধ্যেই খোঁজার জন্য হাতড়াচ্ছে, কিন্তু পাচ্ছে না। কোনো কাজেই সে মন দিতে পারছে না। কোনো জিনিসের দিকে সে তাকাচ্ছে তবে সেই তাকানো যেন ভাসা ভাসা। শুনছে তবে তাও যেন আধ কান দিয়ে। তিনদিন এমন যন্ত্রনার মধ্যে দিয়ে কাটালেও কী ছদ্মবেশ সে ধরবে তা সে ঠিকই করতে পারল না। শেষে একদিন রাতে হঠাৎ সে জেগে ওঠে, তার মনে হয় সবকিছু যেন স্পষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু এই স্পষ্টতা আর বেশিক্ষণ রইল না। সবসময়ই কসতিয়ার মনে হচ্ছে সে ভুল করছে কিন্তু সেই ভুলটা সে ধরতে পারে না। একদিন আনমনে চলতে চলতে তার মনে হলে সে বিস্মীভাবে হাঁটছে এ হাঁটা তার নিজের হাঁটার মতো নয়। আবার একদিন রাতে ঘরে পায়চারি করতে করতে সে হাত কচলাচ্ছিল। তাতে সে অবাক হয়ে ভাবল এরকম হাতকচলাতে সে কাকে, কোথায় যেন দেখেছে। তার হাতের চেটোগুলো লাল আর হাত দুটি খুব সরু আর ঘামে ভিজে ঠাণ্ডা।

ছদ্মবেশের আসরের তারিখ এসে গেলেও কসতিয়া কিছুই ভাবতে পারেনি। সাজঘরে

বাকি ছাত্রদের কোলাহল তাকে আরও উদ্ভ্রান্ত করে তোলে। অন্য সকলে চমৎকার সেজেছে। তাই নিয়ে হাসি-ঠাট্টা-প্রশংসায় সাজঘর মুখরিত। কিন্তু মেকআপ ম্যান কসতিয়ার মুখটা নিজের মতো সাধারণ থিয়েটারি রং করে চলে গেল। তাতেই কসতিয়া আরো হতাশ হয়ে পড়ল। সাজশেষে অন্যরা পরিচালককে দেখাতে গেলেও কসতিয়া গেল না। কারণ তার কিছুই ঠিক তার মনোপুংত হয়নি। শেষে মুখ থেকে রং তোলার যে ক্রিম ছিল, তাই নিয়ে সে মুখে ঘষতে লাগল। ঘষতে ঘষতে মেকআপের সব রংগুলো মিলে গিয়ে পুরো মুখটা সবজে ধোঁয়াটে হলদেটে একটা চেহারা পরিণত হল। সেই রং খানিকটা সে পরচুলা ও দাড়ি গোঁফে লাগিয়ে দিল। তার চুলে কতগুলো জট বেঁধে দিল। তার উপরে কসতিয়া মুখে অনেক পাউডার লাগালো ও হাতের চেটোগুলো লাল ও উল্টো দিকটায় সবজে করল। এতক্ষণে সে চরিত্রটাকে বুঝতে পেরেছে। এরপর টুপিটাকে একটু বাঁকিয়ে, প্যান্টালুনের ভাঁজের মধ্যে পা-টাকে খাপ খায়াতে আঙুলগুলো ভিতরদিকে বাঁকিয়ে নিল। তার ফলে তাঁর চলনটাও বদলে গেল। এরপর সে হাতে একটা ছড়ি তুলে নিল। শুধু বাকি থাকল একটা পালকের কলম। একটা ছেলে সেই কলম জোগাড় করে এনেদিল।

এইটুকু সময়ের মধ্যেই কসতিয়ার পরিবর্তন ঘটেছে। তার নড়া-চড়া, ভাব-ভঙ্গি সমস্ত কিছু বদলে গেছে। তার তীক্ষ্ণ পলকহীন চাঁউনির সামনে সহকারী পরিচালক রাখমানভ পর্যন্ত ভয় পেয়ে যায়। রাখমানভকে কসতিয়া জানায় যে সে হল ‘সমালোচক’। মঞ্চে গিয়ে কসতিয়া একটু আড়ালে বসে রইল যাতে মাঝে মাঝে তার টুপি আর মুখের একপাশটা সবার নজরে পড়ে। হঠাৎ কসতিয়া শুনতে পেল, পরিচালক বলছেন—

“ওখানে কে? ওই চুল্লিটার পেছনে কে যেন রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। ও খানে কে হে?”^{২২}

কসতিয়া এগিয়ে এসে বলে—

“আমি সমালোচক।”^{২৩}

তারপর বাঁকা পায়ে একপাশে কাত হয়ে টুপি খুলে নত হয়ে মাথা নোয়ালো কসতিয়া। তারপর আবার সে আগের জায়গায় গিয়ে বসল। এরপর পরিচালক মঞ্চের পাদপ্রদীপের কাছে কসতিয়াকে আসতে বলে প্রশ্ন করলেন সে, সে কীসের সমালোচক? সে নিজে মূর্খ হয়ে কীসের সমালোচনা করবে? তার উত্তরে কতিয়া বলল—

“মুখ্যুরাই তো সবচেয়ে বেশি সমালোচনা করে ... যে লোক কিছু জানে না সেই তো আবার মাস্টার হয়।”^{২৪}

কসতিয়ার উত্তরে পরিচালক রেগে চোঁচিয়ে বলেন—

“তুমি সমালোচকই নও। তুমি যাকে বলে ছিদ্রাশ্বেষী তাই। তুমি হলে জেঁকের মতো, উকুনের মতো, তোমার কামড়ে বিষ নেই। কিন্তু জীবন অতিষ্ঠ করো তোমরা।”^{২৫}

কসতিয়াও বলে ওঠে—

“ভালো, ভালো, খুব ভালো। কিন্তু অত সহজ নয় একটা জেঁক ঝেড়ে ফেলা। ... জেঁক মানে নিশ্চয় কোথাও জল আছে ... জল মানে আরও জেঁক ... তাদের তাড়ানো অত সহজ নয় ... আমাকেও নয়।”^{২৬}

এরপর পরিচালক একটু ইতস্তত করে কসতিয়াকে জড়িয়ে ধরে বললেন—‘চমৎকার হয়েছে’ কসতিয়াও খুশি হয়।

প্রাবন্ধিক শম্ভু মিত্রের মতে, কসতিয়ার খুশির কারণ হল একজন অভিনেতার বড়ো গুণ হল একটা চরিত্রের মধ্যে ডুবে থেকে বাঁচা। তাই সমালোচকের অভিনয় করতে গিয়ে কসতিয়া তার নিজস্ব বোধকে হারিয়ে ফেলেন। বরং নিজের রূপান্তরটা নিজেই খুশি হয়ে লক্ষ্য করে ছিল।

আন্দোলনের প্রয়োজন:

শম্ভু মিত্রের ‘আন্দোলনের প্রয়োজন’ প্রবন্ধটি ‘চতুরঙ্গ’ পত্রিকায় ১৩৫৮ বঃ প্রকাশিত হয়।

প্রাবন্ধিক শম্ভু মিত্র এই প্রবন্ধের শুরুতেই জানিয়েছেন যে, তিনি ‘নাট্যসাহিত্যে যে খুবই দুর্বল’ এ সম্বন্ধে কোনো দ্বিমত শোনে ননি। কিন্তু এদেশে শিল্পের ক্ষেত্রে অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটলেও নাট্যসাহিত্যে ত দুর্বল হয়ে পড়ার কারণ নিয়ে প্রাবন্ধিকের প্রশ্ন—

“মানুষের শরীর যখন পুষ্টি লাভ করে তখন তার সারা শরীরটাই পুষ্ট হয়, হঠাৎ কেবল এক হাতের গুলটা বা পায়ের ডিমটা ফুলে ফেঁপে ওঠে না। আমাদের নাট্যমঞ্চ থেকেও সর্বজন স্বীকৃত শিল্পী প্রকাশ হয়েছে। যেমন— গিরিশচন্দ্র, শিশিরকুমার। এঁদের বুদ্ধিমত্তা, পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ শিল্পবোধ সমসাময়িক কালে ছাপ রেখে গেছে। তবু কেন বাংলাদেশে নাট্যসাহিত্য সৃষ্টি হল না?”^{২৭}

আর এই কথাটি নিয়ে বারবার ভাবতে ভাবতে ও আলোচনা করতে করতে প্রাবন্ধিকের মনে হয়েছে এর কারণ একটা নয় বরং অনেকগুলো। তিনি শচীন সেনগুপ্ত মহাশয়ের উল্লেখ করা কারণকে যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেছেন। শচীন সেনগুপ্তের মতে, মাইকেল মধুসূদন দত্ত বা দীনবন্ধু মিত্র যে নাটক সৃষ্টির ধারা শুরু করেছিলেন তার গতিকে যদি অব্যাহত রাখা হত তাহলে আজ হয়ত নাটকই হত বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে শক্তিশালী স্তম্ভ। কিন্তু মধুসূদন ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রৌঁ’ লিখে হলেন পুরোনো পন্থীদের বিরাগভাজন। ফলে তাঁর নাটক বন্ধ করা হলো। আবার তথাকথিত নব্যবাবুরা রেগে গিয়ে বন্ধ করেন তাঁরই ‘একেই কী বলে সভ্যতা?’ অন্যদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা বন্ধ করেন দীনবন্ধু মিত্রের নাটকগুলি। তাঁর ‘সধবার একাদশী’ কে অশ্লীলতার দোষে দুষ্ট ও ‘নীলদর্পণ’কে একটি বিশেষ জাতির প্রতি দর্শককে ক্ষেপিয়ে তোলার দায়ে বন্ধ করা হয়। আর এই কারণে বোঝা যাচ্ছে, গল্প-উপন্যাস-কবিতা ইত্যাদি চেয়ে নাটকের প্রতিক্রিয়া বেশি দ্রুত ও শক্তিশালী বলে ব্রিটিশ শক্তি বা দেশের কুসংস্কার শক্তি প্রথম থেকেই সাহিত্যের এই শাখার প্রতি বিরূপ হয়ে তার উপর খড়গ চালনা শুরু করেন। আর এদের সাহায্য করেছিল দেশের ব্রাহ্ম গোঁড়ামি।

এমন পরিস্থিতির মধ্যে গিরিশচন্দ্রের লেখা ‘প্রফুল্ল’ একটি উৎকৃষ্ট সামাজিক নাটক।

এমন নাটক বাংলা মঞ্চে আজও বিরল। তবুও নাট্যসাহিত্য জন্মে উঠল না। আর এর কারণ হিসাবে শঙ্কু মিত্রের মনে হয়েছে, সেই সময়ের ইংরেজি শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মানুষের চিন্তা-ভাবনার পার্থক্য। তবুও রবীন্দ্রনাথ নাটককে ভালোবেসে লিখেছেন অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য নাটক। কিন্তু বাংলা মঞ্চে সেগুলো বিশেষ অভিনীত হয়নি।

প্রাবন্ধিকের মতে, বিদেশ থেকে থিয়েটার এলেও গিরিশচন্দ্র তাঁর আপন প্রতিভা বলে সেই থিয়েটারকে দেশীয় যাত্রার ঢঙে সাজিয়ে তুলে তাকে দেশীয় লোকের কাছে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। আর রবীন্দ্রনাথের ‘বিসর্জন’ও এই আইনে লেখা যা একসময়ে বাংলার প্রিয় নাটকগুলির একটি হয়ে উঠেছিল। তবে তা অনেক পরে।

এরই মধ্যে বাংলা মঞ্চে ইংরেজি নাটকের অনুকরণ শুরু হয়েছে। মঞ্চ মালিকদের একটি বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছে যে, দর্শকরা বোকা এবং তাই তাদের খুশি করার জন্য মোটাদাগের জিনিস প্রয়োজন। এর ফলে—‘সতীর সতীত্ব আর পতির পতিত্ব’ প্রেমময়ী বেশ্যানারী লোভহীন চিত্র’

এইসব কাহিনি নিয়ে বিদেশী রীতিতে নাটক তৈরি হচ্ছে। এর উদাহরণ হিসাবে শঙ্কু মিত্র শরৎচন্দ্রের ‘পল্লীসমাজ’-এর ‘রমা’তে রূপান্তরিত হওয়ার কথা বলেছেন। তিনি ‘রমা’ সম্পর্কে বলেছেন—

“সমাজের যে গন্ধটুকু আসল উপন্যাসে ছিল সেটাকে খর্ব করে এটাকে কেবল এক বিধবার প্রেমকাহিনিতে পর্যবসিত করানো হল।”^{২৮}

রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির মধ্যে কেবলমাত্র ‘বিসর্জন’, ‘চিরকুমার সভা’, ‘শেষরক্ষা’কে গ্রহণ করা হয়। অথচ তাঁর কালজয়ী নাটক ‘মুক্তধারা’, ‘রক্তকরবী’, ‘রথের রশি’, ‘রাজা’ পেশাদারি মঞ্চেও কাছে, পণ্ডিত ব্যক্তিদের কাছে কেবল অবজ্ঞাতই থেকে গেছে। রবীন্দ্রনাথের এই নাটকগুলি সম্পর্কে সকলের ধারণা ছিল যে, এগুলি রবীন্দ্রনাথের ছেলেমানুষির ফসল। তিনি নাটক লিখতে জানতেন না, পরবর্তীকালে তার ‘তপতী’ নাটকের অভিনয় করা হলেও সেটি সফল হয়নি। অবশ্য নকল কিছু লোক যারা নিজেদের ‘Vested interest’ এর জন্য রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা

করতেন এর তারাই রবীন্দ্রনাথের নাটকের অভিনয় করে বাঙালি দর্শকের কাছে রবীন্দ্রনাথকে অপ্রিয় করে তুললেন।

প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন, এই রবীন্দ্রনাথই বাংলাদেশের মানস আবিষ্কারের চেষ্টা করেছিলেন তাঁর নাটকের মধ্য দিয়ে। শম্ভু মিত্র মনে করেন—

“সেই নাটক যখন দেশের অলিতে গলিতে ছড়িয়ে পড়বে কেবলমাত্র নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে আধো আধো ন্যাকা বুলিতে নয়—তখনি খাঁটি বাংলা নাটকের নাট্যকার আসবেন।”^{২৯}

তাই ভবিষ্যতে সুন্দর সম্পূর্ণ নাটকের যুগে পৌঁছতে হলে রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে এগোতে হবে। তবে তার জন্য অনেক দেরি হয়ে গেছে।

শম্ভু মিত্র মনে করেন, আমাদের দেশে দামী লোকেরাই মঞ্চে সূচনা করেছিলেন। আর এদেশে মহৎ শিল্পীও আবির্ভূত হয়েছেন, ভালো নাটকও অভিনীত হয়েছে তবুও থিয়েটারের সম্মান নেই। ‘শ্যামলী’ ৩০০ রাত্রির বেশি অভিনীত হলেও যোগ্য সম্মান পায়নি। সেই তুলনায় ‘সীতা’, ‘ষোড়শী’ বেশি সম্মান পেয়েছিল। যেমন প্রচুর বিক্রি হওয়ার পরেও ‘মরণের পরে’ ও ‘মা ও ছেলে’ কে নিয়ে কেউ গৌরব করে আমাদের দেশের সার্থক শিল্প সৃষ্টি বলে না, তেমনি ‘শ্যামলী’কে নিয়েও কেউ গর্ব করে না।

তবে দেশকে নিয়ে গর্ব করেছে নবনাট্য আন্দোলনে যুক্ত দলগুলো। তাই প্রাবন্ধিক বলেছেন—

“... এই আন্দোলনকে বাঁচতে হবে, বাড়তে হবে, আর এর প্রয়োজনীয়তাকে সার্থক করে তুলতে হবে।”^{৩০}

ফলে পেশাদারি রঙ্গমঞ্চে বাইরে যতজন সৃষ্টিকামী সং ব্যক্তি বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীর মধ্যে কাজ করেন, তাদের মনে রাখতে হবে যে, তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হল বর্তমানের দায়িত্ব। বাংলাদেশে কোনো প্রতিষ্ঠান টেকে না, বা বাঙালিরা একত্রে কাজ করতে পারে না এমন

সব মতামত মানুষের মধ্যে প্রচলিত হলেও একথা মনে রাখতে হবে যে, যদি কোনো একটা দল না টেকে তাহলে সেই দলের কাজ অন্য দল এসে করে দেবে। প্রয়োজনের দাগিদই দলকে টিকিয়ে রাখবে। তবুও প্রাবন্ধিক মনে করেন নাট্যদলগুলোর এ ব্যাপারে সাবধান হওয়ার প্রয়োজন। আর যে কারণে জাতীয় রঙ্গমঞ্চ কেবলমাত্র পেশাদারি রঙ্গমঞ্চে পরিণত হয়েছে সেগুলোকে এড়িয়ে চলতে হবে। পরস্পরের মধ্যে মত পার্থক্য, নিজের মতো করে আলাদাভাবে জিনিস গড়বার চেষ্টা করা অত্যন্ত ভালো লক্ষণ হলেও খেয়াল রাখতে হবে এর মধ্যে যেন বিদ্রোহপ্রসূত পরচর্চা বা অশোভন ব্যক্তিগত ইঙ্গিত সে না এসে পড়ে। এতে সকলের ক্ষতি।

একটি নাট্যদলের প্রত্যেকেরই নাটক সম্পর্কে বা অভিনয় সম্পর্কে বা নির্দেশনা সম্পর্কে বিভিন্ন মত ও ধারণা থাকতে পারে। আর এই বিভিন্ন মত নিয়েই তাদের কাজ নিয়ে আলোচনা করলেই তাদের দ্বারা সৃষ্ট শিল্প সর্বাঙ্গীন সুন্দর হয়ে উঠবে। তবে শুদ্ধ আলোচনার পরিবর্তে যদি ব্যক্তিগত কুৎসা আলোচিত হয় তবে দলের দুর্দিন আসন্ন একথা মনে রাখতে হবে। শঙ্কু মিত্র জানিয়েছেন পেশাদারি রঙ্গমঞ্চে এই রোগের বর্ণনা রয়েছে মহর্ষি শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের থিয়েটার প্রসঙ্গ নিয়ে লেখা ‘মেরে দেওয়া’ প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন নট-নটীদের পরস্পরকে মেরে দেওয়ার প্রবনতার জন্যই নাটক মরেছে আর নাট্যালয়ও মরেছে।

প্রাবন্ধিকের মতে, নাট্যদলের সকলকেই মনে রাখতে হবে যে, যেখানে তারা মহড়া দেয় সেই জায়গা মন্দিরের মতো পবিত্র। সেখানে তারা সাধনা করার জন্য যায়, ইতরতা বা অভদ্রতা করার জন্য নয়। মন্দিরে যাওয়ার মতো শুচিতা নিয়ে সেখানে যাওয়া উচিত। আর নিজেদের সাধ্যমতো সেই স্থান পরিষ্কার রাখতে হবে যাতে সেখানে গেলে মন প্রফুল্ল হয়।

এছাড়াও নাট্যদলের প্রত্যেককে মনে রাখতে হবে যে, ‘নাট্যাভিনয় হল সমবেত চেষ্টার ফল।’ আর প্রত্যেক কর্মীর কঠোর নিয়মানুবর্তিতাই পারে তাঁদের সমবেত চেষ্টাকে সফল রূপ দিতে। তবে এই নিয়মানুবর্তিতা কারো উপর জোর করে চাপানো যায় না। কারণ নাট্যাভিনয় হল কর্মীদের আবেগ, অন্তঃকরণ নিয়ে কাজ। প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন, নাট্যগোষ্ঠীর মধ্যে এমন অনেক কর্তব্যক্তি থাকেন যারা অন্যান্য দিকে খুব ভালো, সিরিয়াস, কর্মক্ষম কিন্তু অপরদিকে iron

discipline-এর ভক্ত তার ফলে তাঁরা অনেক সময় প্রতিষ্ঠানকে পতনের সম্মুখীন করে তোলেন। তাঁদের বোঝা উচিত এটা অফিস নয় আর এখানে কাজের পদ্ধতি ও কাজ করাবার পদ্ধতিও আলাদা।

তবে শম্ভু মিত্র এই নিয়মানুবর্তিতা নিয়ে নিজের মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে সবাইকে সর্বাপ্তে মনে রাখতে হবে যে, তাঁরা প্রত্যেকে কাজটিকে ভালোবেসেই একটা দলে স্বেচ্ছায় জড়ো হয়েছেন। তাই ভালো অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে অবশ্যই সম্মান দিতে হবে। তবে তাঁরা যদি কাজের ক্ষতি করেন তাহলে তাঁদের মাপ করা উচিত নয়। তবে তার মানে এই নয় যে অল্প শক্তিমান লোকেরা ডিসিপ্লিনের নামে বেশি শক্তিমানদের উপরে চোখ রাঙাবে। এঁদের মধ্যে গোলমালটা বাঁধে যে, কোন কাজটা হানিকর বা কোন কাজটা মঙ্গলকর তা নিয়ে। অথচ যদি কাজের উদ্দেশ্যটা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা সবার মধ্যে থাকে তাহলে ঝামেলাটা অনেকাংশে কম হবে। এই বোধটা যত পরিষ্কার হবে সবার কাছে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যও তত সফল হবে। আর যার মধ্যে এই বোধ স্পষ্ট তাঁর মধ্যে নিয়মানুবর্তিতাও সুকঠোর। নিয়মানুবর্তিতা হল ব্যক্তির নিজস্ব ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা। তাই ভালো অভিনেতা হতে গেলে কঠিন পরিশ্রম ও সংযম করতে হবে। প্রাবন্ধিক শম্ভু মিত্র ভালো অভিনেতার হওয়ার জন্য কিছু উপদেশ দিয়েছেন এই প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন—

“প্রত্যহ গলা সাধতে হবে, শরীর ঠিক রাখতে হবে এবং যেখানে যত কিছু নাট্য প্রযোজনার নূতনত্ব হয়েছে তার সম্পর্কে জানতে হবে, অভিনয়ের বিবরণ পড়তে হবে এবং নাটককে সাহিত্য হিসাবে বুঝতে হবে।”^{৩১}

তবে এমন অভিনেতার সংখ্যা নিতান্তই নগন্য।

এরপর প্রাবন্ধিক নাট্যদলের সময়ানুবর্তিতার কথা বলেছেন। তাঁর মতে, যদি দলের কেউ ঠিক সময়ে আসার সম্পর্কে কোনো কেয়ার না করেন তাহলে তিনি মিথ্যাবাদী। দল বা সমিতি হল একটা পরিবারের মতো। তাই যদি দল বা সমিতির কেই বাইরে ‘বেলেগ্না’ করে তাহলে কিন্তু সংঘেরই সুনাম নষ্ট হয়। ফলে সামাজিক আইনের মতো নাট্য সমিতিতেও নানা

আইন-শৃঙ্খলা তৈরি করতে হবে। এবং শিল্পবোধের উন্নতি অনুযায়ী আইনের ধারাও পান্টাতে হবে। এই আইন তৈরি করা বা রক্ষা করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। কারণ মানুষ খুব আত্মকেন্দ্রিক। তবে দলে বা সমিতিতে যখন কোনো আলোচনা হবে, তখন সবাইকে মন খুলে নিজের চিন্তাধারাকে সবার সামনে উপস্থাপিত করতে হবে। তা না হলে দলের সুবিধা বা অসুবিধাগুলো সঠিকভাবে বোঝা যাবে না। তাই মন খুলে কথা বলা ও আলোচনা করা দলের মঙ্গলের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু দলের মধ্যে এমন অনেকেই থাকেন যারা কাজটাকে দলের নয়, কেবল তার নিজের কাজ হিসেবেই দেখে। তাই তাদের রাগ হলে হয় চুপচাপ থাকে নাহলে আস্তে আস্তে সরে যায়, হয়তো ঝগড়া করে। এমনই যদি কেউ সতর্ক করে তাহলে দলের বাকিদের ধৈর্যের সাথে তাঁকে উত্তর দিতে হবে।

তাই সকলে মিলে বসে দলের মূল কথা বা আইন প্রণয়নের পাশাপাশি অনেক কাজের ভার ব্যক্তি বিশেষের উপর দিতে হবে। তবে এমন অনেকে আছে যাদের ছকুম করলেই রাগ করে। মনে মনে ভাবে তাঁদের ‘এক্সপ্লয়’ করা হচ্ছে। এঁদের উদ্দেশ্যে প্রাবন্ধিক বলেছেন—

“ভীষণ সাম্যবাদী দেশেও যদি সাধারণ সৈনিক রাত্রে জেগে পাহারা দিতে অস্বীকার করে এবং বলে যে সেনাপতি যদি রাত্রে পাহারা না দেয়, তাহলে আমিই বা রাত জাগব কেন। তাহলে তাকে কোর্টমার্শাল করা হয়। গাড়ির পেছনের চাকাটা যদি বলে যে সামনে চাকাটা কেন আগে আগে যাবে, আমিও যাব, তাহলে সেটা গাড়ির অগ্রগতিরই বিরুদ্ধতা করে।”^{৩২}

মানুষ সবাই এককাজে সমান পারদর্শী হয় না। তাই পারদর্শীতা অনুযায়ী দলের সকলকে কাজ করতে হবে। নাহলে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য বলতেন—

“শূন্যকে যত সংখ্যা দিয়েই গুণ করো না কেন, গুণফল তার শূন্যই হবে।”^{৩৩}

তাই দলের মধ্যে এমন একটা পরিবেশ তৈরি করতে হবে যাতে কারোর উপরে জোর করে অধিকার ফলানোও যাবে না, আবার কারোর সম্মানহানিও করা যাবে না। অর্থাৎ আইন থাকবে

তবে সে কাজের অনুপ্রেরণাকে নষ্ট করবে না, আবার নশ্রতা থাকবে তবে ভীতি থাকবে না। এ ব্যাপারে দলের শীর্ষস্থানীয়দের দায়িত্ব থাকে বেশি। দলে নতুন লোক এলে, পুরোনোদের তাঁদের সঙ্গে ব্যবহারের যাতে ঠিক থাকে সে ব্যাপারে শীর্ষস্থানীয়দেরই লক্ষ্য রাখতে হবে। এই প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক স্ট্যানিসল্যাভস্কির একটি উক্তির ভাবার্থ উল্লেখ করেছেন, রাস্তার কুকুরদের দলে যদি বে পাড়ার কুকুর আসে তাহলে তারা খেঁকিয়ে উঠে তাকে কামড়াতে যায়। নতুন কুকুরটি যদি শক্তিশালী হয়, আর কুকুরগুলিকেই যদি কামড়ে খিমচে শিক্ষা দিতে পারে তাহলেই সে সসম্মানে এই দলের এলাকায় থাকতে পারে। নাহলে—

“সর্বাস্থে স্বজাতীয় বান্ধবদের কামড়ের চিহ্ন বয়ে তাকে পালাতে হয়।”^{৩৪}

প্রাবন্ধিক এখানে আরো একটি বিপদের কথা বলেছে সেটি হল দলের সুনাম। তিনি বলেছেন, যদি কোনো দলের সুনাম বেশি হয় তাহলে সেই দলের প্রত্যেকেই সেই সাফল্য ব্যক্তিগত ভাবে উপভোগ করতে চায়। দলের কোনো লোক কোথাও গেলে সেখানকার লোক যদি তাদের নাটকের ভূয়সী প্রশংসা করেন, তাহলে সে এমন একটা ভাব দেখায় যে, সে ছাড়া এমনটা হত না। আর এর ফল হয় মারাত্মক। প্রাবন্ধিক অনেকবার দেখেছেন যে, উৎসাহী লোকেরা মিলে একটি সুন্দর নাট্যাভিনয় করে নাম ও প্রচুর প্রশংসা অর্জন করলেও দ্বিতীয় কোনো নাটক তাঁরা অভিনয় করতে পারে না। তার আগেই ঝগড়া করে প্রত্যেকে পেশাদারি জগতে যাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে।

পরমহংসদেবের একটি সুন্দর উপমা প্রাবন্ধিক এই প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন—

“বাড়ির যে ঝি, সকালে এসে যখন থেকে কাজ শুরু করে তখন সে যেন বাবুদের বাড়িরই একজন লোক হয়ে যায়, সে বাড়ির ছোট ছেলেকে আদর করে, কোলে নেয়। পড়ে গেলে ‘আহারে’ বলে কোলে তুলে নিয়ে তাকে ভোলায়, কিন্তু তার মন সবসময় পড়ে থাকে নিজের কুঁড়ে ঘরে নিজের যে বাচ্চা ছেলেটি আছে তার প্রতি, এবং এ সব কাজকর্ম সে করে আসলে তারই জন্য।”^{৩৪ক}

প্রাবন্ধিকের এই উপমা উল্লেখের কারণ হল, তাঁর মতে, অভিনেতারাও যেখানেই কাজ করুন না কেন, তাঁদের মন পড়ে থাকা চাই দলের প্রতি। কতক্ষণে সে সেখানে যাবে, সেখানকার লোকেদের সাথে মিশবে, সেখানে কাজ করবে, এই অনুভব যদি তাঁদের মধ্যে থাকে তাহলে কোনো অভিনেতা পেশাদারি কাজ করলেও দলের কোনো ক্ষতি হবে না। তবে যদি এই অনুভব তাঁদের মধ্যে না থাকে তাহলে দেখা যাবে পেশাদারি কাজে যোগ দেবার সঙ্গে সঙ্গে দলে নিয়মিত আসবার সময় তাঁর হচ্ছে না। আর এঁরা যতদিন দলে থাকবে ততদিন নিজেদের গা বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করবে। দলের কোনো ভার যদি এসেও পড়ে তবে ‘বাজার মুখে’ সেটা পালন করে। দলের কর্তাস্থানীয়দের এঁরাই তোষামোদ করে।

তবে অনেকে এমন কথা বলে থাকে যে, তাকে ‘Exploit’ করা হচ্ছে। কিন্তু নবনাট্য আন্দোলন বহরে এতটা বড়ো নয় যে সেখানে Exploitation চলতে পারে। এখানে সাধারণত ক্ষমতার প্রমাণ দিয়েই কাউকে বড়ো হতে হয়। তাই কারো ক্ষমতা থাকে তাহলে তাঁকে দলের কাছে সুযোগ চাইতে হবে। এরপরেও যদি দলের কোনো লোক তাকে ভরসা না করে তাহলে তাকে ভাবতে হবে যে, কেন সে সবার মধ্যে বিশ্বাস আনতে পারছে না। তবে বহুক্ষেত্রে এই আগ্রহের মূলে কোনো চারিত্রিক জোর থাকে না। এটা হল যৌবনের প্রাকৃতিক গাদায় একটা কিছু করে দেখাবার প্রবণতা বা অনুপ্রেরণা। আসলে নবনাট্য আন্দোলন হচ্ছে জাতীয় শিল্প আন্দোলন। ফলে সকলদিক থেকে একে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে যাতে এর ভবিষ্যৎ নষ্ট না হয়ে যায়। সুতরাং এখানে এমন লোকের দরকার যাদের চরিত্রে শিল্পকর্ম অনিবার্য। শিল্প যাদের একটা সিরিয়াস অঙ্গ। তবে ত্রিশ বছরের পরেও যে অভিনেতারা যৌবন ধরে রাখতে পারেন তারা অসাধারণ অভিনেতা হয়ে ওঠে। কারণ—এই বয়স থেকেই শিল্প প্রকাশের ক্ষমতা সহজ ও গভীর হয়।

তবে প্রাবন্ধিকের মতে, যৌবনশক্তি খুব ক্ষীণ। সেটা হ্রাস হলেই ভেতরের ভালোমানুষটাও মরে যায়। আর তখনই দলের মধ্যে দল বিভাজন শুরু হয় নিজস্ব পজিশন বজায় রাখার জন্য। অনেকে আবার বিভিন্ন নেতাকে তোষামোদ করে নিজেদের পজিশন ঠিক রাখার জন্য। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই নাট্য সংঘ একটি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চেহারা নেয়। নবনাট্য

আন্দোলনও এই ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়াটা স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে এই ব্যাধি আটকাবার একমাত্র উপায় হল—ভোটের জোরে দলের মধ্যে কোনো মত না চালানো। যদি কোনো মত পার্থক্য তৈরি হয় তবে তা দলের আদর্শের কথা, অনুশাসনের কথাটা মাথায় রেখে আলোচনা করতে হবে।

এছাড়াও প্রাবন্ধিক আরো একটি দলের সমস্যার কথা বলেছেন। সেটি হল—প্রেমঘটিত ব্যাপার, খুব সিরিয়াস দলেও যদি কোনো একজনের অবাধ প্রেম চলতে থাকে তাহলে দলের কর্মোদ্যম কমতে থাকে। প্রাবন্ধিকের মতে—

“সকলের সমস্ত মনটাই যেন একেবারে মদন দেবতার উদ্যানে গিয়ে উৎসুক চোখে ঘুরতে থাকে।”^{৩৫}

তবে প্রেমে পড়ায় কোনো দোষ নেই, কিন্তু ফ্লার্ট করায় দোষ আছে। আর প্রেমে পড়লে তা সবার সামনে প্রদর্শনী করারও কোনো প্রয়োজন নেই। প্রেমাবেগকে একটু চাপা দিয়ে রাখাই সংগত মনে করেন শম্ভু মিত্র। তবে তিনি এও মনে করেন যে প্রকৃতির তাগিদ রুদ্ধ করে কেবল কড়া কড়া কথা নিয়ে আলোচনা করা শিল্পীদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ শিল্পীদের কাজই হল হাসা, খেলা ও লোককে তা ভালো লাগানো। কিন্তু প্রেম যদি সেই পথে বাঁধার সৃষ্টি করে তাহলে সেই প্রেমকে সংযত করাই শ্রেয়। বরং তাঁদের চেষ্টা করতে হবে যে উচ্ছ্বাসের চেয়ে গভীরতার মধ্যেই যেন তাঁদের প্রেম আশ্রয় পায়।

শম্ভু মিত্রের মতে এমন সমস্যা যেমন রয়েছে, তেমনি সেগুলির সঠিক সমাধানও রয়েছে। জীবনের যেমন বাঁধার সৃষ্টি করা তেমনি উপযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা সেগুলো অতিক্রম করা হল মানুষের নিয়ম।

অভিনয় কী?

শম্ভু মিত্রের ‘অভিনয়-নাটক-মঞ্চ’ প্রবন্ধগ্রন্থে সংকলিত ‘অভিনয় কী?’ প্রবন্ধটি ১৩৬২ বঃ ‘চতুরঙ্গ’ পত্রিকায় কার্তিক-পৌষ সংখ্যায় ‘অভিনয় শিক্ষা’ শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

প্রবন্ধের শুরুতেই প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন যে, অনেকে মনে করেন যে তিনি অভিনয়
ষেখাতে পারেন। তাই তাঁকে অনুরোধও করা হয় অভিনয় সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করার।
তবে এমন কঠিন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করতে প্রাবন্ধিক সংকোচ বোধ করেন। তার কারণও
তিনি জানিয়েছেন—

প্রথমত: তিনি ঠিক লেখক নন।

দ্বিতীয়: নিজের অভিনয় সম্পর্কে তাঁর নিজেরই যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

তৃতীয়ত: তিনি সব কিছু অন্যজনকে বোঝাতে পারবেন কী না তা নিয়ে তার সন্দেহ
রয়েছে।

তবুও তিনি অভিনয় নিয়ে গোড়া থেকেই আলোচনা শুরু করেছেন। তাঁর মতে, অভিনয়
কাকে বলে বা ভালো অভিনয় কাকে বলে—সেই সম্পর্কে বেশির ভাগ লোকেরই কোনো ধারণা
নেই। তাই সুন্দর চেহারার তরুণ বা তরুণী মঞ্চে উঠতেই হৈ চৈ পড়ে যায়। কিছু কিছু পত্র-
পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, অভিনয় অনুশীলনের কোনো প্রয়োজন নেই, চরিত্রের গভীরতারও কোনো
প্রয়োজন নেই, বয়সের ধর্মের দ্বারা যা কিছু করা যাবে তাই শুরু, তাই শেষ। বোধের একটি
ইংরেজি পাক্ষিক পত্রিকা মহাসমারোহে প্রত্যেক বৎসর শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রী নির্বাচন
করেন নায়ক-নায়িকার মধ্যে থেকে। এবং শ্রেষ্ঠ পার্শ্বচরিত্র অভিনেতা বা অভিনেত্রী নির্বাচন করেন
অভিনয় ক্ষমতার বিচারে। এই নির্বাচন তাঁর কাছে প্রহসন বলে মনে হয়েছে। তিনি বলেছেন—

“আমার দুঃখ যে গুণের কদর নেই এবং সাধারণ লোক ব্যবসাদারদের কথা
শোনে বলেই অনেক সময় নিজেদের স্বাভাবিক বোধ হারিয়ে ফেলে। তবু
ভরসার কথা, বোধটা সম্পূর্ণ হারিয়ে যায় না, বা চিরকালের জন্য হারায়
না। এবং তাই এখনও বাংলাদেশে সত্যজিৎ রায়ের মতো লোক সম্ভব হয়।
তাই এখনও ‘পথের পাঁচালী’র মতো ছবি লোকপ্রিয় হয়। কিন্তু কানু
বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে অপূর্ব অভিনয় হয়েছে এ ছবিতে তা কি আদর পাবে?”^{৩৬}

এছাড়াও প্রাবন্ধিক অভিনয় খুব ‘স্বাভাবিক’ হবে বা অভিনেতা নিজেকে ভুলে চরিত্রের মধ্যে মিলিয়ে যাবে—এই দুটো কথার একটাও বিশ্বাস করেন না। কারণ তাঁর মতে, কোনও শিল্পকলাই স্বাভাবিক নয়। বরং জীবনের স্বাভাবিক ঘটনাগুলোর মধ্যে থেকে একটি ঘটনাকে বেছে নিয়ে তাকে সাজিয়ে দেওয়াই হল শিল্পকলা। আর এই সাজানোর মধ্যে একটা ছন্দ অবশ্যই থাকতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন, কারো প্রেমাস্পদ মারা গেলে মানুষ মর্মান্তিক কষ্ট পেয়ে ভালো করে খাওয়া বন্ধ করে দেয়, ভালো করে ঘুমোয় না, ফলে তাঁর স্বাস্থ্যও ভালো থাকে না, সমস্ত পৃথিবীটাই তার কাছে মিথ্যে বলে মনে হয়। এসব অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। তবে শিল্পের ক্ষেত্রে এগুলো অপ্রয়োজনীয়। বরং শিল্পের ক্ষেত্রে দেখানো হয় ব্যক্তির আত্মাকে অন্ধকারের মধ্যেও একলা চেয়ে থাকাকে, যা একলা ঘরে খাটের বাজু আঁকড়ে আর্ত হাহাকার কে, বা সারা শরীর জুড়ে তার থর থর কম্পটাকে। অসংলগ্ন ঘটনাগুলোকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র ব্যক্তির দুঃখকে যদি দৃশ্যের মধ্যে দেখাতে হয় তাহলে ঘটনাকে ছোটো করে অথচ ঘন করে দেখাতে হবে। আর এই কাজটা করতে পারে কেবলমাত্র শিল্পী। প্রাবন্ধিক বলেছেন অনেকে একে ব্যঙ্গ করে ‘মেলোড্রামাটিক’ বলে থাকেন। তাঁদের কাছে তিনি ‘মেলোড্রামা’-এর মানে জানতে চেয়েছেন। তবে তাঁরা এর মনঃপুত উত্তর দিতে পারেননি। তাঁরা বলেন—

“অভিনয় হওয়া উচিত একেবারে দৈনন্দিন জীবনবৎ তরল এবং স্বাভাবিক। এমন কোনও আবেগ প্রকাশ করা হবে না যা শতকরা নিরানব্বই জন লোক জানে না। এমন কোনও ঘটনা দেখানো হবে না যা সাধারণ স্বাভাবিক দিনে ঘটে না।”^{৩৭}

এরপর একজন স্ট্যানিসল্যাভস্কির উদাহরণ দিয়ে বলেন যে, মস্কো আর্ট থিয়েটার এমন অভিনয় করেই সার্থক হয়েছে। প্রাবন্ধিক তাঁর উদ্দেশ্যে বলেন—

“তাহলে স্ট্যানিসল্যাভস্কি ‘ওথেলো’ প্রযোজনা করার চেষ্টা করেছিলেন কেন, ‘ওথেলো’-র কিছুই তো স্বাভাবিক নয়, দৈনন্দিনও না। না চরিত্রগুলো, না তাদের ভাষা, না ঘটনাগুলো কোনওটাই রোজ নিরানব্বই জনের জীবনে ঘটে না।”^{৩৮}

এর সম্ভোষজনক কোনো উত্তর ভদ্রলোক দিতে পারেননি।

প্রাবন্ধিকের মতে, শিল্প স্বাভাবিক নয়, বরং স্বাভাবিক মনের চাহিদা মেটানোর বস্তু হল শিল্প। স্বাভাবিক জগৎকে স্বীকার করেই শিল্পসৃষ্টি সম্ভব। যে ব্যক্তি জীবনকে ভালোভাবে জানে না সে কোনো কিছুকেই ভালোভাবে বা সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারে না। প্রাবন্ধিকের মতে, এমন শিল্পীর ‘প্রফুল্ল’ নাটকের ভজহরি চরিত্র বা ‘চরিত্রহীন’-এর দিবাকরের চরিত্র প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাঁদের পক্ষে বাচ্চা ভুলানো গল্প বা ন্যাকা প্রেমের কথা আওড়ানো সম্ভব। আসলে সত্যিকারের শিল্পী হতে গেলে জীবনে বাঁচতে হবে। জীবন থেকে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। তারপর সেই অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করার পদ্ধতি অনুসন্ধান করতে হবে। শম্ভু মিত্র বলেছেন—

“আবেগের অভিনবত্ব, প্রকাশ ভঙ্গিমার অভিনবত্ব এই সমস্ত যদি না থাকে তাহলে বড়ো অভিনেতা হয় না। শিল্পের কাজ নয় আত্মগোপন করা, কাজ হচ্ছে আত্ম প্রকাশ করা।”^{৩৯}

প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন বহুদিন আগে তিনি ‘ভেংগালি’ নামে একটি ছবি দেখেছিলেন। সেখানে জন ব্যারিমুর নাম ভূমিকায় অভিনয় করেন। অভিনয়ে তিনি তাঁর ভাই লাওনেলের হাবভাব আওয়াজ সবকিছুই নকল করেন। অভিনয় দেখতে দেখতে প্রাবন্ধিকের মনে হয়েছে, যদি জন নিজের বিশেষ কিছু অভিনয়ে প্রকাশ না করেন, তাহলে তোলাওনেল কে দিয়ে অভিনয় করালেই হতো।

শম্ভু মিত্র যখন অল্প বয়সে প্রথম ‘অভিনয় আসলে কী’ বোঝার চেষ্টা করছেন, তখনই তিনি পাড়ার থিয়েটারে ‘রমা’ নাটকের অভিনয় দেখেন। ‘রমেশ’র চরিত্রের অভিনেতা দেখতে ভালো হলেও গলার আওয়াজে তার কোনো ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হচ্ছিল না। নাটকটির অভিনয় তাঁর পছন্দ হয়নি। তবুও ‘রমেশ’র চরিত্রের অভিনেতা দর্শকদের সুখ্যাতি পেল। শম্ভু মিত্র ভাবলেন নাট্যকার শরৎচন্দ্র যা করবার সবই করে গেছেন। আর দর্শকরা কেবল সেই গল্পটুকুই

দেখল। অভিনেতার এখানে কিছুই করার ছিল না, কারণ গল্পটাই এখানে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। এই গল্প যিনি সাজিয়েছেন প্রকৃতপক্ষে তিনিই শিল্পী।

এরপর প্রাবন্ধিক ভেবেছিলেন অপরেশবাবুর ‘কর্ণার্জুন’ নাটকটি অভিনেতার পক্ষে ভালো। কারণ এখানে অভিনেতার অনেক কিছু করে দেখাবার সুযোগ আছে—গলার ঝংকার, প্রকাশভঙ্গি সবকিছুই। কিন্তু এই নাটকের অভিনয় দেখেও তিনি খুশি হননি। এই সময়ে দুজন ইংরেজি অভিনেত্রীর ‘লেডি ম্যাকবেথ’ অভিনয়ের বিবরণ পড়ে বোঝেন একই চরিত্রে দুজন অভিনয় করলেও দুজনেই চরিত্রকে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। যার ফলে দুটি আলাদা চরিত্র হয়ে গেছে। এখানে নাট্যকারের উদ্দেশ্যটা জানতে পারলে কোন চরিত্র ভুল আর কোনটি সঠিক তিনি তা বুঝতে পারতেন।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শব্দ মিত্র বুঝলেন নাট্যকারের রায়ও চরম নয়। সৃষ্টি যদি মহৎ হয় বা জীবন্ত হয় তাহলে উপর থেকে দেখতে তা সহজ বলেই মনে হয়। তবে এই সহজতার অন্তরালে এত জটিলতা থাকে যা আমাদের জীবনের মতোই ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়েই প্রকাশ পায়। পরবর্তীকালে তিনি দেখলেন একই নাটক ভিন্ন লোকের দ্বারা সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে অভিনীত হতে পারে। একেবারে আবেগের ভিন্নতা, মানসিকতার ভিন্নতা। আর এই বিশিষ্টতা যদি কোনো শিল্পীর মধ্যে না থাকে তাহলে সে শিল্পী নামেরই উপযুক্ত নয়। অনেক অভিনেতা বিশেষ এক ধরণের কথা বলার ভঙ্গি, আর কিছু মুদ্রাদোষ অনুশীলনের দ্বারা বিশিষ্টতা অর্জন করতে চায়। প্রাবন্ধিকের মতে এর মধ্যে একটা ভিখারীভাব আছে। তিনি বলেছেন—

“শিল্পীর কাজ নয় নিজেকে মোহন সাজে সাজিয়ে লোককে ধোঁকা দেওয়া, তার কাজ নিজের আবেগকে প্রকাশ করা, নিজের গভীর অভিজ্ঞতাকে রূপ দেওয়া।”^{৪০}

তাই কোনো অভিনেতাকে যদি অসৎ চরিত্রে অভিনয় করতে হয় তাহলে তাকে নিজের মনের মধ্যেই খুঁজতে হবে। আর খুঁজলেই দেখা যাবে সেখানেও নীচতা লুকিয়ে রয়েছে। হয়তো বিশেষ কোনো অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়নি বলে বা নিজের সৎ চেষ্ঠায় সেই নীচতাকে চেপে রাখা

রয়েছে। আর এই বোধের জাগরণ হলেই অভিনয়ের চরিত্র সম্পর্কে একটা সহানুভূতি জাগবে। তার ফলে অভিনয় সার্থক হবে। বিষয়মুখী দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারাই অভিনেতার চারিত্রিক উন্নতি হয়। সেই কারণে অভিনেতাকে সততা শিখতে হবে। তবে এই সততা সামাজিক সততা নয়, নিজের কাছে সৎ হওয়া, নিজের আত্মার প্রতি সততা। এরপর শব্দ মিত্র ভালো অভিনয় করার উপায় প্রসঙ্গে বলেছেন—

“যে ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে সেটি নিজের মধ্যে আত্মসাৎ করা চাই। কালির উপর ব্লটিং কাগজ ফেললে যেমন হয়, তেমনি নিজের মনকে ফেলে ভূমিকাটি শুষে নেওয়া চাই। তারপর সেটা মহলা দেবার সময়ে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করা চাই, যা আমার কাছে সত্য নয়, তা করব না, যা নিজের সত্তার মধ্যে না অনুভব করেছি তা দেখাবো না। অভিনয় ভালো হতে বাধ্য।”^{৪১}

এছাড়াও তিনি আরো বেশ কয়েকটি রীতির কথা বলেছেন। প্রথমত, গলা তৈরি। মঞ্চাভিনয়ে অভিনেতাদের সমস্ত কথা সামান্য জোরে উচ্চারণ করতে হয়। তবে সেই উচ্চারণকে সাবলিল হতে হবে যাতে জোরে বলার চেপ্টাটা দর্শকের মনে না লাগে। এক্ষেত্রে অনেকের ধারণা আছে যে ফিল্মে গলার জোর মোটেও দরকার হয় না। ফিল্মে যদি অভিনেতার একলার ক্লোজআপ হয় তাহলে একলার মতো করে মাইক বসানো হয়। কিন্তু যদি তিন-চারজনের একসাথে শট হয় তাহলে মাইককে বেশ খানিকটা দূরে রাখা হয়। সেখানে যদি অন্যান্য অভিনেতাদের স্বর অনেক প্রবল হয়, তাহলে মৃদুকণ্ঠের অভিনেতার গলা খানিকটা জোর দিয়েই বাড়াতে হয়। তবে এর অন্য একটা উপায়ও আছে। শট নেওয়ার পর সেই বিশেষ অভিনেতার সমস্ত সংলাপ জেঁট মিলিয়ে আলাদা করে তাঁকে বলিয়ে ‘Dub’ করা। তবে একাজে পরিশ্রম বেশি ও দুবার করে কাজ করার অর্থসামর্থ্য বাংলাদেশের কারোর নেই।

তাই মোট কথা হল গলার স্বর স্পষ্ট করতে হবে। ভালো গলা তাকেই বলা চলে যে গলার বিস্তৃতি আছে। সাধারণত অভিনেতারা মোটা গলায় সংলাপ করার চেষ্টা করেন। তাতে নাকি ব্যক্তিত্বের প্রকাশ বেশি ঘটে। তবে এই ধারণা পুরোপুরি ভ্রান্ত। উদাহরণ হিসাবে প্রাবন্ধিক

বলেছেন—অনেক ফলওয়ালা, গাড়িওয়ালা ভীষণ মোটা গলায় ও ভীষণ জোরে কথা বলেন, তাতে তাদের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে না বা তাদেরকে ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বলেও মনে হয় না। ‘ব্যক্তিত্ব ফোটে কণ্ঠের বিস্তৃতিতে, কণ্ঠের বৈচিত্র্যে।’ আবার অনেক মানুষ আছেন যারা খুব আস্তে কথা বলেন তবে তারা এত বুঝেও প্রত্যেক শব্দের সমস্ত অর্থ এত প্রকাশ করে বলেন যে, শুনতে অপূর্ব ধ্বনিময় লাগে। তাঁদের গলার বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতি অসাধারণ। সুতরাং আসল কথা হল বিস্তৃতি বাড়ানো। এর জন্য নাক সাফ রাখা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তবে তা কেবল মিষ্টত্ব প্রকাশে নয় বহু আবেগ প্রকাশেও গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাবন্ধিক শম্ভু মিত্র নাক দিয়ে আওয়াজ বের করার সময়ে একটি ব্যায়াম করার কথা বলছেন—

“একই পর্দা—ধরুন মধ্যম—আস্তে শুরু করে ক্রমশ হাওয়ার চাপ বাড়িয়ে জোর করা ও তারপর আবার আস্তে আস্তে কমিয়ে শেষে একেবারে মিলিয়ে দেওয়া। কিন্তু ওই একই পর্দার আওয়াজ। এতে বোঝা যাবে যে কতটা পর্যন্ত হাওয়ার জোর দেওয়া সম্ভব এবং কতটা পর্যন্ত গলার মিষ্টত্ব বজায় রাখতে পারছি।”^{৪২}

তিনি এও জানিয়েছেন যে বিভিন্ন শারীরিক কারণের জন্য প্রতিটি মানুষের আওয়াজ আলাদা। স্বর ওষ্ঠ থেকে যে স্বরটি বেরোয় সেটি বেশি জোরের নয়। একটু দূর থেকে তা আর শোনা যায় না। সেই আওয়াজ বাড়ানো হয় অনুকম্পনের সাহায্যে, যাকে বলে vibration। এই অনুকম্পনে যদি মুখের ভেতর, কণ্ঠনালির ভেতর অনুকম্পিত হয় তাহলে সেই আওয়াজ হবে ভরাট ও ব্যঞ্জনাময়। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠের বিস্তৃতি ছিল অস্বাভাবিক। তবে কারোর গলা ছোটো থেকেই কোনো অসুখে বা দুর্ঘটনায় ভাঙা বা ধরা থাকতে পারে। এগুলি অস্বাভাবিক ঘটনা। তাঁদের এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। কিন্তু যাঁদের গলা সাধারণ তাঁরা উক্ত পদ্ধতি অনুযায়ী গলা সাধন তাহলে ফল লাভ করবেন—

“প্রথমে যেমন নাক দিয়ে সুরটাই ঠিক করে নেওয়া হল, ও হাওয়ার চাপ নিয়ন্ত্রন করতে শেখা গেল এরপরে মুখ দিয়ে সেই পর্দাগুলো আস্তে থেকে জোর ও পুনরায় মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অভ্যেস করতে হবে। আবার আরম্ভ করতে হবে মুখ বন্ধ করে এবং তারপরে আস্তে আস্তে মুখ খুলে আওয়াজ জোর করতে হবে। এসবের ফলে নাকের ব্যবহার সব পর্দায় সহজ হবে এবং ধ্বনি অনেক বেশি সমৃদ্ধ হবে।”^{৪৩}

প্রাবন্ধিকের মতে শিল্প সব সময় সাধারণের জীবনের তট ছুঁয়ে যায়। সাধারণ ভঙ্গিকে আয়ত্ত করেই তার মাধ্যমে গভীর ভাবকে ফুটিয়ে তোলে। তাই অভিনেতাদেরও সবসময়ে কথোপকথনের ভঙ্গির থেকে সুর অর্জন করতে হবে। সাধারণ যে কথা প্রেমকে প্রকাশ করে, গভীরতাকে প্রকাশ করে, ছবি প্রকাশ করে সেই কথার সুরই শিখতে হবে। তিনি জায়েছেন, কথ্য সুরে বিশেষ কবিতা আবৃত্তি করলে গলায় ছন্দবোধ বাড়ে ও Modulation বৃদ্ধি পায়।

এরপরে প্রাবন্ধিক মিষ্টত্বের কথা বলেন। তবে অনেকে তাঁর এই মিষ্টত্বের প্রতি পক্ষপাতিত্বকে পছন্দ করেন না। ছোটবেলায় তিনি গল্প শুনেছিলেন যে, এক মেছুনি ফুলের গন্ধে ঘুমোতে না পারায়, শেষপর্যন্ত আঁশচুবড়ি নাকের কাছে রেখে সে ঘুমোয়। তিনি মনে করেন যে সমাজের বেশির ভাগ লোক এই মেছুনির মতো নয়। যদি তাই হত তাহলে শেক্সপীরের বা রবীন্দ্রনাথের অনন্য সাধারণ শব্দমাধুর্য আজ সমাদৃত হত না। তিনি যখনই জীবনে কাউকে গভীরভাবে আবেগে বিচলিত হতে দেখেছেন তখনই শুনেছেন তার কণ্ঠস্বরে অপূর্ব মাধুর্য। তাতেই প্রাবন্ধিকের মনে হয়েছে জীবনের গভীরতা মাধুর্যের মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। আর গলায় মিষ্টত্ব না থাকলে অভিনয়ে গভীর আবেগ ফোটানো সম্ভব নয়। কারণ কর্কশ কণ্ঠে জীবনের গভীর উপলব্ধির কথা প্রকাশ করা যায় না। শব্দ মিত্র মনে করেন গলাই হল অভিনয়ের সবচেয়ে বড় অস্ত্র। চোখের ভাবে মুখেরভাবে এমন ভাব-বৈচিত্র্য আসতে পারে না যা কথায় আসতে পারে। মনুষ্য সভ্যতার একটা বড়ো জিনিস হল কথা। এই কথার মধ্যদিয়ে এত রকম জিনিস ও এত সূক্ষ্মজিনিস প্রকাশ করা যায় যা অন্য কোনো ভঙ্গীমায় প্রকাশ করা যায় না। হাজার বছর ধরে

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীরা যা ভেবেছেন তা তাঁরা কথার মাধ্যমেই প্রকাশ করেছেন। কথার মতো সমৃদ্ধ আর কিছুই নেই। চোখ ও মুখের ভাব কেবল কথার বৈচিত্র্য প্রকাশে সাহায্য করে।

তবে প্রাবন্ধিক চোখের ভাবের একটি বিশেষ ব্যবহারের কথা বলেছেন। বহুক্ষেত্রেই অভিনয়ের সময় অভিনেতার যদি কোনো জিনিসের দিকে তাকাবার থাকে তো তাঁরা সেদিকে না তাকিয়ে কেবল চোখের মণিটা সেই দিকে ঘোরায়। এই ফাঁকিটা অনেক দর্শকই ধরতে পারে। সাধারণ জীবনেও কেউ অন্যমনস্ক ভাবে কথা শুনলে তা সকলেই বুঝতে পারে। তেমনি যদি কোনো কথায় কেউ আঘাত পায় বা আত্মাভিমান লাগে সেও বোঝা যায়, আলাদাভাবে দেখাতে হয় না। তবে এসব দেখবার জন্য উপযুক্ত চোখ থাকা চায়। প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন, তাঁর চেনা অত্যন্ত সূক্ষ্ণবোধ সম্পন্ন এক ভদ্রলোকের স্ত্রী স্বামীর মুখ দেখে বা কথা শুনে কিছুই বুঝতে পারতেন না। একদিন স্বামী রাগ করলে বললেন, তাঁর খাবারের দরকার নেই, হাঁড়িতে যেন জল ঢেলে দেয়। স্ত্রী সত্যিই তাই করলেন। পরে অন্যের কাছে স্ত্রী ভৎসিত হয়ে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। ফলে ক্রমে স্বামী তাঁর সূক্ষ্মতা হারিয়ে সবকিছু ‘ভোঁতা’ করে বলেন। বোকামি চাপে পড়ে ভদ্রলোকটি অসহিষ্ণু চরিত্রের হয়ে গেছেন। এই বোকামি দর্শকদের মধ্যে থেকে, সমালোচকদের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে অভিনেতাদের বুদ্ধিকেও ভোঁতা করে দেবার চেষ্টা করে।

তবে অনেক অভিনেতা আছেন যারা অভিনয় চলাকালীন সত্যিই চোখ দিয়ে যেন তাকিয়েও তাকান না, তার কারণ হিসাবে প্রাবন্ধিক মনে করেন তাঁরা পরের কথাগুলো, অ্যাকশনগুলো মনে রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু এমনটা হওয়া উচিত নয়। পাট মুখস্থ করা উচিত ও সমস্ত হাটা-চলা, ওঠা-বসা মহলার মাধ্যমে মনে গেঁথে নেওয়া উচিত। মঞ্চে প্রত্যেক মুহূর্তে যে কথাটা মনে পড়ে যাবে সেইটাই হবে নাটকের মুহূর্ত। তবে সমস্ত কিছু মনে রাখার মতো ক্ষমতা অভিনেতারই আছে বলে মনে করেন তিনি।

এরপর শব্দ মিত্র উচ্চারণ স্পষ্ট করা, হাঁটাচলা ভালো করা, অভিনয়ের সময় মনকেও শরীরকে relaxed রাখার কথা বলেছেন। তার জন্য অবশ্য তিনি রোজ ‘ক চ ট ত প, খ ছ ঠ থ ফ’ বলে জিভের সংস্থান শিক্ষা করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন প্রথম অভিনয়ের সময়ে

প্রত্যেকটি কথাকে সুস্পষ্টভাবে বিস্তার করে বলতে হবে ও প্রতিটি কথায় ঝাঁক দিয়ে অভিনয় করতে হবে। নাহলে দর্শকদের কাছে কোনো কিছুই পৌঁছবে না। ক্রমে অভিনয় একটু সহজ হয়ে এলেই চেষ্টা করতে হবে অত্যধিক ঝাঁকগুলোকে কমিয়ে ফেলার। তখন সাবলীল ও সহজভাবে মনোভাব প্রকাশ করতে হবে।

তবে প্রাবন্ধিকের মতে আমাদের দেশে নাট্যাভিনয়ে অঙ্গ সঞ্চালনের দিকগুলিকে লক্ষ্য কম দেওয়া হয়। কারণ আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েদের ব্যায়াম করার অভ্যাস খুবই কম। তাই প্রত্যেক অভিনেতা-অভিনেত্রীর ব্যায়াম করা অভ্যাস করতে হবে। নিজের সহজ ও সাবলীল অঙ্গ সঞ্চালনের ক্ষমতা তৈরি হবার পরই তাঁকে চরিত্রের প্রয়োজনে নানারকম পরিবর্তিত করা যাবে।

প্রাবন্ধিক এরপরে ব্যক্তিত্বের কথা বলেন। তাঁর মতে ভালো অভিনেতা হতে গেলে ভালো ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া চায়। ব্যক্তিত্ব বাড়ানোর সস্তা বইও চৌরঙ্গির ফুটপাতে প্রাবন্ধিক বিক্রি হতে দেখেছেন। এইসব বই ও ব্যায়াম নিয়মিত ব্যবহার করেও অনেক ব্যক্তি ব্যক্তিত্বহীন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যার ব্যক্তিত্ব তৈরি হবে তা এমনি এমনিই হবে। ওসব বই পড়ে নয়। আসলে ব্যক্তিটি যদি বড়ো মনের মানুষ হয়, কর্মী হয়, চিন্তাশীল হয় তাহলে এমনিই তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাবে।

পরিশেষে প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন, শিল্পী হতে গেলে তাঁকে দায়িত্ব সম্পন্ন হতে হবে।

তাঁর মতে—

“চিন্তা দিয়ে প্রকৃতিকে বোঝবার চেষ্টা করা শিল্পীর কাজ, কেবল ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রকৃতিকে উপভোগ করতে গেলে প্রকৃতিরই ত্রীতদাস হতে হয়। এবং এই একটি পথে যদি কোনও অভিনয় শিশিক্ষু মন চেষ্টা করে তাহলে আমার প্রবন্ধে আমি যত ভুল বা অসম্পূর্ণ কথাই বলে থাকি না কেন তাতে তার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হবে না, বরঞ্চ আমার জ্ঞানের অসম্পূর্ণতাই তার অগ্রসৃতিকে সাহায্য করবে।”^{৪৪}

রক্তকরবী:

শম্ভু মিত্রের ‘অভিনয়-নাটক-মঞ্চ’ প্রবন্ধ গ্রন্থে সংকলিত শেষ প্রবন্ধ ‘রক্তকরবী’, ‘বহুরূপী’ পত্রিকায় ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হয়।

এই প্রবন্ধের শুরুতেই প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন যে, রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্পর্কে অনেকের মনে ভিন্ন রকম ধারণা আছে তার মধ্যে একটি হল—‘তাঁর নাটক নাটক নয়, কাব্য, এতে নাটকীয়তা নেই।’ অনেক লেখকদের আবার ধারণা রবীন্দ্রনাথের নাটকে নাটকীয়তা থাকলেও, তাঁর সংলাপ এত আড়ষ্ট ও অস্বাভাবিক যে সাধারণের মন এর মধ্যদিয়ে প্রকাশ পায় না এবং রসও গ্রহণ করতে পারে না। তবে ‘চার অধ্যায়’ ও ‘রক্তকরবী’ অভিনয়ের পরিকল্পনা করতে গিয়ে শম্ভু মিত্র বুঝতে পারেন যে, যদি রবীন্দ্রনাথের নাটককে বোধ দিয়ে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করা যায় তাহলেই বাংলা নাটকের মান উন্নত হবে। রবীন্দ্রনাথের ‘বিসর্জন’, ‘চিরকুমার সভা’ ও ‘শেষরক্ষা’ নাটক পেশাদারি ও অপেশাদারি অনেক নাট্যগোষ্ঠীর দ্বারা অভিনীত হয়েছে ও জনপ্রিয়তাও প্রচুর পেয়েছে। এই নাটকগুলি নিয়ে কোনও সমালোচনাও হয়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে এই নাট্যকারই কোন অন্যধারার নাটক লিখলেন যা নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠল গভীরভাবে প্রনিধানযোগ্য। প্রাবন্ধিকের মতে—

“এমন যদি হত যে বৃদ্ধবয়সে ক্ষমতার অভাবে তিনি অনেক আবোলতাবোল লিখেছেন তা হলে এত মাথা ঘামাবার ছিল না, কিন্তু যে লোক লেখার অন্যান্য বিভাগে আ-মৃত্যু নানান আশ্চর্য পরীক্ষণে সাফল্য লাভ করেছেন। তিনি যে কেবল নাটক লিখতে বসেই এলোমেলো বকবেন একথা তো যুক্তিনির্ভর নয়।”^{৪৫}

যদি এ সম্পর্কে সম্পূর্ণবোধ তৈরি হয় তাহলেই ভবিষ্যৎ বাংলা নাটক রবীন্দ্রনাথকে উত্তরণ করে আরও বৃহত্তর ভূমিকায় নিজেকে প্রসারিত করতে পারবে।

রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্পর্কে প্রথম যে কথা ওঠে তা হল—তাঁর নাটকের আঙ্গিক শেকস্পীয়র বা ইবসেনের মাতা নয়। অর্থাৎ ইউরোপীয় নয়। কিন্তু প্রাচীন গ্রিক নাট্যরীতি অনুযায়ী

স্থান-কালের ঐক্য রবীন্দ্রনাথের ‘রক্তকরবী’ নাটকের মধ্যে আছে। আর আছে অজ্ঞানতা থেকে জ্ঞানে উত্তীর্ণ হওয়া। তবুও যেন একটা বিভেদ ছিল।

অতীতে নাটকাভিনয় শুরুর প্রথমদিকে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা দূরত্ব ছিল। এই দূরত্ব ছিল দুভাবে। প্রথমত ছিল উন্মুক্ত প্রান্তরে দর্শক ও অভিনেতাদের মধ্যে শারীরিক দূরত্ব। আর দ্বিতীয় দূরত্ব ছিল অভিনীত চরিত্র সম্পর্কে অভিনেতা বা লেখকের বোধের দূরত্ব অর্থাৎ মানসিক দূরত্ব। তখন চরিত্রগুলোকে এখনকার মতো বিশ্লেষণ করে দেখা হত না। ফলে তার যে চেহারাটা প্রকাশ পেত তা আসলে আবেগের উপাদান দিয়ে তৈরি। তাছাড়া তখন অভিনয়ের একটা সামাজিক দিক ছিল। একই অভিনয় নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানে বারবার অভিনীত হলেও লোকে মুগ্ধ হয়ে তা দেখত। প্রাবন্ধিক উদাহরণ হিসাবে ‘রামায়ণ’ অভিনয়ের কথা বলেছেন। হাজার বছর ধরে একই বাহ্যিক চেহারা রয়ে গেল কিন্তু কোনো গভীর অন্তর্দৃষ্টির প্রকাশ হয়নি। কারণ মানুষ সামাজিক অনুষ্ঠান হিসেবেই এর অভিনয় দেখে এবং নির্ধারিত সময়ে ‘জয় সিয়ারাম কী জয়’ বলে সমস্বরে জয়ধ্বনিও করে ওঠে। এখানে দর্শকরা অভিনয়ের অন্তর্গত। তারাও নির্দিষ্ট কিছু ক্রিয়াকলাপ করে থাকে। পৃথিবীর সর্বত্র এরকমই হয়ে থাকে। যেহেতু সামাজিক অনুষ্ঠানে অন্তর্গত হয়ে এই নাটকাভিনয় শুরু তাই তাকে সেই অনুষ্ঠানেরই রীতি অনুযায়ী একটি অনড় চেহারায় থাকতে হয়। এর ফলে মানসিক দূরত্ব ছিল অবসম্ভাবী।

পরবর্তীকালে উন্মুক্ত প্রান্তরের পরিবর্তে এল ঘেরা মঞ্চ। তার ফলে অস্বাভাবিক উচ্চস্বরে গর্জন করে কথা বলারও আর দরকার হল না। তাছাড়া অভিনয়ে চরিত্ররাও দর্শকের কাছাকাছি চলে এল। অভিনেতারাও চরিত্রটিকে অন্তর্ভুক্ত ভাবে প্রকাশ করার সুযোগ পেল। তবে নাট্যাভিনয়ের সেই সামাজিক আনুষ্ঠানিক রূপ স্তিমিত হতে লাগল। আর সামাজিক পরিবর্তনের ফলে সেই সমষ্টিগত পাগলামি আর থাকল না।

প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন শেক্সপীয়রের নাটকে ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে কাব্যের ঝংকারের একটা অপূর্ব মেলবন্ধন ছিল। দর্শকের সামনে প্রতিটি চরিত্রের ব্যক্তিসত্তা যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি প্রকাশ পেয়েছে তার বিচিত্র বর্ণবৈভব অনুভব। ফলে শয়তানের চরিত্র বোঝাতে আর শয়তানের

মুখোশ পড়তে হয়নি, বা ষড়রিপুর জন্য আলাদা চরিত্রকে দাড়া করাতে হয়নি, বরং মানুষের মধ্যেই শয়তান ও ষড়রিপুর অবস্থান দেখানো হল। আর এর সাথে কাব্যের অজস্র সুরবৈচিত্র্য দর্শককে নেশায় মুহুমান করে তোলে। তাই লোক শেক্সপীয়রের নাটকের মূল ধরে অন্যান্য নাট্যকারদের নাটক বিচার করে আধুনিক নাটকের গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছেন। এরপর এল ইবসেনীয় পদ্ধতি। সামাজিক অবস্থা, সামাজিক সমস্যাই নাটকের কেন্দ্র হয়ে উঠল। ব্যক্তিজীবনের উপর তার প্রভাবও পড়ল। ইবসেন ও চেখভের হাত ধরে যে নতুন যুগের সূচনা হল তারই সার্থক পরিণত প্রকাশ হলো স্ট্যানিস্ল্যাভস্কির হাতে।

শব্দ মিত্রের মতে আমাদের দেশে নাটক বা অভিনয়ে সম্পর্কে বিচার করতে গিয়ে বাস্তবানুগ পদ্ধতিকেই একমাত্র পদ্ধতি বলে মনে করা হয়। আর নাট্যকাররা এই পদ্ধতির অনুকরণেই একদিন ধরে নাটক লেখবার চেষ্টা করে এসেছেন। তবে ইউরোপে এই বাস্তবানুগ প্রকাশভঙ্গির বিরুদ্ধে এমন বিদ্রোহ শুরু করেছে। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে বাস্তবানুগ ও দৈনন্দিন হতে হতে নাটক ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তাই তারা নাটক ও মঞ্চকে এর থেকে মুক্তি দিয়ে ‘সত্যানুগ’ করে তুলতে চাইলেন। তবে এই বিদ্রোহের আরো একটা দিক হল— পুরাকালের নাটকাভিনয়ের সেই সামাজিক অনুষ্ঠানের রূপকে পুনরায় ফিরিয়ে আনা। তাই স্যুররিয়ালিজম, এক্সপ্রেসনিজম, এপিকইজমের মাধ্যমে অভিনয়ের প্রকাশকে বিস্তৃত করে তার মধ্যে জীবনের অন্তর্নিহিত জটিলতা ও বহুবিচিত্র সত্যকে প্রস্ফুটিত করার চেষ্টা চলছে। টলার, এলিয়ট, ওনীল প্রমুখরা এই নিয়ে নানা পরীক্ষাও করে চলেছেন।

রবীন্দ্রনাথের ‘রক্তকরবী’ অভিনয় করতে গিয়ে প্রাবন্ধিক উপলব্ধি করেছেন যে, নাটকে সমাজ, ব্যক্তি ও ব্যাপ্ত সত্যতা সবই প্রকাশ পেয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ প্রাবন্ধিক ইবসেনের ‘অ্যান এনিমি অফ দি পিপল্’ এর অভিনয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। এই নাটকে প্রথমেই রয়েছে একজন বিশেষ ডাঃ স্টকম্যান কিন্তু নাটকে চতুর্থ অঙ্কে গিয়ে মনে হয় স্টকম্যান কোনো ব্যক্তিবিশেষ নয়, বরং অনন্ত বিপ্লবীর প্রতীক। তেমনি ‘রক্তকরবী’তে কিশোর নন্দিনীকে ফুল দিতে আসে, সে কোনো প্রতীক না কোনো ব্যক্তিবিশেষ তা নিয়ে প্রাবন্ধিকের মনে প্রশ্ন জাগে। তাঁর মতে

এটাই রবীন্দ্রনাথের শিল্পকৌশল। তিনি বলেছেন—

“যে বিস্মৃতির চেষ্টা করতে গিয়ে ওনীল মুখোশ ব্যবহার করেছেন, টলার ‘হিংকেমান’ লিখেছেন, এলিয়ট কোরাসের আমদানি করেছেন সেই বিস্মৃতি বাঙালির নাটকে এরকম করে এল।”^{৪৬}

শঙ্কু মিত্রের মতে, আমাদের দেশের শিল্প-বিচারে সাধারণত দুই ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এক পুরোনো পদ্ধতির অনুকরণে। দুই পাশ্চাত্যের কোনো ভঙ্গিমার অনুকরণে। তবে দ্বিতীয় রীতিই দর্শকের কাছে বেশি প্রশংসনীয় আর দেশীয় নীতি ‘আহামরি’। রবীন্দ্রনাথ এই দেশজ কাঠামোকেই বর্তমানের প্রয়োজন অনুসারে আরও সুষমামন্ডিত ও শিল্পসমৃদ্ধ করে তুলেছেন। তাই ইউরোপীয় শিল্পের একই নাটকে ভিন্ন স্তরের সহাবস্থানের মতো রবীন্দ্রনাথ ও একই নাটকে এবং একই দৃশ্যপট ভূমিকায় নানান স্তরের অঘয় ঘটিয়েছেন। ‘রক্তকরবী’ নাটকটির অনেক ভাষ্য রয়েছে। অনেকে এক সময় মনে করেছিলেন ‘রক্তকরবী’ ইংরেজ বিরোধী আবার অনেকে মনে করেছিলেন ‘নেহেরু সরকার’ বিরোধী।

এই নাটকে একই দৃশ্যে অধ্যাপক, গোকুলকে এনেছেন আবার ফাগুলাল, চন্দ্রা, বিশুও সেখানে এমনভাবে বসে গল্প করেছেন এটাই তাদের বস্তুর সামনেকার দাওয়া। রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে কোনও ব্যক্তিবিশেষ বা সমাজের কোনো শ্রেণিবিশেষের সম্পর্কে নয়। সভ্যতার একটা স্তর সম্পর্কে বিশ্লেষণ করেছেন। নাটকের কাহিনির পরিধি এত বিরাট যে কোনও বিশেষ জায়গায় যদি এর দৃশ্য সাজিয়ে সমস্ত চরিত্রগুলোকে রবীন্দ্রনাথ এসে দাঁড় করাতেন তাহলে এর বিস্মৃতি ক্ষুন্ন হত ও ছন্দেও ব্যঘাত হত। পুরো শহরটাই এর পটভূমি। তবে এই শহর কলকাতা, বোম্বে, লণ্ডন বা নিউইয়র্ক নয়। রবীন্দ্রনাথ এপ্রসঙ্গে বলেছেন—

“ঘটনা স্থানটির প্রকৃত নাম নিয়ে ভৌগলিকদের কাছে মতের ঐক্য আশা করা মিছে। স্বর্ণলঙ্কা যে সিংহলে তা নিয়েও আজ কত কথাই উঠেছে। বস্তুত পৃথিবীর নানা স্থানে নানা স্তরেই স্বর্ণলঙ্কার চিহ্ন পাওয়া যায়।”^{৪৭}

তাই যক্ষপুরীর চিহ্নও পৃথিবীর নানা স্থানে পাওয়া যায়। নাটকের একমাত্র দৃশ্য অনির্দিষ্ট, অথচ সুপরি নির্দিষ্ট যক্ষপুরীর।

প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন যদি নাট্যমঞ্চে রাজার দরজা, ফাগুলালের বস্তির দাওয়া, সর্দারও চিকিৎসকের মন্ত্রনাকক্ষ, বিশু-নন্দিনীর কথোপকথনের জন্য নিরালা কোণ, সমস্ত কিছু দাঁড় করানো হত তাহলে বিলেতিয়ানা দেখানো হত। কিন্তু বহুরূপী নাট্যদল তা করেনি। কারণ হিসেবে তিনি বলেন—

“রবীন্দ্রনাথ একটা সমগ্র সমাজের চেহারা দিতে চেয়েছেন। এবং হাজার ঝগড়াবিবাদ সত্ত্বেও সমস্তটা মিলে কিন্তু একটাই সমাজ।”^{৪৮}

‘রক্তকরবী’র রাজা ‘মুক্তধারা’ বা ‘রাজা’ নাটকের রাজার মতো নন। তিনি থাকেন একটা জালের আড়ালে। নন্দিনী প্রথম থেকেই চায় এই জাল ছিঁড়ে রাজাকে বের করে নিয়ে আসবে। নাটকে আছে—

“নন্দিনী রাজাকে ডেকে বলে—“দূর থেকে ওই গান শুনতে পাচ্ছ?’ রাজা শুনতে না পেয়ে বলে—‘কিসের গান’।

নন্দিনী বলে—‘পৌষের গান। ফসল পেকেছে, কাটতে হবে, তারই ডাক’
পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে—আয়রে চলে, আয় আয় আয়
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে মরি হয় হয়।”^{৪৯}

‘রক্তকরবী’ এর এই গানের অর্থ নিয়েও মতভেদ আছে তবে প্রাবন্ধিকের মনে হয় নন্দিনী রাজাকে বলছে যে তাঁর পরিশ্রমের ফসল আজ পেকে ডালা ভরিয়ে তুলেছে। এবার যেন রাজা বেরিয়ে এসে ছুটি নেয়। একটা যুগ শেষ হল, তার ফসল তুলে আবার নতুন যুগের ফসল বোনা হবে। রাজা যেন অন্ধকার ছেড়ে আলোতে বেরিয়ে আসেন। অথচ রাজা বেঁচে থাকার বা টিকে থাকার রহস্য শিখতে চায় কোটরগত ব্যাঙের থেকে।

এই গানটিই দ্বিতীয়বার শোনা যায় যখন নাটকের শেষে কয়েদ ভেঙে বিশুকে উদ্ধার

করার পর বিশ্ব তাদের ডেকে বলে—‘আয়রে ভাই এবার লড়াইয়ে চল’—তখনই দূরে এই গান শোনা যায়। তবে আসন্ন সংঘাতে তার পাঠ গেছে উল্টে। সেখানে গান হয়—

“ধুলোর আঁচল ভরেছে আজ পাকা ফসলে মরি হয় হয় হয়।”^{৫০}

এরপর শম্ভু মিত্র রাজা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি উল্লেখ করেছেন—

“বৈজ্ঞানিক শক্তিতে মানুষের হাত-পা-মুণ্ড অদৃশ্যভাবে বেড়ে গেছে। আমার পালার রাজা যে সেই শক্তিবাহুল্যের যোগেই গ্রহন করেন, গ্রাস করেন, নাটকে এমন আভাস আছে। ... আমার স্বল্পায়তন নাটকে রাবণের বর্তমান প্রতিনিধিটি এক দেহেই রাবণ ও বিভীষণ, সে আপনাকেই আপনি পরাস্ত করে।”^{৫১}

রাজা বিপুল শক্তির অধিকারী। তাঁর শক্তি দেখে নন্দিনী মুগ্ধ। তিনি হলেন যক্ষপুরীর সৃষ্টিকর্তা। পৃথিবীর বুকচিরে ঐশ্বর্য ছিনিয়ে এনে নিজের প্রতাপ বাড়িয়েছেন। অথচ নাটকের প্রথমদিকে রাজা নিজের অবস্থা সম্পর্কে জানে না। আভাসে বোঝা যায় রাজার চারপাশে জাল রচনা করেছে সর্দার। ইংরেজি অনুবাদে এই সর্দার হলেন গভর্নর। অর্থাৎ শাসনকর্তা। এই সর্দারই রাজাকে জালের আড়ালে রেখে রাজার শক্তির সাহায্যেই যক্ষপুরীর শাসনকার্য জালিয়েছেন। শেষ মুহূর্তে রাজা তা বুঝতে পেরে সর্দারের বিরুদ্ধে সবার সঙ্গে লড়াই করতে ছুটেছে।

প্রাবন্ধিকের মতে এই নাটকে কেবল রাজারই যৌবনের অভাব হয়নি। বরং দেখা যায় যে যক্ষপুরীর সমস্ত কোণ থেকেই যৌবন হারিয়ে গেছে। তাই নন্দিনী চায় রঞ্জন একবার আসুক যক্ষপুরিতে। তার অপেক্ষা করছে নন্দিনী। যৌবনের কাজই তো হল প্রাণ সর্বস্বপন করে বাজি খেলায় জয়লাভ করে জীবনকে জিতে নেওয়া। রঞ্জন হল এই যৌবনের প্রতিমূর্তি। আর তার জিতে নেওয়া জীবনের প্রতীক প্রাণের প্রতীক হল নন্দিনী। তাই যক্ষপুরীর মরন্তু পরিবেশের মধ্যে একলা বসে নন্দিনী যৌবনের প্রতিক্ষা করে। রঞ্জন এল তবে মৃত্যুর মধ্যদিয়ে। নন্দিনী বলে—

“নিঃশব্দ নয়। মৃত্যুর মধ্যে তার অপরাজিত কণ্ঠস্বর আমি যে এই শুনতে পাচ্ছি। রঞ্জন বেঁচে উঠবে—ও কখনও মরতে পারে না। ... ও আবার আসার জন্য প্রস্তুত হবে, ও আবার আসবে।”^{৫২}

এভাবেই যুগ যুগ ধরে প্রাণ যৌবনের অপেক্ষা করে। কখন যৌবন দুই হাতে দাঁড় ধরে তাকে তুফানের নদী পার করে দিয়ে, প্রাণ দিয়ে সর্বস্ব দিয়ে তাকে জিতে নেবে।

রবীন্দ্রনাথ এই নাটকের ‘নন্দিনী’ যে কোন স্তরের মেয়ে তার একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন। নন্দিনী সেই ঘরের মেয়ে যাদের ব্যক্তিগত নাম আছে। কিন্তু সর্দাররা মোড়লরা তাদের পিঠের কাপড়ে ঐঁকে দিয়েছে নম্বর। অথচ রবীন্দ্রনাথ নাটকে নাম দিয়েছেন তারই। আর কেবলমাত্র উপাধি দিয়েছেন এই মোড়লদের সর্দারদের। মহাকালের রথের রশি যে অবজ্ঞাতদের হাতের টানেই চলবার সময় এসেছে, রবীন্দ্রনাথ তাদেরই ব্যক্তিক নাম দিয়েছেন। আর নন্দিনী হল এদের ঘরেরই একজন মেয়ে। নন্দিনী একজন হলেও তার ভেতরে যে প্রাণের প্রেরণা তা সকল মেয়ের। সে যক্ষপুরীতে এসেই বলে—

“ছকুম মেনে কাজ করা আমার অভ্যেস নেই।”^{৫৩}

শঙ্কু মিত্রের মতে ইউরোপীয় প্রকাশভঙ্গির মধ্যে যে বাস্তব প্রতিম নগ্নতা আছে রবীন্দ্রনাথের ‘রক্তকরবী’তে নেই। ফলে নাটকের অভিনয় তদানীন্তন জীবনের টীকা হওয়ার বদলে যাত্রা বা রামলীলা অনড় কথকতায় আবদ্ধ একটা আঙ্গিক সর্বস্ব জোলো ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। ইউরোপে ভোরের সংগীত তৈরি করতে আলাদা আলাদা করে ভোরের আওয়াজ সুরের পর্দায় মিলিত করে ভোরের সংগীতকে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে কয়েকটি পর্দার বিশেষ সঞ্চরণে একটি সুর সৃষ্টি করে ভোরের অন্তর্নিহিত ভাব প্রকাশ করা হয়। এহল শুধু নিজেকে বোঝাবার প্রয়াস।

নাটক হল এমন বস্তু যেখানে পাত্র-পাত্রীর কথার মাধ্যমেই সমগ্রভাব প্রকাশ করা হয়। ঔপন্যাসিকদের মতো নিজের কথা বা নিজের টীকা দিয়ে কোনও জিনিস বুঝিয়ে দেবার সুযোগ

নাট্যকারের নেই। নাটকে কেবলমাত্র ঘটনা প্রকাশ পাবে সেই ঘটনাকে মানুষের মনের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে হবে। আর চরিত্রগুলোকে বাস্তবসম্মত করে প্রকাশ করতে হবে। ফলে চরিত্রগুলোর বাস্তবতা রক্ষা করতে গিয়ে নাট্যকারের নাটকের আসল কথায় পৌঁছতে দেরি হয়ে যায়। অর্থাৎ উপকরণের রূপটাই বড়ো হয়ে ওঠে। চরিত্রের অন্তর্লীন বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ পাওয়া যায় না। সেই কারণে বার্নার্ড শ তাঁর বক্তব্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন, চরিত্রগুলোর দৈনন্দিন স্বাভাবিকতাকে নয়। প্রাবন্ধিক বলেছেন—

“শতকরা নিরানব্বইটা দিনের শতকরা নিরানব্বইটা ঘটনা তো এমন বড়ো কিছু নয় যাতে চরিত্রটার আমূল উন্মথিত হতে পারে, বা জীবনের মূল সত্য সম্বন্ধে গভীর আলোচনা চলতে পারে।”^{৫৪}

প্রাবন্ধিকের মতে ওনীল ও মিলারের বেশির ভাগ নাটকে যখনই চরিত্রটি বিশেষ থেকে সাধারণের পর্যায়ে আসে তখনই একটি চিড় খায়। তবে ঐ দুটো স্তর মেলে না। কারণ দুইধার থেকে মানুষ চেষ্টা করছে একই ছন্দে পৌঁছতে। উদাহরণ হিসাবে শঙ্কু মিত্র ‘Death of a Salesman’-এর কথা বলেছেন। এই আধুনিক নাটকের বক্তব্য প্রাবন্ধিককে অনুপ্রেরণা না দিলেও এর প্রকাশভঙ্গিমা তাঁকে মুগ্ধ করেছে। ওনীল ও আধুনিক মার্কিন নাট্যকারদের লেখার যে নগ্নতা আছে তা আমাদের দেশের ছবি, গান বা ধর্মবোধ কোনও কিছুই পরিণতিতে আসে না।

শঙ্কু মিত্র মনে করেন যদি আমরা আমাদের কুসংস্কার গুলোকে এড়াতে পারি তাহলেই বুঝতে পারব যে রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলোতে হৃদয় ও বুদ্ধি উভয়ের আবেদনেরই একটা সাম্য আছে। গ্রাম্য যাত্রায় এমন জ্ঞানের কথার সুন্দর সংমিশ্রন দেখা যায়। তবে সেই জ্ঞান রামায়ণ-মহাভারতের কালের। সেই জ্ঞানের দ্বারা আজকের জগৎকে ভালোভাবে বোঝা যায় না। রবীন্দ্রনাথও সেই কাজ করেছেন।

‘রক্তকরবী’ নাটক নিয়ে আলোচনার শেষে প্রাবন্ধিক বলেছেন—

“সময়টাকে নিয়েও রবীন্দ্রনাথ ‘রক্তকরবী’তে যথেষ্ট খেলেছেন, অথচ সেটা পীড়া দেয় না।”^{৫৫}

প্রথমে কিশোর যখন আসে তখন মনে হয় সকালবেলা, কাজে যাওয়ার সময়, পরে ফাগুলাল এসে জানায় আজ ছুটির দিন। পরে বিশু কাজে যোগ দিতে চাইলে নন্দিনী বাধা দেয়। অর্থাৎ টুকরো টুকরো ঘটনা এনে এমন ভাবে সাজানো হয়েছে যাতে ঘটনাস্রোত প্রত্যক্ষ করা যায়।

এই প্রবন্ধের শেষে শম্ভু মিত্র জানিয়েছেন যে, যদি আমরা আমাদের পশ্চাদপট আর আবেগকে স্পষ্টভাবে বানাতে না পারি, তাহলে নাট্যসম্ভার সৃষ্টি সম্ভব নয়। কারণ নাটক হল আবেগ ও অনুভূতির সর্বাস্থান প্রকাশের মাধ্যম। তিনি নাটক সম্পর্কে বলেছেন—

“যে নাটকে আমাদের মৌখিক ভাষা ও চিন্তার ভাষা এক হয়ে মিলে যাবে, যেখানে আমাদের দেখতা সত্যি ও আকাশছোঁয়া স্বপ্ন একই নাটকে প্রকাশ পাবে। এবং সেই নাটক না পেলে আমাদের অভিনেতাদের উদ্ধার নেই।”^{৫৬}

॥ দুই ॥ সম্মার্গ সপর্যা (১৯৯০ দ্বিতীয় সংস্করণ)

নিবারণ পণ্ডিত (১৯৪৯):

নিবারণ পণ্ডিত ছিল একজন গণনাট্য কর্মী। শুধু তাই নয় মৈমনসিংহের গ্রাম্য কবিও। দেশভাগের পর কুচবিহারে চলে আসেন। তাঁর সঙ্গে শম্ভু মিত্রের আলাপ হয় ১৯৪৩ সালে। মৈমনসিংহ জেলায়। কারণ মৈমনসিংহ জেলায় যে সকল গণনাট্য কর্মী ছিলেন তাদের গণনাট্য সম্পর্কে শিক্ষা দেবার জন্য একটা স্কুল খোলার ব্যবস্থা হয়। সেখানে তাঁর নিবারণ পণ্ডিতের সাথে পরিচয় হয়।

তখনকার রাজনৈতিক কর্মীদের কাছ থেকে শোনা যায় রবীন্দ্রনাথের ‘আয় রে মোরা ফসল কাটি’ গানটির মধ্যে গণজীবন সম্পর্কিত কোনো ভাবনা নেই। তাই তারা এই গানটিকে গণ জীবনের সংস্পর্শে এনে নতুন করে তৈরী করেন। সেটা হয় ‘আয় রে মোরা আমনধান কাটি’ এই গানটি মৈমনসিংহের মানুষদের যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। এটি এখানকার পথ ঘাটে প্রবল স্বরে গীত হতে শোনা গেছে। এই গানটি শুনে প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষের যা হল শম্ভু মিত্রেরও একই অবস্থা হল।

শম্ভু মিত্র যখন গণনাট্যে যোগদান করে তখন তাঁকে আবার নতুন ভাবে জানতে হয়েছে শিল্প কী, আঙ্গিকের সঙ্গে বিষয়বস্তুর সম্পর্ক কী, শিল্পের আবেদনের লক্ষ্য কী ইত্যাদি। আমরা আমাদের বাস্তব জীবনে দেখতে পায় যেটা আমাদের জানা জিনিস আবার নতুন করে জানতে হয় সময়ের তাগিদে। এই জানার ক্ষেত্রটি কারোর পক্ষে সহজ হয়েছে আবার কারোর অনেকটা সময় লেগেছে। কারণ প্রত্যেকটা মানুষের বোঝার ক্ষমতা একরকম হয় না। আর যখন মানুষের জীবন থেকে এই ভাবে অতীতের সব আনন্দ, আনন্দ মুছে যায় আর তখনই সে দিশেহারা হয়ে পড়ে, উত্তেজিত হয়ে ওঠে। আর এই রকম পরিস্থিতিতে সে গেয়ে ওঠে—

“আয়রে মোরা আমন ধান কাটি।”^১

—শম্ভু মিত্র বলেছেন, নিবারণ বাবু তাঁকে চিন্তার জট থেকে মুক্ত করে বোধের স্তরে নিয়ে গেছেন। তার জন্য তিনি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

নিবারণ বাবু মানুষ একটু স্বল্পভাষী ছিলেন। তিনি মৈমনসিংহ জেলার একজন গ্রাম্য কবি। দেশ বিভাগের পর তিনি কোচবিহার জেলায় চলে আসেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রকাশন বিভাগ থেকে গান ও স্বরলিপির একটি বইও প্রকাশিত হয়েছিল। একদিন একটি মৈমনসিংহের চায়ের দোকানে বসে শম্ভু মিত্রের সঙ্গে নিবারণ পণ্ডিতের ‘জবানবন্দী’ নাটকের অভিনয়ের কথা হয়েছিল। কিন্তু একটা সমস্যা ছিল কারণ এই নাটকের ভাষাটা ওখানকার লোকদের পক্ষে বোঝা কষ্টকর। তাই তিনি চেয়েছিলেন ঐ জেলার ভাষায় বদলাতে। কিন্তু নিবারণবাবু বলেন—

“বদলাতে যদি হয় কলকাতার ভাষা করে নিলেই হবে।”^২

তিনি তাঁর এই কথাটা শুনে আশ্চর্য হয়েছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী এবং তাঁর কথার মধ্যে একটু ঝাঁক ছিল।

শম্ভু যখন তাঁকে জানান কলকাতার ভাষা তো বিদেশী, এটি বাবুদের ভাষা। তাছাড়া এই ভাষায় ওখানকার লোকদের জাগানো সম্ভব হবে কী? তখন নিবারণ বাবু কোন কথা না বলে চায়ের কাপের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। উত্তর জানা তাঁর খুব প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তিনি যখন স্বল্পভাষী লোকটির দিকে তাকান তখন দেখেন তাঁর মুখে বহু দুঃখভোগের অভিজ্ঞতা। তাই উত্তর জানা সেই মুহূর্তে সম্ভব হয়েছিল না।

যে সময়ের কথা শম্ভু মিত্র বলছেন, সেই সময় বায়স্কোপের প্রচলন হয়েছিল খুব। চায়ের দোকানের টেবিলে বসে থাকা কিছু লোক কী ফিল্ম এসেছে তার আলোচনা করছিল এবং দোকানের দেওয়ালে বিগত বহু ফিল্মের পোস্টার দেখা যাচ্ছিল, সেখানকার সেই পরিবেশটা তিনি পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন।

সেই মুহূর্তে নিবারণবাবু আস্তে আস্তে জানান গত ৩/৪ বছর ধরে মানুষ বায়স্কোপের পোকা হয়ে গেছে। যারা সাইকেল রিক্সা চালায় তারা সবাই কিন্তু বুঝতে পারে না। ভালো লাগে বলেই তারা যায়। আজকাল মানুষের মধ্যে ছবি দেখাটা খুব চল হয়ে গেছে।

মানুষ যেমন ঈশ্বরকে সাধনা করে তখন সে প্রত্যেক দিন আশা করে থাকে আজ হয়তো দেখা পাবে, ঈশ্বর জাগ্রত হবে, সত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে।

সমাজে কিছু মানুষ আছে যারা নিজের মুনাফার লোভে, স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যে কোনো কাজ করতে পারে। সেই রকম কিছু ব্যবসাদার মুনাফালোভী মানুষ আছে যারা মানুষের মন, রুচিকে হীন করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। তাদের সাফল্যে শিল্পে শ্বাসবুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। শব্দ মিত্র নিবারণ বাবুকে এই সকল কথা বুঝিয়ে বলার পাশাপাশি এও জানান, এমনভাবে চলতে থাকলে এমন দিন আসবে মানুষের যে দিন মানুষের কাছে শিল্পের কোনো মানে থাকবে না, জনসাধারণের মনে শিল্পের কোনো আবেদন থাকবে না।

নিবারণ বাবু এই সকল কথা শুনে শব্দ মিত্রকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কিছু না জিজ্ঞাসা করে নিজের চায়ের কাপের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তখন তিনি মরিয়া হয়ে আবার প্রশ্ন করেছিলেন—

“যদি এই কথাই বলি কী উত্তর দেবেন আপনি?”^৩

এই প্রশ্নটা পরে তিনি হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। তাই নিবারণ বাবুর দেওয়া উত্তরগুলো যথাযথ ভাবে মনে ছিল না তাঁর। সেই মুহূর্তে তিনি চায়ের কাপে মনোযোগ দেন।

শব্দ মিত্রকে দেওয়া নিবারণ বাবুর উত্তরগুলো কয়েকদিন পর অল্প অল্প করে মনে পড়ে। তিনি সেই উত্তরগুলো আমাদের জানান। সেগুলি হল—

“মানুষ থাকবে সমাজ থাকবে অথচ শিল্প থাকবে না। আপনি কী বলছেন ...। ... কোলের উপর বসলেই তো আর আপন হওয়া যায় না। আসলে মানুষের ভালোবাসাটা তো বুঝতে হবে মানুষগুলোকে তো জানতে হবে। ... যেটা তার ভালো লাগে সেটা অতো সহজে উড়িয়ে দিলে মানুষটাকে চিনবেন কী করে। আপনার সুখ দুঃখ যদি লোকের সুখ-দুঃখ হয় তবে আপনার কথা তারা শুনতে বাধ্য। তবু যদি না শোনে তাহলে আপনার মধ্যে নিশ্চয়ই কোথাও মিথ্যে আছে।”^৪

তাঁর এই কথা গুলো বলার সময় চোখমুখে যেন একটা প্রদীপ্ত ভাব ছিল। কিন্তু শব্দ মিত্রের দিকে তাকিয়ে আবার নিস্তেজ হয়ে পড়েন। কারণ তিনি সেই মুহূর্তে নির্বোধ হয়ে পড়েছিলেন।

শম্ভু মিত্র একদিন আড্ডা দিচ্ছিলেন বাড়ির পিছনের বারান্দায়। সেখানে নিবারণবাবু ও তাঁর গ্রামের সুফিউদ্দিন, হাজং কান্দাল দাস ও তাঁর একজন সঙ্গী উপস্থিত ছিলেন। সেখানে তাঁরা নানা রকম গান গেয়েছেন। যেমন—হাজংদের পাহাড়ী গান, ময়মনসিংহের Folk Opera ইত্যাদি। সুফিউদ্দিন সেই সময় রবীন্দ্রনাথের—‘আয়রে মোরা ফসল কাটি’ গানটি গেয়ে ওঠেন।

তিনি তার গান শুনে অবাক হয়ে যান। কারণ সেই সময় মৈয়মনসিংহে যে গণ সংগীত প্রচলিত ছিল সেটা না করে রবীন্দ্রনাথের গানটি করেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে গানটির কথা সুরে প্রশংসা করেন। তাদের কাছে এই প্রশংসা শুনে তাঁর চোখে জল আসে। এখানে আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রতি শম্ভু মিত্রের ভালোবাস ও শ্রদ্ধার কথাটা জানতে পারি। এই মুহূর্তে শম্ভু মিত্র আবেগে উদ্বেলিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের লেখা দুটি কবিতা- ‘প্রশ্ন’ ও ‘সুপ্রভাত’ আবৃত্তি করেন।

শম্ভু মিত্র বলেন এর পর যে ঘটনাগুলি ঘটে সেগুলি তিনি লিখে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি হাত মুখ নেড়ে বহুবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে বোঝাতে পারেনি। যেমন বহু দিন অন্ধকার কারাগারে থাকার পর কয়েদিরা যেমন হঠাৎ পৃথিবীর আলোর ঝলকানি দেখেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে একটা অজস্র সবুজ ঘাস আকাশ তার দৃষ্টিতে পড়ে তখন তার মনের ভেতর কিসের ছোঁয়া লাগে। এই রকম চাউনি তিনি আগে কখনও দেখেনি। পরে সেটা দেখেছিলেন মাহেশের রথতলার মাঠে বাঙালী মজুরের চোখে যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রদের চোখে, কাশ্মীরে মৃত্যু অবিশ্বাসী তরুণ যক্ষারোগীর চোখে। শম্ভু মিত্র এই ঘটনাগুলি যতবার দেখেছেন ততবারই তাঁর নিবারণ বাবুর কথা মনে পড়েছে। এই সব পরিস্থিতি থেকেই দেশের মানুষকে চেনা যায়। তিনিও চিনেছেন। আর বারে বারে শ্রদ্ধায় অবনত হয়েছিলেন।

শম্ভু মিত্রের আবৃত্তি করা কবিতা দুটি কার লেখা নিবারণ বাবু জানতে চাইলেন। তার আগে কবিতার পাশাপাশি গানটির লেখকের কথাও জানা ছিল না। শম্ভু বাবু খুব গর্বের সঙ্গে বললেন—

“রবীন্দ্রনাথের। আমাদের রবিবাবুর।”^৫

এখানে আমরা বুঝতে পারি শম্ভু মিত্র রবীন্দ্রনাথকে কতটা আপন করে নিয়েছিলেন।

নিবারণ বাবু রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আগে কোনো কথা শুনে নি বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি শম্ভু বাবুকে বলেছেন—এসব তারা শোনে নি কেন? কিন্তু নিবারণবাবুর কথা তিনি কোনো উত্তর দেন নি। কারণ শম্ভু মিত্রের মনে হয়েছে এই উত্তর দেওয়ার দায় তার একার নয় তাঁর মতো সকল ভদ্রলোকের।

নিবারণ বাবু শেষে রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি লিখে দিতে বলেছিলেন। শম্ভু মিত্রের সকল কবিতা মুখস্থ না থাকায় তিনি জানান—

“কলকাতায় পৌঁছেই আমি আপনাকে ‘সঞ্চয়িতা’ একখানা পাঠিয়ে দেব, তাতে অনেক কবিতা পাবেন।”^৬

তিনি ও তাঁর কথায় অবাধ্য ছেলের মতো রাজী হয়ে যান। শেষে বলেন যে কবিতা দুটি তিনি আবৃত্তি করেছেন সেগুলি লিখে দেবার জন্য। শম্ভু মিত্র সেগুলি লিখে দিয়েছিলেন।

একদিন শেরপুর থেকে জনতিনেক বন্ধু নিয়ে মধ্যরাত্রে ফিরলেন। ফেরার পর কিছুটা সময় গল্প করে কল ঘরে যাচ্ছিলেন। সেই সময় চারিদিকটা নিবুম ছিল শীতের রাত আকাশে চাঁদ নেই আর উঠানের আম গাছ আর দেওয়াল একরকম হয়ে গিয়েছে। আর এইরকম পরিস্থিতিতে শম্ভু মিত্র নিবারণ পণ্ডিত ও সুফিউদ্দিনের ঘর থেকে একটা গুন গুন শব্দ শুনতে পান। সেটা শুনে স্পষ্ট বুঝতে পারেন গুন গুন আওয়াজটা হল তার লিখে দেওয়া কবিতা দুটি পড়ার। এখান থেকে তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রমটা কতটুকু সেটা জানতে পারেন।

উঠানের অপর পাশে গাছের অবয়ব গুলি যেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে তেমনি নিবারণ পণ্ডিতের এই প্রতিভা দেখে তাঁর জীবনবোধের নতুন পর্যায় জানা হয়।

আমরা এখানে শম্ভু মিত্রকে অন্যরকম দেখতে পায়। তিনি যে জীবনের প্রতি মুহূর্তে নানারকম বাস্তব জ্ঞান অর্জন করেছেন সেটা জানাতে কুঠা বোধ করেনি। আবার নিবারণ

পণ্ডিতকে গ্রাম্যকবি হিসাবে কোনো রকম হেয় করেননি। বরঞ্চ তাঁকে যথেষ্ট সম্মানের সঙ্গে বরণ করেছেন এবং তাঁর প্রতি তিনি যে যথেষ্ট কৃতজ্ঞ ছিল সেটাও স্বীকার করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁর গান ও স্বরলিপির একটি বই প্রকাশ করেছেন।

মাহেশে (১৯৪৯):

‘মাহেশে’ প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক শম্ভু মিত্র মাহেশের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন। প্রাবন্ধিক ১৯৪৯ খ্রী: রচিত প্রবন্ধের শুরুতে প্রাবন্ধিক জানিয়েছে—মাহেশের মাঠে সন্ধ্যার পরে একটা আলো দেখা যাচ্ছিল। সেটা ছিল ‘কারবাইডের’। সেখানে একটা আসন ছিল বক্তা আর গায়কের জন্য। আর অন্ধকারের মধ্যে যারা ছিল তারা হল মজুরের দল। সেখানে একটা বক্তৃতা চলছিল। বক্তৃতার শ্রোতারা ছিলেন এই মজুর দল। এই মজুরের মধ্যে শুধুমাত্র বাঙালীর ছিল না। বিহারীও ছিল।

সেখানে একটু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। অনুষ্ঠানে গান ও আবৃত্তি ইত্যাদি হয়। গান ও আবৃত্তিতে যখন আসর জমে উঠছে তখন বিহারীরা চলে যেতে শুরু করে। প্রথম দিকে যখন গান গান হয় তারা না বুঝেও শুনছিল। কিন্তু যখনই আবৃত্তি শুরু হয় তখন তারা আর নিজের আটকে রাখতে পারে না। এখানে ভাষার একটা খুব মোটা ব্যবধান ছিল।

এখানে আবৃত্তি হয় কাজী নজরুল ইসলামের ‘কুলি মজুর’ কবিতা ও একজন আধুনিক কবির স্পষ্ট সময়োপযোগী কবিতা। কবিতা দুটিই ছিল খুব স্পষ্ট। এই কবিতা দুটি কুলি মজুরদের উদ্দেশ্যে লেখা। কিন্তু কবিতা দুটি শুনে সকলের মধ্যে কোন স্বতঃস্ফূর্ত ভাব নেই। একজন শ্রোতা মাথা নাড়লেও কোথাও যেন একটা নিস্তব্ধতা ছিল। সত্যকে ভালো লাগার যে উত্তেজনা, বা টান সেটা তাদের মধ্যে ছিল না। তাদের কবিতার আলোচনা স্পষ্ট থাকলেও মনে স্পর্শ করেনি।

মানুষ কতটা মন দিয়ে শুনছে তা পরখ করার জন্য জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের ‘মধুবংশীর গলি’ আবৃত্তি করা হয়েছিল। শম্ভু মিত্রের মনে হয়েছিল অনুষ্ঠানের আগের দিন সন্ধ্যায় ইউনিয়ন আপিসে এটি আবৃত্তি করা হয়েছিল। আবৃত্তির সময় লোকজন অল্প ছিল এবং আলোটা এত বেশী ছিল যেন প্রত্যেকের মুখ স্পষ্ট দেখা গিয়েছিল। কিন্তু মাহেশের মাঠে যখন এটি শোনানো হয়

তখন শুধুমাত্র আবৃত্তিকারকে দেখা গিয়েছিল। আর এদের নিয়ে একটা প্রশ্ন জেগে ছিল দল পাকিয়ে যারা অন্ধকারে বসে আছে তারা ১৫/২০ মিনিট ধরে আবৃত্তি শুনবে কিনা? সেখানে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল সেটা হল সবাই দল বেঁধে তা শুনে ছিল এবং সকলে অবাক হয়ে যায় তাদের শোনার আগ্রহ দেখে।

সেখানের অন্ধকারে দল পাকিয়ে যত মজুর ছিল তাদের মধ্যে শম্ভু মিত্র একজন মজুরকে বেশি করে মনে রেখেছিলেন। সে ছিল ২৩/২৪ বছরের এক যুবক। সে আবৃত্তি কারের আবৃত্তি শুনে প্রশংসা করতে মঞ্চে উঠলেও তার বাক্য রোধ হয়ে যায়। সে তখন উজ্জ্বল চোখে অদ্ভুত হেসে বলে—বড্ডো ভালো। বলেই নেমে পড়ে।

আবৃত্তিকারকে নিমন্ত্রণ করে ডেকে নিয়ে যান মজুরদের ক্লাবে। ক্লাবটির গেটটা ভাঙা এবং আগাছায় ভর্তি। ভেতরে ঢুকে দেখে সিঁড়ির ইট বেড়িয়ে আছে। বারান্দার পাশে একটি হলঘর। এটি হল আসলে শ্রমিকদের মেস। এই মেসে আবৃত্তি হয় দু তিনটে কবিতা। কিন্তু এখানে সেই যুবকটি এক কোণায় বসে আছে এবং শম্ভু মিত্র মাঝে মাঝে ওর চোখের দিকে তাকাচ্ছে। ঘরের মধ্যে যে আলোটি পড়ে সেটি দেখে শম্ভু মিত্রের মনে সেই আলোটি সাপ হয়ে যেন তার মাথার শিরাগুলোকে কামড় দিচ্ছে। কারণ তাঁর চোখ মুখের মধ্যে দিয়ে একটা চাকচিক্য প্রকাশ পাচ্ছিল। এবং চোখের তারা যেন চিকচিক করছিল।

এই কবিতা আবৃত্তি মেসের সকলের খুব ভালো লাগে। কি কারণে ভালো লাগল সেটাই প্রশ্ন সকলের। তাই শম্ভু মিত্র বুড়ীর মত পা ছড়িয়ে অভিজ্ঞতার সুতো বাছার চেষ্টা করেন জট ছাড়ানোর জন্য। তার এই জট ছাড়ানো দেখে অনেকে বলেন—

“এটা নিয়ে আপনি এতো মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? এই যে সব বাঙালী মজুর, এরা সবাই প্রায় আপনার আমার শ্রেণীর থেকে এসেছে, কিছুটা লেখাপড়াও করেছে এদের reaction হচ্ছে বিলকুল পাতি বুজ্জিয়া reaction এরা সাধারণ মজুরের প্রতিভূই নয়।”^১

তার এই সকল কথা শুনে অনেক দিন আগে আলাপ হওয়া এক মহিলার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। সেই মহিলা শম্ভু মিত্রকে বলেছিলেন—

“আপনি নিবারণ পণ্ডিতের কথা তুলবেন না। সে ঠিক সাধারণ চাষী নয়, সে বঙ্কিমচন্দ্র পড়েছে, শরৎচন্দ্র পড়েছে, তার ভালো লাগলেই যে সেটা সাধারণ চাষীর উপযুক্ত হোল এটা কোনও যুক্তিই নয়।”^২

তার কথা শুনে শম্ভু মিত্র একটা কথা বলেন পাঠকদের উদ্দেশ্যে বুঝুন।

কবিতা আবৃত্তির ক্ষেত্রে সব চেয়ে বড়ো ভূমিকা পালন করে আবৃত্তিকারের মনটা আর এই কথা মনুষ্যত্ব যুক্ত মানুষের কারোর বুঝতে বাকি থাকে না। শম্ভু মিত্র এখানে জানান, তিনি ‘মধুবংশীর গলি’ কবিতাটি পড়ে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন না। যখন সেটা আবৃত্তির মাধ্যমে শোনে তখন আর কোনো রকম অসুবিধা থাকে না। তিনি আরো বলেন formal সম্পর্কটা আসলে কবিতা ও শ্রোতাদের মধ্যে নেই। সেটা থাকে কবিতা এবং আবৃত্তিকারের মধ্যে। কারণ একজন আবৃত্তিকার আবৃত্তি করার সময় আবেগ ও অনুভূতি দিয়ে আবৃত্তি করেন।

এই যুক্তিটি কোনো কোনো ক্ষেত্রে সত্যি হয়। সব ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হয় না। কেনো খ্যাতিনামা ব্যক্তির মৃত্যুতে অনেক কবি অনেক কবিতা লেখেন। কিন্তু সেই সকল কবিতাগুলির মধ্যে নিরানব্বইটা বাজে হয়। কারণ এগুলির মধ্যে দিয়ে সত্যিকারের আবেগ কম প্রকাশিত হয়। সবই কৃত্তিম আবার এই কবিরা যখন নিজেদের শোক নিয়ে লেখেন তখন সেটি সার্থক কাব্যে পরিণত হয়, অনেক সময়। তাহলে এখানে বোঝা যাচ্ছে formal সম্পর্কটা হচ্ছে কবি ও কবিতার মধ্যে। মানুষের মনের যে দুটি স্তরের আছে সেটাকে শম্ভু মিত্র নাম দিয়েছেন ক) বৈঠকখানা আর খ) অন্তরমহল।

বৈঠকখানা বলতে তিনি বুঝিয়েছেন মনের ছোটো গন্ডীকে। আর অন্তরমহল হল বৃহৎ গন্ডী। সেখানে শিল্পীরা নিজের মনের অনুভূতিগুলিকে খোলামেলা ভাবে ব্যক্ত করতে পারেন। অন্তর মহলে সমস্ত আঁতের শিরার মতো জড়ানো। সে সকল শিল্পীরা বৈঠকখানায় আবদ্ধ তাঁরা

নিজেকে ঠকায়। এবং এদের যাঁরা পক্ষ নেয় তারা আবার ইতিহাসকে ঠকায়। এই যুক্তিটা অনেকেই সমর্থন করেন।

আবৃত্তিকারের সাম্প্রতিক মনের গ্রহণভঙ্গী অনেকখানি জমি অধিকার করে আছে। তাই কুলি মজুর এই কবিতাটি তাদের ভালোও লাগে। কিন্তু দেখা যায়, সেই পর্যায়ের বোধ এই আলোচনার মধ্যে ওঠে না।

শম্ভু মিত্র আমাদের সামনে এই রকম রবীন্দ্রনাথের ‘দুঃখময়’ নামক কবিতাটির উদাহরণ তুলে ধরেন। এই কবিতার মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আবেদন দেখা যায়। এই কবিতা যখন স্বাধীনতার পর শোনে তখন ভালো লাগে কিন্তু সেটা মনে আগের মতো নাড়া দেয়নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে শম্ভু মিত্র একটি প্রশ্ন করেছেন মাহেশের মজুরা কবিতা শুনে মুগ্ধ হয়েছে আবৃত্তির জোরে কি?

শ্রোতাদের সাম্প্রতিক মন ও আবৃত্তিকারের মন যদি সময় ও পরিস্থিতি অনুযায়ী এক তরে বাঁধা থাকে, তাহলে তাদের কবিতা ভালো লাগবে। আর ভালো লাগলেই কোনো সমস্যা দেখা দেবে না।

‘মধুবংশীর গলি’ কবিতাটি মধ্য বয়সী ডেলি প্যাসেঞ্জার থেকে শুরু করে নাক উঁচু নকল ইনটেলেকচুয়াল সকলের ভালো এই কবিতার মধ্যবিত্ত মানুষের হতাশা, অসহায়তা, ঠোঁট চাপা প্রতিজ্ঞার প্রকাশ দেখা যায়। আর এখানে সাধারণ মানুষের অবস্থা চোখে পড়া, এর ফলে এই কবিতার আবৃত্তি সকলের ভালো লাগে যায়।

শম্ভু মিত্র আবার বলেছেন, বক্তব্যের সততাই যদি কবিতার একমাত্র বিষয় হয় তাহলে আঙ্গিকের সম্পর্ক কোনো কথা বলা চলবে না। মাঝে মাঝে দেখা যায় আঙ্গিককে এমনভাবে ব্যবহার করছে মানুষ সেটা একটি সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

আমাদের দেশে ইংরাজী শিক্ষা চালু হওয়ার পর থেকে দেশের শিল্পীর ভাষা ও কিছু কিছু মানুষের ভাষা অনেক পরিবর্তন দেখা যায়। অনেকটা সময় পার হওয়ার পরই মানুষ সচেতন

হয় একটা সেতু বাঁধতে হবে বলে। এই চেষ্টা করার জন্য শম্ভু মিত্রের মতো কিছু মানুষ কোমর বেঁধে এগিয়ে আসে। তাদের ইচ্ছা সৎ ছিল এবং তাদের বিশ্বাস হয়তো এটা সম্ভব হবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার মধ্যে আমরা সাধু ভাষার প্রভাব দেখতে পায়। তাই তাঁর ভাষাকে অনেকে ‘শব পোড়া মড়া দাহ’ বলে থাকে। কিন্তু শরৎচন্দ্রকে তা বলেন না, তিনি শতকরা ১৫ আনা লোকের ভাষা সংগ্রহ করে বর্তমান সময়ের সঙ্গে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন এবং বাংলা সাহিত্যকে নতুন জীবন দান করেছেন। এই যে মানুষকে ভালো লাগানো চেষ্টা এটা অনেক দিন থেকে হয়ে আসছে আমরা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির মধ্যেও এর পক্ষে বিপক্ষে নানা রকম যুক্তি দেখতে পায়।

আবার আর একটা চোখে পড়ে বাউলেরা প্রাকৃত ভাষায় যে গানগুলি রচনা করেন সেগুলি কিন্তু বঞ্চিত ছিল না। এখানে আমরা সমাজের দুটি ঢেউকে একসাথে মিশতে দেখতে পায়। উত্তরাধিকারীর প্রতি যে দায়িত্ব সেটা কায় মনে বহন করছে সেটা শম্ভু মিত্র সকলকে স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেন। তাছাড়া গদ্য ভাষার দিকে যদি আমরা তাকায় তাহলে দেখব সেখানে অস্বাভাবিক ভাষা খুব কম আছে। কাব্যের মধ্যে কিছুটা থাকলেও আমরা নাড়া খেয়ে এড়িয়ে যায় না। কষ্ট করে বুঝতে চেষ্টা করা হয়।

শম্ভু মিত্র এই কষ্ট স্বীকারের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেননি। তিনি এও জানিয়েছেন সেতু বাঁধবার প্রয়োজনটা উভয় পক্ষের। কিন্তু বাস্তবে এটা বিচ্ছিন্ন ভাবে ঘটতে দেখা যায়। তিনি নিবারণবাবুর প্রসঙ্গে টেনে জানান, নিবারণবাবু যখন রবীন্দ্রনাথের গান—‘আয়রে মোরা ফসল কাটি’ ও কবিতা দুটি শুনতে লাগেন তখন আর তিনি পুরোনো মানুষ থাকেন না। তাঁর মধ্যে আধুনিকতার ছাপ পড়তে থাকে। আবার রবীন্দ্রনাথের নিবারণবাবুর কবিতার প্রভাব পড়তেও দেখা গিয়েছে এবং তাঁর কবিতার ধরণটাই ভিন্ন সেটা জানা গিয়েছে।

শম্ভু মিত্রকে একদিন নিবারণ বাবু তাঁর নিজের লেখা কবিতা পড়তে দেন। কবিতাটি পড়ে শম্ভু মিত্রের লোভ হয়েছিল আবৃত্তি করার জন্য। কিন্তু তাঁর কোথাও একটা ভয় ছিল। তাই তিনি কবিতাটি তাঁকে পড়ার অনুরোধ করেন তাঁর গলায় শোনার জন্য। শম্ভু মিত্রের ভয়টা সত্যি

হয়ে ওঠে যখন তিনি নিবারণ বাবুর গলায় কবিতা শোনেন। তাঁর কবিতার মধ্যে যে সত্যতা ছিল সেটা তাঁর গলায় বেশি মানিয়েছিল। শঙ্কু মিত্রের মোটা গলায় যে সেটা অত্যন্ত মেকি লাগত তিনি নিজেই সেটা বুঝতে পারেন। আর এই কবিতাটা সৃষ্টির জন্য শঙ্কু মিত্রের আবৃত্তিই দায়ী ছিল। এই যে লেনদেনের প্রক্রিয়াটা চলেছে এটা বেঁধে রাখতে অনুরোধ করেছেন আধুনিক শিল্পীদের কাছে এই বাঁধনটা যত মজবুত হবে ভবিষ্যতের পথটাও সুন্দর হবে।

কবিতার ভাষা যে কতটা স্পষ্ট, কতটা সহজেই নিজেদের মনের কথাকে প্রকাশ করা যায় তিনি তা একটা উদাহরণের সাহায্যে আমাদের সামনে তুলে ধরেন। সেটি হয় যুক্তরাজ্যে এক কিশান সম্মেলনে এক চাষীর ব্রিটিশকে উদ্দেশ্য করে বলা কবিতাটি হল—

“খুশী রহো ইয়া রক্ত রহো

তুম আপনা ঘরে, হম আপনা ঘরে।”^৩

এর মধ্যে দিয়ে ঘৃণা, রাগ প্রকাশ পেলেও সেটি শঙ্কু মিত্রের মতো অনেক মানুষকে মুগ্ধ করেছিল। তাই তিনি এটাকে ঐতিহ্য, সংস্কৃতি বলে মনে করেছেন। কিন্তু তাঁর মনে প্রশ্ন থেকে গেছে এই স্পষ্ট সহজ পদ্ধতি মানুষের আমূলকে কি নাড়িয়ে দেবে?

শঙ্কু মিত্র এই সকল ঘটনা দেখে বুঝতে পারছেন যে বাস্তব তাঁর সামনে চ্যালেঞ্জের মতো দাঁড়িয়ে তাঁকে বলছে—

“আমাকে প্রকাশ করো দেখি তোমার ক্ষমতা।”^৪

পৃথ্বী থিয়েটার (১৯৫০):

পেশাওয়ার একজন বিখ্যাত লোক হলেন পৃথ্বীরাজ কাপুর। ‘পৃথ্বীরাজ’ নামে তিনি ভারত বিখ্যাত। তিনি একটা হিন্দুস্থানী থিয়েটার গঠন করেছিলেন। সেখানে প্রত্যেক সপ্তাহে অভিনয় হত। হিন্দুস্থানী মঞ্চজগতে এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। তিনি হিন্দুস্থানী থিয়েটারের যে সম্মান এনেছেন যার জন্য নাট্য সম্প্রদায় গর্ববোধ করবে বলে প্রাবন্ধিক শঙ্কু মিত্র মনে করেন।

বোম্বের মতো জায়গায় থিয়েটার করবার মতো প্রেক্ষাগৃহ পাওয়া কষ্টকর ব্যাপার। তবুও

তিনি তাঁর দলকে অভিনয় করানোর জন্য প্রচুর টাকা দিয়ে একটা সিনেমা হল ভাড়া নেন। কিন্তু সেখানে তিনি সকাল বেলায় ছাড়া অভিনয় দেখাতে পারতেন না। এতে তার প্রচুর লোকসান হত। হয়তো সন্ধ্যা বেলায় হলে এটা হত না। সপ্তাহের অন্যদিনের তুলনায় রবিবারে একটু বেশি লোকজন দেখা দিত। তিনি দেশের অন্য প্রান্তরেও গিয়ে অভিনয় দেখিয়েছেন। পৃথ্বীরাজ দর্শকদের কাছ থেকে টাকা চেয়েছেন রিলিফের কাজের জন্য। তাছাড়া তিনি আশা করেন প্রত্যেক দর্শক যদি একটাকা করে দেয় তাহলে একটা বরিট প্রেক্ষাগৃহ তৈরি হতে পারবে, কিন্তু তার সঙ্গে বলেন, অভিনয়টা এমন হবে যেন দর্শকের মন ছুঁয়ে যায়।

বোম্বাই শহরটি বিভিন্ন জাতির মানুষের বাস হলেও মূলত সেখানে গুজরাটি ও মারাঠিরাই বেশি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটি ছিল হিন্দুস্থানী ছবির জন্মকেন্দ্র। এখানে হিন্দুস্থানী ভাষার লোক বেশি না থাকলেও, যারা টাকা চেলে ছবি তৈরি করেছেন তাদের কোন রকম লোকসান হয়নি। তাই প্রচুর ছবি এখানে তৈরি হয়। কথায় আছে—‘চলতে চলতেই চল্লিশ বুদ্ধি।’

ছবি তৈরির মাধ্যমে লোক জমাবার কায়দা কৌশল তৈরি করে নিয়েছিল, সাধারণ ভাষায় যাকে আমরা বলি ‘বোম্বাই মার্কা’।

পৃথ্বীরাজ তাঁর থিয়েটারে ঐ ‘বোম্বাই মার্কা’ নাটক অভিনয় করলে হয়তো সকাল বেলাতেও ভিড় জমে যেত। লোকসান দিয়ে হয়তো থিয়েটার চালানো হতো না, কিন্তু তিনি তা করেন। তাঁর থিয়েটার প্রথম অভিনীত হয় ‘শকুন্তলা’ নাটক। এটি বাদে আর যে সকল নাটক অভিনীত হয়েছিল সেখানে সাম্প্রদায়িক প্রীতি গড়ে তোলার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি কোন রকম ছাবলামি চাননি। অভিনয় করাটাই ছিল তাঁর একমাত্র Mission। তিনি তাঁর Mission সব সময় স্থির ছিল। কখন লাভের আশায় লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে পড়েনি। তাঁর থিয়েটারে শকুন্তলার পর অভিনয় হয়—‘দীওয়ার’ (প্রাচীর), ‘পাঠান’, ‘গদ্দার’, ‘আছতি’ ইত্যাদি নাটক।

‘দীওয়ার’ নাটকটি রূপক হলেও এর মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানদের সমস্যার কথা পাওয়া যায়। নাটকটির ঘটনা হল—দুই ভাই একসঙ্গে বাস করে। হঠাৎ একদিন বাড় বৃষ্টির রাতে আতুর হয়ে একটি বিদেশী মেয়ে আসে এবং ঘটনা ক্রমে দু’ভাইয়ের মধ্যে কলহ বেঁধে যায়। বড় ভাই

প্রথম নিজের জ্ঞান ফিরে পেলেও ছোটো ভাই তা পেল না যতক্ষণ না বাড়ির মাঝখানে পাঁচিল উঠল। এই নাটকটি ১৯৪৫ সালে অভিনীত হয়। এই নাটকে সবচেয়ে বেশি অর্থ রোজগার হয়।

‘পাঠান’ নাটকে দেখা যায় হিন্দু-মুসলমান ইত্যাদি জাতিভেদ না মেনে সকলের মধ্যে একটি মিস্তি সম্পর্ক। এটি প্রশংসিত হয়েছিল।

‘গদ্দার’ নাটকটি একজন মুসলমানের রাজনৈতিক কাহিনী নিয়ে রচিত। তিনি স্বাধীনতার জন্য প্রথম দিকে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু সেখানে থাকাকালীন তিনি বুঝতে পারলেন তিনি সাধারণ মুসলমানদের থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছেন। তাদের সঙ্গে কোন রকম যোগাযোগ রাখতে পারছেন না তখন তিনি মুসলিম লিগে যোগ দিলেন। এই ভেবে যে তিনি দুর্গত উৎপীড়িত মুসলিমদের পাশে দাঁড়াতে পারবেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। দেশ ভাগের পর শেষ পর্যন্ত মাথা ফাঁটিয়ে মরতে হল তাকে। এই নাটকের মধ্যে দিয়ে তিনি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রূপটি তুলে ধরেছিলেন।

আবার ‘আল্‌হিত’ নাটকের মধ্যেও ঠিক সাম্প্রদায়িকতার ছবি ফুঁটে উঠেছে। সেখানে দেখা যায়, পাঞ্জাবের বড়োলোকদের মধ্যে হঠাৎ দাঙ্গা দেখা যায়। অন্ধ বাবার একমাত্র মেয়ে ধর্ষিতা হয়ে বোম্বাই চলে যায়। বাস্তুহারার ভীড়ের মধ্যে জীবন যাপন করেন। যে ছেলের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল তার পরিবারের লোক ঐ মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে আপত্তি করেন। এবং শেষে মেয়েটি আত্মহত্যা করেন।

নাট্য বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে যদি নাটকগুলি বিশেষণ করা হয় তা হলে সেগুলি মনঃপুত হয় না। কিন্তু এর মধ্যে ফুটে ওঠে সততা, সহানুভূতিবোধের গভীরতা। বর্তমানে আমাদের দেশটা নোংরামিতে ভরে গেছে। কিন্তু তবু আমরা চোখ থাকতে অন্ধ হয়ে বসে আছি, আর তোতাপাখীর মতো আপ্তবাক্য বলে আসছি অনবরত। যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধে তখন আমরা একজন Nationalist মুসলিমের কথা ভাবি না, তাদের ভারতবর্ষের মতো Secular state এ স্থান দিতে পারি না। তাদের প্রতি সহানুভূতি হারিয়ে যায়। শুধুমাত্র মানুষ হিসাবে না ভেবে জাতি দিয়ে

বিচার করে। শেষে পর্যন্ত তাকে নির্যাতিত হত হয় হিন্দু ও মুসলমানের ধ্বজাধারী গুণ্ডাদের হাতে।

বুদ্ধিজীবী প্রগতি বাদী লোক প্রচুর দেখা যায় কলকাতায়। কিন্তু কেউ তারা প্রগতির দায়িত্ব পালন করে না। এই সকল মানুষদের সঙ্গে কাজের কোনো মিল থাকে না। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যদি কিছু করবার চাহিদা থাকত তাহলে দেশের নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন হত না। এই রকম পরিস্থিতিতেই পৃথ্বীরাজ মানুষের জন্য কিছু করার চেষ্টা করেছিলেন। হয়তো চেষ্টাটা করেছিলেন বলেই তাঁকেই সকলে খাতির করে।

‘যবন নিধন’ করতে নেমে আমরা বিচলিত। কারণ এই যজ্ঞে সৎ মুসলমানের মাথায় যে লাঠির আঘাত পড়ছে তার হাত হিন্দুরাও রক্ষা পাচ্ছে না মানুষের মধ্যে থেকে মানবতা বোধ হারিয়ে থাকে ফ্যাসিবাদের চেহারা উলঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। মানুষ এখন ভবিষ্যৎকে ভুলে গিয়ে আবেগে ভেসে চলছে। এই সকল ক্ষয় ক্ষতির মধ্যে দিয়ে ঋনের বোঝা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। আর এইসকল ঘটনাগুলো ইতিহাস হয়ে রয়েছে।

পৃথ্বীরাজের অভিনয়ের মধ্যে কিন্তু মুসলমানদের বিশ্বাসঘাতক অপবাদ নিয়ে মরতে হয়েছে। এই মৃত্যুর ঘটনা কিন্তু মানুষকে ভাবিয়ে তোলে ঢোক গেলা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। তিনি এই অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে মানুষের চোখে আঙুল দিয়ে বাস্তবতাকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেন। আমরা দেখতে পায়—

“পাঠান নাটকে হিন্দুর জন্য মুসলমানের আত্মদান, আত্মত্যাগ নাটকে দাস্ত
তাড়িত সংসারের অবর্ণনীয় অবস্থা—”^১

পৃথ্বীরাজের থিয়েটারের জীবন্ত রূপটা ‘যখন সামনে’ আসে তখন বাংলার থিয়েটারকে জীবন্ত বলে মনে হয়।

পৃথ্বী থিয়েটারে এই জীবন্ত রূপটা গড়ে ওঠার পিছনে কিন্তু নাটক শুধু চয়ন নয়, অভিনয়ের অবদানটাও কম নয়। এখানকার অভিনেতারা স্মারকের উপর নির্ভর না করে নিজেদের

ভূমিকাটাকে মুখস্থ করে রাখে, যার ফলে সেটা জীবন্ত ও পরিষ্কার হয়ে ওঠে। থিয়েটারের ঐতিহ্যকে ধরে না রেখে পৃথবীরাজ নিজের মতো করে একটি নতুন ধরনের সৃষ্টি করেছেন। সেখানে অভিনেতার মুখে কথা শুনে সেগুলিকে নাটকের কথা বলে মনে হয় না, মনে হয় সেগুলি অভিনেতাদের বানানো। এর ফলে এটি জীবন্ত হয়ে ওঠে দর্শকদের কাছে।

পৃথবীরাজের চিন্তাভাবনায় যে আধুনিকতার স্পর্শ আছে সেটা অভিনয়ের পাশাপাশি আলোর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট ধরা পড়ে। Film Studio যে ধরনের আলো ব্যবহার করা হয় তিনি সেই আলোর ব্যবহার করতেন। আর এই ধরনের আলো ব্যবহার করে তিনি যেখানে ইচ্ছা সরিয়ে নতুন নতুন রঙের আলোর ছক ব্যবহার করতে পারতেন।

শেষে বলা যায়, পৃথবীরাজের প্রচেষ্টা ছিল অপূর্ব। বর্তমানে বাংলা দেশের লজ্জাকর অবস্থা থেকে উদ্ধার করার জন্য এরকম একজন ব্যক্তির প্রয়োজন।

রক্তকরবী প্রসঙ্গে (১৯৫৫):

১৯৫৫ খ্রী: প্রাবন্ধিক শম্ভু মিত্র ‘রক্তকরবী প্রসঙ্গে’ নামক প্রবন্ধটি রচনা করেন। প্রবন্ধটি ‘সন্মার্গ-সপর্যা’ নামক প্রবন্ধ গ্রন্থে সংকলিত হয়।

‘বহুরূপী’ নাট্যদলের রবীন্দ্রনাথের ‘রক্তকরবী’ নাটক অভিনয়ের উদ্দেশ্যে, নাটকটির দৃশ্যসজ্জা, পোষাক, Dialogue বলার ধরন প্রভৃতি নিয়ে জন কৌতুহল নিবারণের জন্য এই প্রবন্ধটি লিখেছেন বলে প্রাবন্ধিক শম্ভু মিত্র জানিয়েছেন।

প্রথমেই প্রাবন্ধিক ‘রক্তকরবী’ অভিনয়ের উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন। সেই উদ্দেশ্য হল, জনসাধারণের চিত্ত আলোড়ন ও তাদের ভালো লাগাবার জন্য অনেকদিন থেকেই প্রাবন্ধিকদের ইচ্ছে ছিল ‘রক্তকরবী’ অভিনয়ের। কিন্তু হয়ে ওঠেনি। পরবর্তীতে ‘বহুরূপী’তে খালেদ চৌধুরীর যোগদানে প্রাবন্ধিকরা পুনরায় ‘রক্তকরবী’ অভিনয় করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আর এই ইচ্ছা প্রকাশের কারণ হল খালেদ চৌধুরীর অসামান্য নাট্য প্রতিভা। তিনি আঁকতেন, যেকোনো বাজনা বাজাতে পারতেন, গান সেখাতে পারতেন, তিনি নানা নতুন নতুন জিনিস উদ্ভাবন করতে পারতেন।

সেই কারণে বেশ কয়েকদিন নাটকটি সকলে মিলে পড়ার পর শুরু করলেন মহলা। আর মহলার পাশাপাশি চলতে থাকে দৃশ্যসজ্জার পরিকল্পনা। যেহেতু নাটকটি একটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ আর পুরো দৃশ্যটিই হল সমগ্র যক্ষ্মপুরীর চেহারা, তবে সেটা কোনো একটি বিশেষ দিনের চেহারা নয়, বরং অনেকগুলি বিশেষ দিনের একটা একত্রিত চেহারা। তাই দৃশ্যসজ্জাকেও বাস্তবসম্মত করে তোলা প্রয়োজন। যেমন—মজুরদের দাওয়ায় মজুররাই কথা বলতে পারেন, সেখানে কিন্তু রাজা আসতে পারেন না বা সর্দারও সহজে সেখানে আসতে পারে না। অথচ নাটকটি সকলকে নিয়ে। ফলে যদি ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য করে মাঝে মাঝে ছেদ দিয়ে একেক জনকে বা একেক পক্ষকে দেখানো হয় তাহলে নাটকের রস ক্ষীণ হয়ে যায়। তাই প্রাবন্ধিকরা গগনবাবুর ছবি থেকে একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। সেই পরিকল্পনা অনুসারে ও অর্থসামর্থ্যের কথা মাথায় রেখে প্রথমে তাঁরা প্রথমে একটা মডেল তৈরি করলেন খালেদ চৌধুরীর তিনতলার ঘরে প্রাবন্ধিক শম্ভু মিত্র, খালেদ চৌধুরী ও শীতাংশু মুখোপাধ্যায়। সেই মডেল দেখে মহলা দেওয়া শুরু হল। প্রাবন্ধিক বলেছেন—

“মডেলটা তৈরী করার পর আর একটা জিনিস অবিস্কার করা গেল যে এই দৃশ্যের মধ্যে যেখানে ইচ্ছে লোক দাঁড়ালেই একটা কম্পোজিশন হয়। একটাই দৃশ্য, সুতরাং এর এইরকম সচলতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। স্থানু অথচ সচল।”^১

উদ্দেশ্য ও দৃশ্যসজ্জার পরে প্রাবন্ধিক আলোক সম্পাতের কথা বলেছেন। তিনি তাপস সেনকে আলোর ব্যাপারে একজন বিখ্যাত ব্যাপারী বলেছেন। প্রাবন্ধিকদের প্ল্যান তাঁর ভালো লাগার পর নাটকের বিভিন্ন চরিত্র ও বিভিন্ন মুড নিয়ে আলোচনা করলেন প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন যে, অন্য যেকোনো সাধারণ নাটক অভিনয়ের থেকে অনেক বেশি আলোর ব্যবহার হয়েছিল ‘রক্তকরবী’-এর অভিনয়ে। তবে প্রাবন্ধিকের একটা আফসোসের সঙ্গে জানিয়েছেন যে—

“আমাদের নিজেদের বাঁধা কোনও মঞ্চ নেই, থাকলে এই দৃশ্যসজ্জা এবং এই আলো অন্ততঃ এর দ্বিগুণ ভালো হোত।”^২

এরপর প্রাবন্ধিক ‘রক্তকরবী’র ভাষা নিয়ে বলতে গিয়ে জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের

‘রক্তকরবী’র ভাষা তাঁদের সংলাপ বলতে অসুবিধা হচ্ছিল। ভাষাটাকে তাঁদের বেশি কাব্যময় বলে মনে হয়েছিল। তবে রবীন্দ্রনাথের ‘চার অধ্যায়’ অভিনয় করতে গিয়ে যে ভাষা নিয়ে কোনো অসুবিধা হয়নি তা প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন। যাইহোক একদিন প্রাবন্ধিকরা একজন গেঁয়ো লোককে নাটকটা শোনান। একটা দৃশ্যে চন্দ্রা বলে—

“সর্দারদাদা ... একবার বাড়ি যেতে ছুটি দাও!”^৩

এই উক্তিটি শুনে লোকটি হেসে ওঠে। লোকটিকে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বললেন—

“আমাদের দেশঘরেও ঠিক ঐরকম ভাবে কথা বলে। বলে, অমুকদাদা আমার ছেলের চাগরীটে হবে নি?”^৪

তখনই প্রাবন্ধিকরা বুঝতে পারেন যে, এটা আসলে গ্রামের ভাষা। গ্রামে ‘তোমারে’ বলা হয় আর শহরে বলা হয় ‘তোমাকে’। তবে ‘তোমারে’ এর ব্যবহার কবিতায় হয় বলেই ‘রক্তকরবী’র ভাষাকে কাব্যময় বলে মনে হয়। আর এই ভাষাতেই বেশিরভাগ বাঙালি কথা বলে। তাই রবীন্দ্রনাথ সেই গ্রাম্য ভাষাতেই ‘রক্তকরবী’র সংলাপ রচনা করেছেন। এবং গ্রাম্য কবির গানের ভাবেই রচনা করেছেন মাধুর্যমণ্ডিত গানের কথা ও সুর। প্রাবন্ধিক ‘রক্তকরবী’র ভাষা প্রসঙ্গে আরো বলেছেন যে—

“সেদিনের ভাষা সেদিনকার সব লোক বুঝতো। অথচ আজকের ভাষা কেবল ইংরেজি শিক্ষিতরাই বোঝে। অতএব যদি সেই ভাষার শিকড় থেকে রস নিয়ে আমরা আজকের দিনের কথা বলতে পারি, তাহলে আবার বাংলা ভাষা একটা বিরাট স্থানে পৌঁছতে পারে। নাটকে এরই প্রথম চেষ্টা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের হাতে। ... অথচ আমরা বুঝিনি।”^৫

আর এই সমস্ত কথা মনে করেই প্রাবন্ধিকরা সংলাপ বলার ধরনটা পাল্টান। তাঁরা নজর দেন যাতে সংলাপ ক্যাবিক না হয়ে যায়, আর ন্যাকামির পরিবর্তে সত্য কাব্য ফুটে ওঠে। যদি রবীন্দ্রনাথ কাব্যিক হতেন তা হলে হয়তো সংলাপে অবাস্তব সুর ফুটে উঠত। যদি সংলাপের

मध्ये अस्वाभाविक सुर लागिने काव्यटाके बाडिने फोटाबार चेष्टा करा ह्य तहले काव्य खर्ब ह्ये नाटकटिर संलाप क्यविक ह्ये उठत।

प्रबन्कर शेषे अवश्य प्राबन्किक शब्डु मित्र श्चिकार करेहन ये, संलापेर कथागुलो कतटा सुन्दरभावे बलबेन बले भेबेहिलेन ततटाओ सुन्दर करे बलते पारेननि। तवे 'रञ्जकरवी'र जीयन्त मानविक हासि, ठाटा, दुःख साधारण लोक काविक धोंयार अन्ककारे देखते ना पेलेओ 'बहुरूपी' श्रद्धार चोखे सेगुलि देखेहे ओ बुबेहे। आर तातेह 'बहुरूपी'र 'रञ्जकरवी' एर अभिनय एत जनप्रिय ह्ये उठेहिल बलेह आमर मने ह्य।

समस्यार एकटि दिक (१९५७):

एह प्रबन्कटि १९५७ श्चि: रचित ह्य। एह प्रबन्कर मध्ये दिने नाट्य आन्दोलनेर फले ये समस्यार देखा दिनेहिल तिनि सेटा पाठकदेर सामने तुले धरेन।

एह प्रबन्कटि शब्डु मित्र यखन रचना करेन तखनओ नवनाट्य आन्दोलन चलहिल। सेह समय एह आन्दोलनेर प्रसार हिल दश बारो बहर। किन्तु दश बारो बहर धरे आन्दोलन चल्लेओ गभीरता बेशि बाडेहिल ना। एर फले आन्दोलनेर लोकरा भरसा पाछिल ना एर परिणति कि हवे एटा भेबे। कारण एह आन्दोलनेर मध्ये दिने मानुषेर मनके आघात करा, कोनो भावे नाडा देओया कोनटैह ह्ये उठहिल ना। एर थेके किन्तु बोवा याय नवनाट्येर गतिटा।

शब्डु मित्र जानान, मानुष जीवने चलार पथे यखन वास्तवके देखते पाय, नाना रकम टाना पोडनेर मध्ये दिने चले तखनह से जीवनेर सत्यगुलोके बुबते पारे। एह उपलक्षिगुलोके प्रकाश करार जन्य विभिन्न व्यक्ति विभिन्न रास्ता बेहे नेय। येमन—केड कविता लेखे, केड नाटक लेखे, केड अभिनय करे इत्यादि। शब्डु मित्र पाठकदेर एटैह जानाते चैहने ये, यखन मानुष जीवनेके उपलक्षि करते पारवे तखन से शिल्ल सृष्टिके सार्थक करे तुलते पारवे। तार आगे शिल्लसृष्टि करलेओ तार मध्ये प्राणेर स्पर्श थाकवे ना। सेह रकम, नवनाट्य आन्दोलन, यखन दीर्घदिन धरे चलहे तखन बहुरूपीकार एह घटनाके विषय करे नाटक रचना करहे। तार मध्ये खुब कम नाटकहै हिल येखाने प्राणेर स्पर्श घटेहे।

শম্ভু মিত্র আরো জানিয়েছিল, একটা সত্যিকারের ভালো নাটক রচনা করতে নাট্যকারকে অনেক পরিশ্রম করতে হয় এবং অনেক কাঠ খড়ও পোড়ানো হয়। কোনো ব্যক্তি সারাদিন হাড় ভাঙা খাটুনির পর, সে যদি শিল্প সৃষ্টি করতে চায় তাহলে সেটা সার্থক হওয়ার সম্ভবনা কম থাকে। কারণ, শিল্প সৃষ্টির জন্য যে পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়, যে মানসিকতার প্রয়োজন হয় সেটা সে হারিয়ে ফেলে অর্থ উপার্জনের টানা পোড়নে পড়ে। আবার এটাও বলার বিষয় যে, তারা এতো শ্রম পরিশ্রমের পরে কিছুতো একটা সৃষ্টি করতে চাইছে এটাই যথেষ্ট। শম্ভু মিত্র এও জানান নাট্য-আন্দোলনের জন্য মানুষ অনেক কষ্টও করেছে। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি নবনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যারা জড়িয়ে ছিল তারা প্রচুর ধৈর্যশালী ছিল।

লোকসমাজে নিজের পরিচিতি বাড়ানোর জন্য যে কোনো ব্যক্তিকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। নবনাট্য আন্দোলনকারীরাও কিছুটা করেছে। এই আন্দোলনের ফলে বাংলা থিয়েটারগুলো যথেষ্ট সম্মান লাভ করেছে। আর সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তারা বাঙালী হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করে। এবং চিরকালের মতো নবনাট্য প্রেমি মানুষের মনে তারা জায়গা করে নিয়েছে। শম্ভু মিত্র জানিয়েছেন একটা সময় ছিল যখন সাধারণ রঙ্গালয়ে কোনো মহৎ নাটকের অভিনয় হত না। কিন্তু এই আন্দোলনের ফলে সাধারণ রঙ্গালয়ে এমন এমন বিখ্যাত নাটকের অভিনয় হয়েছে যেগুলি রঙ্গমঞ্চকে চিরকাল অনাদৃত করে রেখেছে। শ্রী অহীন্দ্র চৌধুরী সাধারণ রঙ্গমঞ্চের জন্য খ্যাতি লাভ করেন এবং এই মঞ্চের এক সর্বজনমান্য মানুষ তিনি দিল্লীতে একটি ‘ড্রামা সেমিনারে’ জানান—

“ভবিষ্যৎ বাংলা থিয়েটারের ভরসা এই নতুন দলগুলির ওপর, এদের নিজস্ব একটা প্রেক্ষাগৃহ হওয়া চাই।”^১

নবনাট্য আন্দোলনকারী কাজের মধ্যে দিয়ে নিজেদের প্রমাণ করেন। শম্ভু মিত্র জানান, মানুষ যদি তাদের ভালো কাজ করার সুযোগ করে দেয় তাহলে বাংলা থিয়েটারে সমৃদ্ধ করতে পারবে এবং সামগ্রিকভাবে দেশের উন্নতি ঘটবে। কিন্তু যদি তারা সব রকম সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয় ও পেট চালানোর জন্য কলকাতা কিংবা বোম্বে গিয়ে ব্যবসায়িক চলচ্চিত্রের সঙ্গে

যোগ দিতে হয় তাহলে ফলাফলটা ভালো হবে না। তাই শম্ভু মিত্র পাঠকে জানান এই মানুষের পাশে থাকতে, না হলে দেশের রঙ্গালয়গুলোর ক্ষতি হবে। সেই অপরাধ তখন পৌঁছবে দেশের কাঁধে।

নাট্যাভিনয় সুন্দর সার্থক শিল্প করার জন্য কি কি করা প্রয়োজন সেটা নিয়ে তিনি ভাবতে বলেন। তিনি আরো বলেন—

“শিল্পীর কাছ থেকে কেবল আশা করবো অথচ তার প্রতি দায়িত্ব পালন করবো না, এ মনোভাব থাকলে সমাজে সুস্থ শিল্প অসম্ভব।”^২

থিয়েটার সেন্টারের উদ্যোগে একটি নাট্যোৎসবের আয়োজন হয়েছিল। শম্ভু মিত্র জানিয়েছেন সেখানকার নাট্যোৎসবে যে সকল নাটক বিক্রি হয় সেটা দেখে অনেকে অবাক হয়ে যায়। সেই সময় ‘মিশরকুমারী’ বা ‘চক্রান্ত’ নাটকগুলিতে অনেক পেশাদারী শিল্পী অভিনয় করলেও অন্য ধরনের নাটক বেশী বিক্রি হয়েছিল। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ নয়। কারণ স্টার বা রঙ মহলে যখন ‘শ্যামলী’ ও ‘উল্কা’ বিক্রয় হয়, তখন তা বহুলোকে বিস্ময় হত করেছিল। এথেকে আমরা বুঝতে পারছি পৃথিবীতে যেমন বিভিন্ন মানুষ তেমনি রুচিও বিভিন্ন। তাই কারোর ‘শ্যামলী’ ও ‘উল্কা’ মতো নাটক ভালো লাগছে আবার কারোর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, ইবসেন বা চেখভের নাটকের অভিনয় দেখার জন্য আগ্রহ দেখা যায়। এই রবীন্দ্রনাথ, ইবসেন, চেখভের নাটকের অভিনয়ের মধ্যে আমরা মার্জিত রুচির পরিচয় পাই এবং সেখানে অভিনয় শিক্ষাটাকে একটু গভীরভাবে, অন্তরঙ্গভাবে দেখা যায় এটা শম্ভু মিত্র বলেন। কিন্তু এরা পাশাপাশি এও জানান যে, বিখ্যাত ব্যক্তির নাটকের পাশাপাশি অন্য সকল নাটককে গ্রহণ করতে হবে সকল দর্শকদের কথা মাথায় রেখে।

যে সকল ব্যবসায়ী মঞ্চ মালিক ছিল শম্ভু মিত্রদের শত্রু বলে মনে করতেন একথা তিনি আমাদের জানান। তাঁরা তাদের মঞ্চে একবারের বেশি একটা নাটকের অভিনয় করতে দিতেন না। কিন্তু তাঁরা চাইতেন ন্যায্য ভাড়া পর পর একটা নাটকের অনেকবার অভিনয় করতে এই রকম অবস্থায় তাদের ‘নিউ এম্পায়ার’-এ যেতে হয়েছে। সেখানে খরচটা বেশী হলেও কোনো

শক্ততা ছিল না। শম্ভু মিত্র জানিয়েছে, এক সময় অভিনয় করার জন্য আমোদকর নামক একটা কর দিতে হত। সেটা মঞ্চমালিকরা দিত না। নাট্যদলকে দিত হত। এর ফলে তারা যে টাকা পেত দর্শকদের কাছ থেকে সেটা সরকারী খাজনা ভাড়া আর বিজ্ঞাপনেই বেরিয়ে যেত। উপরন্তু যখন অব্যবসায়িক উদ্দেশ্য নিয়ে যদি রবীন্দ্রনাথ বা ইবসেন করতেন তাহলে খাজনা রূপ জরিমানা তাদের দিতে হত। বহুদিন চলা এই রকম পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পেতে মন্ত্রী শ্রী ভূপতি মজুমদারের কাছে যান তাঁর উদ্যোগে শ্রী বিধানচন্দ্র রায় এই কর মকুবের আদেশ দেন। এটা না হলে নাট্যদলগুলি দিনে দিনে অস্বাভাবিক হয়ে পড়ত।

শম্ভু মিত্রের সেই সময় মনে হয়েছিল নবনাট্যের উন্নতির জন্য একটি মঞ্চ দরকার। তিনি এমন একটি মঞ্চের কথা ভেবেছিলেন সেখানে কোনো দলের অধিকার থাকবে না, কোনো বিশেষ দলের নামে মঞ্চ পরিচিত হবে না। তিনি কলকাতা শহরে যে ভিন্ন ভিন্ন নাট্য দল আছে তাদের সকলকে এসঙ্গে নিয়ে এই মঞ্চটি তৈরি করার কথা ভেবেছিলেন। আর মঞ্চের উদ্দেশ্যের কথা নিয়ে বলেছেন—

“এই মঞ্চ লাভের লোভে পরিচালনা করা হবে না, পরিচালিত হবে শিল্পোন্নতির আদর্শে।”^৩

তাছাড়া বলেন, এখানকার কর্মীদের মাইনের ব্যবধান বাইরের জগতের মতো বিরাট হবে না।

সেই সময় কলকাতা শহরের প্রচুর ধনী ব্যক্তিদের বাসছিল। তাই মঞ্চ তৈরীর খরচ জোগানোর জন্য তিনি শেয়ার বিক্রির কথা ভাবেন। তিনি চেষ্টা করেন এবং দেখেন এক দেড় হাজার টাকার শেয়ার বিক্রি করা কঠিন হবে না। এমনকি পাঁচজন ভদ্রলোক ১০০০ টাকা দিয়ে শেয়ার কেনার প্রতিশ্রুতিও দেয়। তাছাড়া তিনি আশা রেখেছিলেন অন্যান্য নাট্যসংঘ এবং সাধারণ দর্শক নানা রকমভাবে পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়ে কাজটি আরম্ভ করে দেবার।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি শম্ভু মিত্র অভিনয় শিল্পটা এতটা ভালো বাসতেন যে তাঁকে যথার্থ, সার্থক করে তোলার জন্য আশ্রয় চেষ্টা করে গেছেন আমৃত্যু পর্যন্ত।

ইতি কৰ্তব্য (১৯৫৭):

অনামিকা কৰ্তৃক থিয়েটার সেন্টারে একটা বক্তৃতা মালার আয়োজন। সেই আয়োজনে করা হয়। শম্ভু মিত্রের উপর ভার ছিল বক্তৃতার উপসংহার টানা। তাই তিনি ১৯৫৭ সালে রচনা 'ইতি কৰ্তব্য' প্রবন্ধটি পাঠের মাধ্যমে সেই আলোচনা সভার উপসংহার টানেন।

শম্ভু মিত্র জানিয়েছেন ঐ আলোচনা সভায় নাট্যশিল্পের যে নানা বিভাগ আছে সেই সকল বিভাগগুলো আলোচিত হয়েছিল। তিনি বলেছেন নাট্যশিল্পের নাটকের ইতিহাস রূপসজ্জার ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা শুনলে এবং শিখলে দক্ষ হয়ে উঠতে পারে না। কারণ এটা কারিগরিক শিক্ষা নয়। তাছাড়া নাট্যজগতের মানুষদের কল্প শিক্ষার অভিনয় করতে করতে জীবন কেটে যায়। তাই শম্ভু মিত্র কলা শিক্ষা বলেছেন—

“গুরুস্থানীয়দের কাছে সমস্ত শিক্ষা করার পর আমরা যেন গভীর জলে এসে পড়ি, যেখানে অবস্থা অনুযায়ী নিজেদের বুদ্ধি খাটিয়ে সাঁতারের ভঙ্গী ও লক্ষ্য খুঁজে বের করতে হয়। আর তাই যদি পারি তাহলেই সত্যকার গুরু দক্ষিণা দিতে পারলুম বলে মনে করার অবকাশ ঘটে।”^১

শম্ভু মিত্র নিজেদের খুব বড় বংশের লোক মনে করেন। (এখানে তিনি বংশ বলতে নাট্য জগতকে বলা হয়েছে) বড় বংশ মনে করার কারণ হল, রবীন্দ্রনাথ সোফোক্লিস, শেক্সপীয়ার, ইবসেন প্রমুখ নাট্য ব্যক্তিত্ব পূর্ণ মানুষগুলির কাছ থেকে তাঁরা প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেছেন।

শম্ভু মিত্র যে জ্ঞান অর্জন করেছেন ঐ সকল ব্যক্তিদের কাছ থেকে তিনি সেগুলি কিভাবে ব্যবহার করবেন তা নিয়ে তাঁর মনে প্রশ্ন এসেছে। এই প্রশ্নে শম্ভু মিত্রের মনে হয়, হয়তো অনেক ব্যক্তির উত্তর হবে—

“আজকের দিনের মানুষ এবং আজকের দিনের জীবন ফোটবার পথে।”^২

নাট্যশিল্পের ক্ষেত্রে হাতে কলমে কাজ করতে করতে শম্ভু মিত্রের মনে অনেক রকম প্রশ্নের উদয় হয়। তিনি সেগুলি তার সহকর্মীদের সামনে তুলে ধরতে চান। কারণ তাঁর মনে

হয়েছে এই প্রশ্নগুলো তারা শুনলে নিজের মতো করে ভাবতে পারবে। এই ভাবনার ফলেই ভারতীয় নাট্যশিল্পের সৌষ্টব বৃদ্ধি করতে পারবে। কিন্তু তিনি এখানে গুরু ভূমিকা পালন করতে চাইছেন না কোনো বাঁধাধরা গণ্ডীও তুলে ধরতে চাইছেন না। এখানে তিনি নাট্যশিল্পের যাতে সমৃদ্ধি হয় তা ভেবে মনের কথাগুলি বলেন।

শম্ভু মিত্র বলতেন নাটকটা সবসময় মাতৃভাষাতে করা উচিত। না হলে অন্যদের আবেগ অনুভূতি সার্থকভাবে প্রকাশ হবে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি একটা উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন— কোনো একটা নাটকের একটি দৃশ্যে রাত্রির নানা রকম ভয়ঙ্কর ঘটনার পর ভোরের আলো ফুটছে। এই অবস্থাটাকে দর্শকদের কাছে গভীর ভাবে ফোটাতে সুরের দরকার, সেই সুরটা যদি কোন বিলেতী সুর হয় তাহলে সেটা ফুটবে না। কিন্তু যদি ভৈঁবোর আলাপ হয় তাহলে এর মধ্যে দিয়ে জীবন ভাবটা ফুঁটে উঠবে। কারণ আমরা ছেলেবেলা থেকে যে মাতৃভাষাটা শিখি সেটা শুধুমাত্র কথ্য ভাষা নয়। সেটা জীবনকে বোধ করার ও প্রকাশ করার একটা ধরন।

ভাষার ক্ষেত্রে আমরা দেশী ভাষার ব্যবহার করলেও রূপসজ্জার ক্ষেত্রে আমরা—

“বিলেতী নাটকের বিলেতী অভিনয়ের বিলেতী রূপসজ্জার অনুকরণ করি।”^৩

আমাদের দেশীয় অভিনেতারা অভিনয়ের সময় যখন বিদেশীদের রং লিপস্টিক লাগিয়ে মঞ্চে নামে তখন তাদের দেখে মনে হয় তারা যেন বাস্তবকে লঙ্ঘন করছে। কারণ বিদেশীদের গায়ের রং ও আমাদের গায়ের রং এর মধ্যে অনেক পার্থক্য তাই বিদেশীদের রং যখন ভারতীয় চামড়ায় পড়ে সেটা বিদেশীও হয় না আবার ভারতীয়ও হয় না।

শম্ভু মিত্র বলেছেন, অনেকে বিদেশী রং ব্যবহার করে না ন্যাচারলাইজমের দোহাই দিয়ে। কিন্তু এই রং এর ব্যবহারের ফলে দর্শকরা দূর থেকে অভিনেতাদের মুখটা স্পষ্ট দেখতে পায় এবং মুখের মাংসপেশীর সঙ্কোচনও বুঝতে পারে। তাছাড়া যেখানে খুব ফর্সা অভিনেতার প্রয়োজন হয় তখন ফর্সা অভিনেতা খুঁজতে না গিয়ে মেক আপ-এর সাহায্য নিতে হয়। তাই আমরা এখান থেকে বুঝতে পারি নাট্যক্ষেত্রে রূপসজ্জার প্রয়োজন কতটা।

শম্ভু মিত্র আমাদের জানিয়েছেন, রূপ সজ্জায় বিদেশী stick-এর ব্যবহার যেমন ভারতীয়রা মেনে নেয়। কিন্তু জীবনবোধ প্রকাশের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করছে unnaturalism দিয়ে।

জাপানীরা নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে তাদের এক পুরাতন রূপ বজায় রেখেছেন। সেটা চলচ্চিত্রের মধ্যেও দেখা যায়। তাই শম্ভু মিত্র জানান জাপানী ‘র শোমন’ ছবির দস্যু চরিত্রের অভিনয়ের মধ্যে Reality ফুটে ওঠে।

এর মধ্যে দিয়ে আমরা দেখতে পাই, জাপানীদের এই পদ্ধতিটা দেখে বিদেশীরা অনেক গবেষণা করে এবং বোঝার চেষ্টা করেন। জাপানীদের এটা পুরাতন রীতি। এই পুরাতন রীতিটা বজায় রাখতে দেখে শম্ভু মিত্র বলেন—

“গভীরতায় যদি পৌঁছতে হয় তাহলে নিজের আঙ্গিকেই পৌঁছতে হবে, শুধু পরের কাছে ধার করা আঙ্গিকে নয়।”^৪

কিন্তু তিনি ভারতের নাট্যাভিনয়ের বিধান মেনে নিতে বলেনি। তিনি বলতে চেয়েছেন বর্তমান দিনের মানুষের অবস্থা দর্শকদের কাছে তুলে ধরতে হবে এমনকি মানুষের কষ্ট ও চেষ্টাকে প্রতিফলিত করতে হবে।

যে সকল ব্যক্তির বলায় পাশ্চাত্যের ধাক্কায়, যান্ত্রিক সভ্যতার ধাক্কায় আমাদের নিজস্ব বলে কিছু অবশিষ্ট নেই, সব সময় আমাদের ইউরোপীয়দের অনুসরণ করতে হবে তাদের উদ্দেশ্যে বলেন—

“যার নাম অরুণ সে যদি ইংরাজি শেষে তাহলে কি তার নাম কেটে Arundale করে দিতে হবে, কাজের সুবিধার জন্য বাড়িতে আমরা বৈদ্যুতিক আলো জ্বালাতে পারি কিন্তু তাই বলে কি টাই পরে বেড়াতে হবে!”^৫

শম্ভু মিত্র বলতে চাইছেন সুশিক্ষা পাওয়ার জন্য দেশ, জাতি যে সব কথা না ভেবে, পিতৃ পরিচয়টা মনে রেখে পৃথিবীর জ্ঞান ভান্ডার থেকে যতটুকু জ্ঞানের প্রয়োজন ততটুকু সংগ্রহ করতে হবে। তাহলে মানুষ সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে।

শম্ভু মিত্র এমন একটা আঙ্গিক খুঁজতে চাইছেন যার মধ্যে দিয়ে সকল Real ভাবে ফুঁটে উঠবে এবং সেটা দেখামাত্রই মনে হবে এটা একমাত্রভাবেই সম্ভব। এই সময় কিন্তু কিছু ব্যক্তি বলেন বিদেশী বর্জন করে স্বদেশী গ্রহণ করতে। অর্থাৎ, এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ব্যঙ্গ করে বলেছেন তাহলে থিয়েটারটা বিদেশী নাম এটা ভুলে গিয়ে যাত্রায় ফিরে যেতে।

এই বিদেশী বর্জন প্রসঙ্গে পাঠকদের সামনে তিনি নানা রকম যুক্তি তুলে ধরেন। তিনি জানতে চান সিরাজদৌল্লা নাটকটি যখন কলকাতায় নাট্যনিকেতন মঞ্চে অভিনীত হয় তখন সেখানে দেশীত্ব ছিল না। আর যখন কোন দুর্গম গ্রামের যাত্রা পালায় অভিনীত হয় তখন সেখানে দেশীত্ব ছিল ?

আবার তিনি যখন যাত্রার দেশীত্ব জানতে চান তখন অনেকে বলেন, দৃশ্য পট নেই মঞ্চ নেই লুকানো আলোর খেলা নেই—এটাই হল ভারতীয়। কারণ কবিরকাব্য ও তার প্রকাশক নটনটী, ও দর্শকদের মাঝে অন্যকোনো বস্তুর আমদানীকালে সেটা কল্পনা শক্তিকে বাধা দেবে। কিন্তু শম্ভু মিত্র এগুলো মানতে পারেন না। তিনি বলেন—

“নাটককারের কাব্য যাতে আরও পরিপূর্ণ হয় দর্শকের সামনে ধরা দেয় তার জন্যেই তো এই সমস্ত কলাকৌশল।”^৬

তাছাড়া তিনি বলেন সংস্কৃত নাট্যাভিনয় ও মঞ্চের ওপর হত, তাহলে সেটা কি অভারতীয় হয়ে যাবে ?

শম্ভু মিত্র এতক্ষণ নঞর্থক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। এবার নিম্নে আলোচনার মাধ্যমে তিনি সদার্থক যুক্তিতে বলতে চেয়েছেন। তিনি এবার জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ খুঁটিনাটি উত্তরণ করে স্বল্প কিছু গভীর চলিষ্ণু বর্তমানের অন্তরের রূপটি প্রকাশ করতে চেয়েছেন।

শম্ভু মিত্র নাটকের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত নানা রকম মুদ্রা দোষের কথা বলেছেন। যেমন— ‘মানে কথাটা হল’ ‘ইয়ে তা তোমার গিয়ে’ ইত্যাদি। এগুলি পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত নাটকে দেখা যায় সেটা তিনি জানান। কিন্তু এই ঘটনাটা বাস্তবেও দেখা যায়। মানুষের মধ্যে কিন্তু নাটকের

ক্ষেত্রে এই প্রয়োগটা অন্য রকম। সেখানে এই মুদ্রা দোষগুলি দ্বারা ফুঁটিয়ে তোলা হয় আত্মার রূপ মানসিক গঠন ও জীবন দর্শনের বিভিন্নতা। তিনি এই সমস্ত মুদ্রাদোষকে আপাতদৃষ্টির খুঁটিনাটি বলেছেন।

অনেক সময় অভিনেতারা বিভিন্ন রকম চরিত্রে অভিনয়ের জন্য বিভিন্ন রকম মুদ্রাদোষের কথা ভাবেন। কারণ এর মধ্যে দিয়ে বহুমাত্রিক সত্ত্বার প্রকাশ পায়। কিন্তু অনেক সময় অন্তরের রূপটি সঠিক ভাবে প্রকাশ পায় না।

তাইতো শম্ভু মিত্র জানিয়েছেন—

“আমার যতদূর মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের কোনও স্থলে পড়েছি যে, চাকর প্রকাশ করতে গিয়ে আমি যদি বাঁকা ভাষা দিই তাহলে সেটাও জেলার তাও জেলার একটা বিশেষ চাকর হতে পারে কিন্তু সকল চাকরের মধ্যে নির্বিশেষ চাকর তার প্রকাশ হবে কী করে?”^৭

আলোচনা শেষ করার আগে শম্ভু মিত্র খালেদ চৌধুরী বলা একটি গল্প পাঠকদের জানান। গল্পটি হল, কোনো কে ইউরোপীয় রাজপ্রাসাদে একটা প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি ছিল। রাজা নানা কারণের জন্য সেই জায়গায় না যেতে পেরে তিনি তার চিত্রকরকে দিয়ে ছবিটি এঁকে নেন। এই ছবি দেখে তিনি অনেক তৃষ্ণা মেটান।

এক চিনা রাজারও ঐ ছবিটা আঁকার ইচ্ছা হয়। তখন সে একটা সুন্দর দৃশ্য দেখে একজন নামজাদা বিখ্যাত চিনা চিত্রকরকে সেই জায়গায় পাঠিয়ে দিলেন। সেই চিত্রকর সেই সেখানে অনেক দিন কাটানোর পর রাজার কাছে ফিরে এলেন। রাজা তখন তাকে দেখে খুশী হয়ে বললেন—

“কই ছবি কই? চিত্রকর মিষ্টি হেসে বললে ‘আজ্ঞে, এইবারে আঁকা শুরু করবো।’”^৮

রাজা তার কথা শুনে হতবাক হয়ে যায়। এবং সেখানে সে এতো দিন ধরে কি করছিল সেটা জানতে চায়। চিত্রকর তাকে বলেন—

“মহারাজ, আপনি তো আমার কাছে ঐ জায়গাটার সকাল বেলার রূপ কী বা বিকেল বেলার রূপ কী, তা চাননি। তা যদি চাইতেন তাহলে রং তুলি নিয়ে বসে সামনা-সামনিই আঁকা শুরু করে দিতুম। কিন্তু আপনি চেয়েছিলেন ঐ জায়গাটার একটা ছবি। ... তাই তো আমি এতোদিন ধরে কতো রকম করে জায়গাটাকে দেখে এলুম। এইবারে তার আত্মার মূর্তি ধ্যান করে তাকে আঁকবো।”^৯

এই আলোচনার শেষে এসে, শম্ভু মিত্র পাঠকদের এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, ভারতীয়রা বিদেশীদের কলাকৌশল দেখে ভালো করে জ্ঞান অর্জন করে তারপর সেটা তাঁরা নিজেদের মতো করে প্রয়োগ করে। আর শম্ভু মিত্র এটাকেই ভারতীয় শিল্পের তত্ত্ব বলেছেন।

অনন্যোপায়:

প্রাবন্ধিক শম্ভু মিত্র ‘অনন্যোপায়’ নামক প্রবন্ধটি ১৯৫৮ সালে ‘লক্ষ্য কী’ নামে রচনা করেন। পরবর্তীতে এই প্রবন্ধটি ‘অনন্যোপায়’ নামে ‘সম্মার্গ সপর্যা’ প্রবন্ধ গ্রন্থে সংকলিত হয়, তবে প্রবন্ধটির আকার ছোটো হয়ে যায়।

প্রবন্ধের শুরুতেই প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন যে, তিনি অল্প বয়সেই শিল্পকর্মে জড়িত হয়ে অনেকটা জৈবিক তাড়নাতেই শিল্পক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হন। অথচ তাঁর তখনও নিজ উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো বোধ জন্মায়নি। ফলে বিভিন্ন মত তাঁকে বারে বারে ভিন্ন ভিন্ন পথে চালিত করেছে। শম্ভু মিত্র বলেছেন—

“শুধু অন্ধকার গুহার দেয়ালে দেয়ালে হাতড়ে মরি একটা ফাটল খুঁজে পাওয়ার আশায়।”^১

তাই প্রাবন্ধিক আবেগ ও অনুভূতি দিয়ে কোনো অবোধ্য অর্থের মতকে মোটামুটি অর্থবহভাবে বিন্যস্ত করতে চেয়েছেন। আর এই জীবন বা যাকে বলা হয় Reality তাকেই তিনি এর কারণ বলেছেন। আসলে এই Reality জীবন যখন অজস্র ডাল-পালা বিস্তার করে তার ভীষন চেহারা

নিজে সামনে হাজির হয় তখন এর ভয়াল বাস্তবরূপকে আমরা সহ্য করতে পারি না। এর ফলে মানুষের অবয়বে সৃষ্ট ভগবানের অভয়দাতা চোখ দুটি প্রত্যেক বিপদের মাঝে স্মরণকালে স্পষ্ট ভাবে দেখা যায় তা সে যতই বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ নিগূর্ণ ব্রহ্মের কথা থাকুক না কেন।

আসলে প্রাবন্ধিক বলতে চেয়েছেন যে, জীবনকে সহজ ভাবে বা বাস্তবসম্মতভাবে বুঝতেই আমরা ভয় পাই। লক্ষণ সেনের সময় বাংলায় যেভাবে সতীদাহ প্রথার প্রসার বাড়তে থাকেছে তখন যেমন চোখে ঠুলি গুঁজে Reality কে দেখা হয়েছে, এখনও আমাদের দেশের তেমনই দশা। এর ফলে একদিকে যেমন শৈশব থেকেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব থাকে অপরদিকে তেমনি জীবনের পথে এগিয়ে চলার প্রতিটি পদক্ষেপে ঘাত-প্রতিঘাতের আমাদের নিজেদের ওপর বিশ্বাস এতটা কমে যায় যে যৌবনে পদার্পণ করামাত্রই জীবনের Reality এর মুখোমুখি হয়ে হাড়ি কাঠের দিকে টানা ছাগলের মতো অস্থির হয়ে আঁকুপাঁকু করে একটা উপযুক্ত মতবাদকে খুঁজে বেড়ায়।

কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে যখন অভিজ্ঞতারও আরও বৃদ্ধি হয় তখন স্পষ্ট বোধ জন্মায় যে, বাজার চলতি এমন মতবাদ দিয়ে জীবনবোধ গড়ে তোলা সহজ নয়। জীবনের গতি-প্রকৃতি, জীবনের চাওয়া-পাওয়া সম্পর্কে জ্ঞান কারো নেই—কেউ পারবে না বলতে এ সম্পর্কে।

জীবনকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্যই পরিচিত গন্ডির সীমা ছেড়ে বেরিয়ে এসে জীবনকে স্পষ্ট ভাবে বোঝার ও অন্যকে বোঝবার চেষ্টা করাই হল শিল্পের কাজ, শিল্পীর দায়িত্ব। অর্থাৎ শিল্পী জীবনকে কতখানি বুঝেছে, তারই আলো দিয়ে দর্শকের নিজের আত্মাকে খুঁজে পাওয়ার পথে সাহায্য করবে। তাই এমন নাটকের প্রয়োজন যা জীবন সম্পর্কে অর্থাৎ Reality সম্পর্কে বা সত্য সম্পর্কে আমাদের বোধকে আরও উন্নত ও গভীর করে তুলবে।

আর এই জন্য প্রাবন্ধিক তাঁর নেশার ও পেশার মিল ঘটতে চেয়েছেন। তবে এই সততার লড়াই এ তিনি সবার কাছেই সাহায্য ও সহানুভূতি আশা করেছেন।

মঞ্চসজ্জার ভূমিকা (১৯৮৫):

একটা নাট্যাভিনয়ের সাফলতা নির্ভর করে শুধুমাত্র নাটকের অভিনয়, আলো সম্পাত, সঙ্গীত এসবের উপর নয়। এর পাশাপাশি মঞ্চসজ্জার যথেষ্ট ভূমিকা আছে। শম্ভু মিত্র এই প্রবন্ধটির মধ্যে দিয়ে নাটকে মঞ্চসজ্জার প্রয়োজন কতটা সেটা আলোচনা করেছেন।

একটা নাট্যাভিনয়ের সফলতার ওপর যেমন নাটক অভিনয় আলোক সম্পাত অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তেমনি প্রয়োজন হয় মঞ্চসজ্জার এই মঞ্চটার ওপর উঠে অভিনেতারা তাদের অভিনয়টা দর্শকদের সামনে তুলে ধরেন। তাছাড়া অভিনয়ের শুরুতে যখন যবনিকা উঠে যায় তখন দর্শকের চোখের সামনে আসে মঞ্চটা এবং তার সজ্জাটা। এই মঞ্চ সজ্জাটা যদি রুচি সম্মত না হয় এবং নাটকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে মিল না থাকে তাহলে নাটকের অন্তর্নিহিত রসবস্তু প্রকাশে বাধার সৃষ্টি হয়।

সব জিনিসের যেমন দুটো দিক হয়। তেমনি মঞ্চসজ্জারও দুটো দিক আছে একটা লাভ একটা ক্ষতি। উপরের আলোচনা ছিল ক্ষতির দিকের। এর ভালো বা লাভের দিকটা হল, এমন বিশেষ বিশেষ মুহূর্তের সৃষ্টি করে সেগুলি মানুষের মনে অমর হয়ে থেকে যায়। শম্ভু মিত্র এই প্রবন্ধটি মঞ্চসজ্জার ভালো দিকটি আমাদের সামনে তুলে ধরার জন্য লিখেছেন।

শম্ভু মিত্র জানিয়েছেন, আমাদের গত দেশে শতাব্দীতে বাংলা থিয়েটার ছাড়াও পার্শী থিয়েটার ছিল। এদের কারোর মঞ্চসজ্জা ভালো ছিল না। পার্শীরা দর্শকদের হাততালি পাওয়ার জন্য নানা রকম অলৌকিক ঘটনা, উদ্ভট ঘটনা ঘটাতেন যেমন—ট্রামগাড়ি দেখানো ভূমিকম্পের প্লাবন দেখানো ইত্যাদি।

এই সকল দিক দিয়ে বাংলা থিয়েটার ও কমে যেতে না। তারা পার্শীদের দেখে দেখে মঞ্চের উপরে সিংহ আমদানি করতেন, শূন্য পথে অস্পরী কিন্নরীদের নামিয়ে নাচ শেষে করে আবার শূন্য পথে উধাও করে দিতেন। এছাড়া মজার ঘটনা হচ্ছে, মহাদেবের কপালে তৃতীয়নেত্ররূপী বাস্ব জ্বালিয়ে কন্দর্প ভস্ম করতেন, বা শ্রীকৃষ্ণের চক্র শূন্য পথে এসে শিশুপালের শিরশ্ছেদন করতেন। তিনি শুনেছেন এই ছিল সকল ছিল তৎকালীন মঞ্চসজ্জার গৌরব।

যে সকল অভিনেতারা নাটকের বিষয়বস্তুর বা অভিনয়ের ভাব গভীরতার ওপর নির্ভর করতেন। তাঁদের এই সকল মঞ্চসজ্জার প্রয়োজন হত না। তাঁরা কোনো রকম আঁকা দৃশ্য পট পেলেই সেটা অভিনয়ের মধ্য দিয়ে দর্শকদের আকৃষ্ট করে ফেলতেন। যাদের এই রকম ভরসা শক্তি ছিল না তারাই পার্শীদের নকল করতেন।

বাংলা থিয়েটার যখন এই সকল উদ্ভট মঞ্চসজ্জায় পরিপূর্ণ তখন এই সবে হাত থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য মঞ্চসজ্জার নতুন রূপাচ্যতা নিয়ে আবির্ভাব হল শিশির কুমারের। তাঁকে বাংলা দেশের প্রথম প্রয়োগকার বলে স্বীকার করেছেন শম্ভু মিত্র। তিনি এও জানায় তার হাতেই বাংলা থিয়েটারে নাট্যাভিনয় প্রথম শ্রুতি ও দৃষ্টির সমন্বয় বিধান করতে সক্ষম হয়েছিল।

শিশির কুমারের পূর্বে মঞ্চসজ্জার নতুন ধারণা ছিল না তা নয়। প্রচেষ্টা ছিল বিক্ষিপ্ত। তাই শিশির কুমারের হাতে সেটা স্পষ্টরূপে ধারণ করে সেটা শম্ভু মিত্র জানান।

শিশির কুমারের ‘দিগ্বিজয়ী’ নাটকের মঞ্চসজ্জার কথা তিনি পাঠকদের কাছে প্রথম জানান। এই নাটকের মঞ্চসজ্জা এমন মুহূর্তমান ছিল যে, যা দেখে দর্শকরা খুব আশ্চর্য হয়ে ছিল। তখনকার দিনে সেটি ছিল একটা অকল্পনীয় ব্যাপার। বর্তমান দিনে ব্যবসায়িক মঞ্চে সাজসজ্জার যে রুচি প্রকাশ পায় তার তুলনায় সেটি অনেক ভালো ছিল।

‘দিগ্বিজয়ী’ নাটকের পাশাপাশি তিনি ‘জনা’, ‘বিসর্জন’ প্রভৃতি নাটকে দৃশ্য সজ্জার কথা শুনেছেন। ‘বিসর্জন’ নাটকের মন্দিরের যে দৃশ্যটা ছিল সেটা দর্শকদের মনকে উদ্বেলিত করে ছিল। শম্ভু মিত্রের সব নাটক দেখা সম্ভব হয়েছিল না। তিনি কিছু কিছু দেখেছেন আর কিছু নাট্য প্রেমীদের কাছ থেকে শুনে আমাদের মতো অজানা পাঠকদের জানিয়েছেন তাঁর মঞ্চসজ্জা সম্পর্কে।

বর্তমান লেখকরা শিশিরকুমারের মঞ্চসজ্জার উপকরণগুলি খোঁজার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তারা ফটো, স্কেচ কোন কিছুই পাননি। কারণ কিছুই নাকি রেখে দেওয়া হয়নি।

এই পরিবর্তনের পাশাপাশি একটা বড় রকম পরিবর্তনের টেউ এল সেটা শ্রীসেতু

সেনের হাত ধরে। তিনি আমেরিকা থেকে এদেশে এসে ঘূর্ণমঞ্চ তৈরী করেন এবং সেখানে ছিল তিন দেওয়াল দেওয়া Bor set এর ব্যবস্থা। এই পরিবর্তন ছিল বাংলা মঞ্চসজ্জার একদিনের ইতিহাস।

শিশির কুমারের একাই মঞ্চসজ্জার পরিকল্পনা করেননি। তাঁর সঙ্গে ছিল মণি গঙ্গোপাধ্যায় শ্রী চারু রায়, শ্রী অনাথ মৈত্র প্রমুখ।

বাংলাদেশে আমরা এটার পাশাপাশি আর একটা মঞ্চসজ্জা দেখতে পাই সেটা রবীন্দ্রনাট্যে রূপ প্রয়োগে। সেখানে বাস্তবতা অনুযায়ী কোনো মঞ্চসজ্জা হয়নি। নাটক অনুযায়ী প্রেক্ষাগৃহ ও মঞ্চকে সাজানো হয়েছে।

এই প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে শম্ভু মিত্র জানাতে চেয়েছেন আধুনিক মঞ্চসজ্জার দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হবে।

প্রথমত তিনি বলেন নির্দেশক কী সৃষ্টি করতে চাইছেন সেটা আগে জানতে হবে। যেমন কোনো দৃশ্যের অংশে দুটি চরিত্রের পাশাপাশি বসে কথা বলা, আবার কোথাও জনতার উত্তেজনা এই দৃশ্যগুলিকে তিনি বিভিন্ন কম্পোজিশনের মাধ্যমে রূপ দেন। আবার নাটকের পাত্র-পাত্রীকে সঠিক সময়ে মঞ্চে পাঠানো এবং কম্পোজিশন গুলো যেন এমন ভাবে সাজানো থাকে যাতে দর্শকদের এগুলো সাজানো মনে হয় এগুলি সঠিক ভাবে করানোই হল নির্দেশকের প্রধান দায়িত্ব।

শম্ভু মিত্র Marius Goring-এর নির্দেশক কয়েকজন ইংরেজি অভিনেতা, অভিনেত্রীর নাট্য অভিনীত শেকসপীয়রের নাটক 'As you like it' এর কিছুটা অভিনয় দেখেন সেটা দেখে তিনি মুগ্ধ হন। কারণ এখানে সামান্য নাড়াচড়ার কতকগুলি সুন্দর কম্পোজিশন ব্যবহার করেছিলেন সেগুলি চোখের তৃপ্তি ঘটানোর সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়ে অর্থময়তা সৃষ্টি করেছিল।

শম্ভু মিত্র এইভাবে অনেকের কথা বলেছেন। যেমন—

“Kaleidoscope এর মতো নির্দেশক বহু কম্পোজিশন ও বহু সঞ্চালন কল্পনা করেন। এবং সেই গুলো সহ অনুভূতির সঙ্গে অনুভব করে মঞ্চসজ্জার

পুরো ছবিটার একটা পরিকল্পনা করেন। এবং তখন আর একটা নতুন সৃষ্টি
ক্রিয়া শুরু হয়।”^১

পরিকল্পনাকার কে মঞ্চ সজ্জাটা এমন ভাবে তৈরী করতে হয় যাতে একই জায়গায়
এক সময়ে হাস্যোৎফুল্ল ঘটনা ঘটবে আবার সঙ্কটের সময় সেটাকে গভীর বলে মনে হবে। আবার
সেখানে নাটকের চলনের সময় বিভিন্ন রূপ দেখা যাবে। এতকিছু মাথায় রেখে পরিকল্পনাকারকে
সবকিছু প্রস্তুত করতে হয়।

শ্রীখালেদ চৌধুরী ‘রক্তকরবী’ ও ‘পুতুল খেলা’ নাটকের মঞ্চের মধ্যে একটা আশ্চর্য
রকম ভাব দেখা যায়। যবনিকা উঠলেই দর্শক দেখা মাত্রই তৃপ্ত হন। যিনি চিত্রকলা সম্পর্কে
জানেন তিনি দেখা মাত্রই সংকলনের ছন্দ দেখতে পান। যিনি এসব জানেন না তারও ভালো
লাগে কারণ সমতা আর ছন্দটা হল গভীর আকাঙ্ক্ষার বস্তু। সেটা মনকে কোনো ভাবে নাড়িয়ে
দেয়। কিন্তু চিত্রকলার কম্পোজিন ও মঞ্চসজ্জার কম্পোজিশন এক নয়।

এই ভিন্নতা দুটো জিনিসকে সঠিক ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায়। কারণ ছবিতে
মাত্রা মাত্র দুটো থাকে কিন্তু মঞ্চের ছবি ত্রি-মাত্রিক হয়। ছবির মতো মঞ্চ স্বাধীনতা কিছুতেই
সম্ভব হয় না। ছবিতে শিল্পীর ইচ্ছা অনুসারে ফ্রেম বদলাতে পারে। কিন্তু এখানে তা অসম্ভব।

মঞ্চ সজ্জার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল প্রসার ক্ষমতা। যেটা ছবিতে হয় না। ছবিতে
কম্পোজিশন এমন ভাবে বাঁধা থাকে যে একটু নাড়াচাড়া করলেই ছন্দ কেটে যাবে। শব্দ মিত্র
পাঠকদের জানান—

“ভালো পরিকল্পনাকারের হাতে ফাঁকা মঞ্চও যেমন সুছন্দ তেমনি একটি মাত্র
চরিত্রের সংস্থাপনেও তা সুছন্দ, দুটি চরিত্রেরও তাই এবং এমন কি বহু চরিত্রের
উপস্থিতিতেও তাই।”^২

তৎকালীন সময়ে শ্রীখালেদ চৌধুরী অসাধারণ মঞ্চ পরিকল্পনাকার ছিলেন। তাঁর মঞ্চসজ্জা
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শনীয় ও শিক্ষনীয় ছিল।

নাট্যাভিনয়ের একটি পরম প্রয়োজনীয় বস্তু হচ্ছে স্তর বৈচিত্র্য। ‘রক্তকরবী’ নাটকের মধ্যে যতগুলো স্তর আছে বাংলা আর কোনো নাটকে নেই। এই স্তর বৈচিত্র্য মানার জন্য মঞ্চে মধ্যে সেখানে সিঁড়ি বানালেই হবে না। নাটকের প্রয়োজনে ও ধরনটা মানতে হয়। ‘রক্তকরবী’ নাটকের মধ্যে যক্ষপুরীর যে সমাজ দেখা যায় সেটা জগদদল পাথরের মতো ভারী ও কঠিন। কিন্তু মঞ্চ সজ্জার মাধ্যমেই রেখার পরিকল্পনা করেন পরিকল্পনাকার।

তিনি আবার ‘পুতুল খেলা’ নাটকের স্তর বৈচিত্র্যের কথা বলেছেন। এই নাটকের ঘটনার স্থল ছিল মধ্যবিত্ত বাড়ির একটা ঘর। সেই অনুযায়ী জিনিসপত্র গুলো সাজানো ছিল।

শম্ভু মিত্র জানান, তিনি অভিনয়ের সময় ‘দেওয়ালকে পট’ হিসাবে ব্যবহার করতে চাননি। তিনি আরো জানান মঞ্চে যে সকল আসবাবপত্র বা সিঁড়ি ব্যবহার হয় সেগুলিও অভিনয়ে সাহায্য করে অভিনেতাদের। কিন্তু দেওয়ালের কোনো প্রয়োজন হয় না। তাই ‘পুতুল খেলা’ নাটকে দেখা যায় প্রয়োজন অনুযায়ী দরজা, জানালার ব্যবহার হয়েছে সেখানে দেওয়ালের দরকার নেই। শুধুমাত্র নাটকে যেগুলি প্রয়োজন সেগুলির ব্যবহার আছে।

এই নাটকের দৃশ্য পটগুলো কোনো সময় দর্শকদের সামনে সোজা লাইন পড়ে আবার কোনো সময় বাঁকা লাইনে চোখে পড়ে। এই নাটকের তৃতীয় অঙ্কের শেষের দিকে দেখা যায় সমস্ত লাইনগুলো দর্শকের অজান্তে বাইরের দরজার দিকে সকলের মনকে টেনে নিয়ে যায়।

প্রথম অঙ্কে অভিনয়ের সময় মঞ্চে পিছনের দিকে কালো পর্দার ব্যবহার করা হয়েছিল। কালো পর্দার ব্যবহার হলেও শম্ভু মিত্র জানিয়েছেন একটা বলমলে ভাব তাঁদের চোখে পড়েছে। দ্বিতীয় অঙ্কে পর্দার রং বদলে যায় এবং তার পাশাপাশি সামনের আস্তরণে পরিবর্তন আসে। ফলে দর্শকরা শঙ্কিত হয়ে ওঠে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে মঞ্চসজ্জার ক্ষেত্রে রং এর ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

এই যে মঞ্চে রেখা ও রং ব্যবহারের ব্যালেন্স সেটা বোঝানো কাউকে সম্ভব না। তবু শম্ভু মিত্র এই প্রবন্ধটির মধ্যে দিয়ে একজন লোক যা সৃষ্টি করেন তা নাট্য পিপাসুদের লক্ষ্য গোচরের চেপ্টা করেন।

এই প্রবন্ধ পড়ে, একজন কিশোর অভিনয় দেখতে গিয়ে যদি নাটকের মধ্যকার আর্ট লাইন, রেখা দেখেন তাহলে একটা মারাত্মক ঘটনা ঘটে যাবে।

তাইতো শম্ভু মিত্র পাঠকদের জানান, কেউ যদি কবিতা পড়তে গিয়ে কোথায় তৎসম শব্দ, কোথায় তদ্ভব শব্দ ব্যবহার হয়েছে সে সব খোঁজার চেষ্টা করেন তাহলে কাব্য যেমন অবহেলিত হয় তেমনি নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটে। নাট্যাভিনয়ের কোনো জিনিস আলাদা ভাবে দেখাবার নয়, যেখানে সমগ্র রূপটা দেখতে হয়। নইলে নাটকের আসল রস বস্তুটি হারিয়ে যায়। তাই তিনি সমগ্র পাঠকে বলতে চেয়েছেন নাটকের সমগ্র রূপ নিয়ে দেখতে ও বিচার করতে।

আমাদের আকাঙ্ক্ষা ও আমরা (১৯৫৮):

সব নাট্যকারের মধ্যে ভালো নাটক করার ইচ্ছা দেখা যায়। কিন্তু কিভাবে যে নাটক ভালো হবে সেটা কারোর জানা থাকে না। শম্ভু মিত্র জানান যে ভালো নাটক করার প্রস্তুতি নিলেও এবং ভালো নাটক পেলে সকলই অকূল পাথারে পড়ে যায়। কারণ ভালো নাটক পাওয়ার পর চলে আসে কিভাবে মঞ্চসজ্জা হবে, কিভাবে আলোর ব্যবহার হবে এবং কিভাবে সংলাপগুলো বলা হবে—এই সকল চিন্তা তাছাড়া নিজের নতুন নতুন ভাবনা চিন্তাগুলো কোথায় জুড়ে দেবে এই ভেবেও তারাও উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়েন। এই অকূল পাথারে সেই সময় তাঁদের পথ দেখিয়ে দেবার মতো কেউ থাকে না।

এই রকম পরিস্থিতি থেকে বেরানোর জন্য শম্ভু মিত্র বলেছেন, এমন একজন ব্যক্তির প্রয়োজন যিনি গুরুর মতো পথ দেখিয়েদেবেন। এবং কোনো জ্ঞানের দরকার নেই এবং কোনো ধ্যানের দরকার নেই এই রকম ইৎসাহ দেবেন। সকলের মধ্যে একটা positive ভাবনা ঢুকিয়ে দেবেন।

শম্ভু মিত্র এও জানিয়েছেন গুরুর মতো এসে কেউ এই ভার তুলে নেবেন এমন ব্যক্তি কেউ নেই, কারণ সকলে দিশাহারা হয়ে পথে খুঁজছেন। তাই শম্ভু মিত্র বলেছেন—

“বড়ো জোর বলতে পারি যে এই বিশেষ পথ কেন আমি ধরলুম, কেন মনে করলুম যে এই আমার সার্থকতায় পৌঁছতে পারবো। তাতে কারোর যদি উপকার হোল তো সেটা উপরি, না হলো তো নাচার।”^১

শঙ্খু মিত্র বলেছেন, নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত অনেক ব্যক্তির মধ্যেই অনেক সময় গুরু হওয়ার ইচ্ছাটা জাগে। যখন যে কোনো একটা নাটক ভালো করে মঞ্চস্থ করে ফেলে এবং অনেক প্রশংসা শুনে ভাবে—বুঝে গেছি কৌশলটা। তখন তার আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। পরে নাটক যদি সফল হয় তখন তার মনে হয় সফলতার মূলমন্ত্র নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে এনে ফেলেছে। আর তারপরে তার ভুল ভাঙার পালা শুরু হয়।

এই যে হঠাৎ করে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে যাওয়া এর মূল কারণ হল রিয়ালিটি বা বাস্তবতা। এখানের সকল কাজ কিন্তু রিয়ালিটি নিয়ে। এই ঘটনা শুধুমাত্র নাট্য পরিকল্পনাকারের সঙ্গে ঘটে না। নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত সকল মানুষের সঙ্গে এটা হয়ে থাকে। শুধুমাত্র এইটাই পার্থক্য বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ভাবে রিয়ালিটিকে বুঝতে চেষ্টাকরে। এর কারণ বলতে গিয়ে শঙ্খু মিত্র জানান—

“বাঁচার অর্থ কী, সুস্থ সামাজিকতার নীতি কী, এবং ব্যক্তিগত সার্থকতা কোন পথে, এসব প্রশ্ন প্রত্যেক মানুষকেই বিচলিত করে এবং এই উত্তর না পাওয়া গেলে অব্যবস্থিতচিত্ততায় মানুষ কষ্ট পায়।”^২

এই যে না পাওয়া যে এটা শুধুমাত্র অসাধারণ মানুষেরই নয়, সাধারণ মানুষেরও।

রিয়ালিটি প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল। শঙ্খু বলেছেন, এই রিয়ালিটি তাঁকে যেমন প্রভাবিত করেছে তিনিও তেমনি তাকে প্রভাবিত করেছেন। আমরা সবসময় সত্যকে নিয়ে মাতামাতি করি সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নয়, আপেক্ষিক সত্য জ্ঞানীরাও একথা বলেন। যখন অভিনয় হয় তখন দর্শকরা চাই অভিনেতাদের মুখটা স্পষ্ট করে দেখতে। নইলে দর্শকদের মধ্যে একটা অতৃপ্তি থেকে যায়। আবার এই অন্তরঙ্গতা সৃষ্টির পর এমন গভীর পরিবেশের সৃষ্টি হয়

যেখানে দর্শকের কল্পনা এমনভাবে মুক্তি পায় যেমন সমস্ত পরিবেশ বাম বাম করতে লাগে। এই রকমও ঘটে। অর্থাৎ কোনো কিছুই স্থায়ী নয় সর্বদা পরিবর্তিত হচ্ছে।

রিয়ালিটিকে বোঝবার তাগিদ দেখা যায় শিল্পের মধ্যে। যখন কোনো নাট্যভিনয় হয় তখন কোনো রকমভাবে গল্পটা বুঝিয়ে দিলেই কিন্তু বাস্তবতা ধরা পড়ে না। অভিনেতারা যখন প্রত্যেকটি চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে যে বিষয়ের গভীরে পৌঁছায় তখনই সেটা বাস্তবতা পায়।

শম্ভু মিত্র রিয়ালিটি কী সেটা বোঝাতে গিয়ে পাঠকদের সামনে একটা উদাহরণ দিয়েছেন। সেটি হল—

“আপনি মহলার জায়গায় বসে আছেন। সেখানে ফাঁকা ঘরে একটু পরে পরে দুজন লোক এসে বললে,—কেউ আসেনি এখনও? আপনি বললেন—না, এখনও আসেনি। তাতে দুজনেই বললে (আলাদা আলাদা ভাবে) যে আচ্ছা, আমি তাহলে একটু পরে আসছি।”^৩

এখানে দুজন ব্যক্তি একই কথা বললেও দুজনের চরিত্র কিন্তু আলাদা আলাদা, সেটা বলার ভঙ্গি র মধ্যে দিয়ে বোঝা যায়। একজন লাজুক, ভীতু এবং আর একজন উদ্বৃত্ত, চালিয়াৎ। এই উপরিভুক্ত ঘটনাটা একজনের যত সহজে অন্তরে লাগে অপার জনের ততটা লাগে না।

শম্ভু মিত্র বলতে চেয়েছেন, এই ভাবনাগুলি মনে মধ্যে আসার কারণ—দুজনে একই সংলাপ বললেও বলার ভঙ্গি, গলার আওয়াজ, চলে যাওয়ার ধরন আলাদা ছিল। এগুলোর মধ্যে কিন্তু কোনো রকম আধিক্য প্রকাশ পায়নি। তবু বোঝার কারণ হল, মনের ভাবটা চাল চলনের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। একটু ভেবে দেখলে সেটা সহজে বোঝা যায়। ভালো অভিনয়ে চরিত্রগুলো ঠিক এই মাত্রা নিয়ে আসে। তাদের অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে গভীর জটিল রিয়ালিটিটা যে প্রত্যেক মুহূর্তে দর্শকের সামনে ভেসে ওঠে। এবং দর্শকদের মনকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে।

কেনো একটা গল্পের তুচ্ছ বিষয় অনেক সময় বাস্তব হয়ে ওঠে। এর কারণ বলতে

গিয়ে শম্ভু মিত্র পাঠকদের জানান, অভিনেতা শুধুমাত্র অর্থ বজায় রেখে এবং অভিনয়ের সময় রক্ত সাংসের শরীর নিয়ে, নিজস্ব আওয়াজ নিয়ে উপস্থিত হয়। এর ফলে সেটা অন্যরকম হয়ে ওঠে। কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে রিয়ালিটির গভীরতায় পৌঁছানো যায় না।

শম্ভু মিত্র স্ট্যানিগ্যাভস্কির বইয়ে যে একটি উদাহরণ আছে সেটি তিনি তুলে ধরেন এই প্রবন্ধে। সেখানে আছে আচার্য তার ছাত্রদের সিগারেট মুখে নিয়ে মঞ্চে ঢুকে ছাই দানিটা খুঁজতে বলেন। প্রত্যেকেই এদিক-ওদিক খোঁজে। কিন্তু আচার্য হচ্ছে না বলে ঘাড় নাড়ায়, ছাত্ররা বুঝতে পারছেন না কোথায় ভুল হচ্ছে। তাঁদের মনে হচ্ছে—

“যে যা-করবার সবই তো করলুম, তবু হচ্ছে না কেন।”^৪

সেই সময় আচার্য একজন মঞ্চ কর্মীকে ডেকে এক থালা পেরেক নিয়ে মঞ্চের উপর দিয়ে যেতে বলেন যাওয়ার সময় অসাবধানে ছাত্রটিকে ধাক্কা মারে এবং পেরেকগুলো ছড়িয়ে পড়ে যেন সেটাও বলেছিলেন। এদিকে আচার্য প্রেক্ষাগৃহের মেঝেতে দাঁড়িয়ে কথার মধ্যে দিয়ে তাঁদের ব্যাপ্ত রাখলেন। এদিকে মঞ্চকর্মী মঞ্চে ঢুকে ধাক্কা লাগিয়ে পেরেকগুলো ছড়িয়ে ফেললেন। তখন ছাত্রটি লজ্জিত হয়ে পেরেকগুলো কুড়িয়ে দিতে লাগল। কুড়ানোর সময় এদিক ওদিক তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে দেখছে কোথায় পড়ে আছে কিনা। এই ঘটনাটা প্রেক্ষাগৃহের অন্য ছাত্রদের দেখান এবং এর মধ্যে দিয়ে যে সত্যটি ফুটে উঠেছে সেটা তিনি দেখান। পূর্বেরটা যে মেকি ছিল সেটাও বলেন। এই জীবন্তটা যে কী করে আসতে পারে তার ওপর স্ট্যানিগ্যাভস্কি লিখেছেন। শম্ভু মিত্র এ প্রসঙ্গে বলেন—

“এই জীবন্ততা প্রকাশ করতে পারলেই রিয়ালিটিকে ফোটানো যায়।”

শম্ভু মিত্রও বলেন প্রত্যেক অভিনেতারা যত গভীর ভাবে রিয়ালিটিকে প্রকাশ করতে পারবে দর্শকও তত বেশী তৃপ্তি পাবেন এবং ততোই জীবনবোধ বাড়বে।

শম্ভু মিত্র এই আলোচনার সঙ্গে একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়কে টেনে আলোচনা করেছেন। শম্ভু মিত্রের মনে হয়েছে ‘পুতুল খেলা’ নাটকটি দেখতে যে সব দর্শক আসে তাদের মনে হয়

ইবসেন নারীর প্রপ্যাগান্ডার জন্যই নাটক লিখেছে, সেই কারণ এই নাটকের শেষ অঙ্কে স্বামী, স্ত্রীর সম্পর্কে সুক্ষ্ম বিশ্লেষণ আছে। তাছাড়াও নাটকের মধ্যে সমাজের ব্যথিত্রস্ত মনোভাব ধরা পড়ে। এছাড়াও প্রথম অঙ্কে স্ত্রী তার স্বামীকে বলেছে মিথ্যা করে বলেছে তোমার যা খারাপ লাগে তা আমি কখনো করি? তখনই এর বহুমাত্রিক সত্যতা শব্দ মিত্রকে মুগ্ধ করে তিনি সেটা পাঠকদের কাছে জানান।

বার্নার্ড শ ‘Doll’s House’-এর অভিনয় দেখে যা লিখেছেন সেটা শব্দ মিত্র পাঠকদের কাছে তুলে ধরেছেন, সেটি হল—

“At last I am beginning to understand anti-Ibsenism. It must be that I am growing old and weak and sentimental and foolish, for I cannot stand up to reality as I did once. Eight years ago when Mr. Charnington, with A Doll’s House struck the decisive blow for Ibsen ... I rejoiced in it, and watched the ruin and havoc it made among the idols and temples of the idealists as a young war correspondent watches the bombardment of the unhealthy quarters of a city. But now I understand better what it means to the unhappy wretches who can conceive no other life as possible to them except the Doll’s House life ... it will be remarked that I no longer dwell on the awakening of the woman, which was once the central point of the controversy ... we no longer study an object lesson in lord of creationism, appealing to our sociological interest only. We see a fellow creature blindly wrecking his happiness and losing his ‘love life’ and are touched dramatically.”^৫

আলোচনার শেষে এসে শম্ভু মিত্র জানিয়েছেন, ভালো করে নাটক করব এই ইচ্ছা সকলের। কিন্তু এই ইচ্ছাটা কিভাবে পূরণ হবে কেউ ভাবে না। শুধুমাত্র একে অপরের দোষ ধরাতেই ব্যস্ত থাকে এবং পরস্পরের নামে কুৎসা করে বেড়ায় সকলের আশা, আকাঙ্ক্ষা এক হওয়া সত্ত্বে। তাই নাট্য ভারতীয় অবস্থা দেখে শম্ভু মিত্র জানান—

“এই আমাদের ঘাড়ে ভর করেই যা নাট্যভারতী নড়বড় করতে করতে চলেছে আর ভাবছে বোধ হয় ভাবছে যে মুখ খুবড়ে পড়ে যাবে কিনা।”^৬

এই প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে সকল নাট্যপ্রেমী মানুষদের জানাতে চেয়েছেন পরস্পরকে দোষ না দিয়ে সকলে যদি একত্রিত হতে পারে তাহলে ভালো করে ভালো নাটক করাটা অসম্ভব হবে না।

নবনাট্যের বিচার:

একাধারে নট, নাট্যকার, নাট্যপরিচালক ও প্রাবন্ধিক শম্ভু মিত্র তাঁর ‘নবনাট্যের বিচার’ নামক প্রবন্ধটি ১৯৬৩ সালে রচনা করেন। যা পরবর্তীতে ‘সম্মার্গ-সপর্যা’ প্রবন্ধগ্রন্থ সংকলিত হয়।

এই প্রবন্ধের শুরুতেই প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন যে, নবনাট্য আন্দোলন নিয়ে অনেকের মনে নানা সংশয় সৃষ্টি করেছে। কেউ কেউ নাকি আবার বলেছে, পুরো আন্দোলনটাই নাকি পথভ্রষ্ট হয়েছে। আবার অনেকের মতে নবনাট্য আন্দোলনের নামে অনেক যথেষ্টাচার চলছে, তাই এর নতুন করে মূল্যায়ন নিরূপন করা আবশ্যিক। শম্ভু মিত্র এখানে একটি সুন্দর উদাহরণ প্রয়োগ করেছেন। তিনি বলেছেন—

“বর্ষার জল আমাদের কাম্য। কিন্তু বর্ষা যখন আসে তখন সে তো কেবল আমাদের ইতস্তত রাখা কলসী, হাঁড়ি ও ধানের ক্ষেতের প্রয়োজন লক্ষ্য করে বর্ষিত হয় না, তার বর্ষণ তার নিজের আইনে—আমাদের পক্ষে তা নির্বিচার। তাই বিচার করতে হয় আমাদেরই। আর তাই, আজ যখন নাট্য সম্পর্কে

এতবড়ো একটা উৎসাহ এসেছে তখনই একটা বিচারেরও প্রয়োজন ঘটেছে, যাতে ময়লা বেনোজল আমাদের ভালো জলকে নষ্ট করে দিতে না পারে।”^১

প্রত্যেক ব্যক্তিই জানেন যে টাকা একটা শর্ত স্বীকৃত মাধ্যম। তাই টাকাকে তুচ্ছ করাটা যেমন ছেলেমানুষি। তাকে নিয়ে নাচানাচি করাটাও তেমনি আবার অপ্রকৃতস্থতার লক্ষণ। তবে একথা কেউ স্বীকার করবেন না যে, তাঁর নাট্য প্রয়াসের একমাত্র লক্ষণ হল কেবলমাত্র অর্থোপার্জন। আর একথাও স্বীকার করবেন না যে, তাঁদের নাটক দর্শকের আকর্ষণে অসমর্থ হলে বা Flop হলে নাট্যাভিনয়ের পন্থার মহত্ব সম্পর্কে তাঁরা নিঃসন্দেহ হন। ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে তর্ক উঠলেই সত্যবাক্যের পরিবর্তে আপ্তবাক্যই বেশি ব্যবহৃত হয়।

প্রাবন্ধিকের মতে, প্রতিটি নাট্য সংস্থাই চায় তাঁদের নাট্য প্রয়াস জনপ্রিয় হোক। কারণ জনপ্রিয়তাই হল ‘অর্থের সমার্থক’। আর সেই কারণেই নবনাট্য আন্দোলনের হাত ধরে জনপ্রিয়তা তথা অর্থোপার্জনের জন্য নাট্য প্রয়োজনা করেছেন আন্দোলনকারীরা। তিনি বলেছেন—

“যদি কেউ নবনাট্য সৃষ্টি করে তাকে জনপ্রিয় করে তুলতে পারে প্রশংসার কথা। কিন্তু সে নাট্য যদি নব না হয়? তাহলে ‘পুরানাট্য আন্দোলনকারী’ ব্যবসায়ী থিয়েটারের সঙ্গে তার তফাত কোথায়? কেবল জনপ্রিয় হয়ে ওঠবার কাড়াকাড়ি সেখানেও চলে। এখানেও চলবে?”^২

ফলে বোঝা উচিত যে, প্রত্যেক শিল্পীই চায় লোকপ্রিয় হতে। কিন্তু কেবলমাত্র প্রিয় হওয়াই যার উদ্দেশ্য থাকে তাকে বলা হয় ব্যবসায়ী। তবে মানুষের মহত্ব বা অসাধুতা বিচার করার কোনো মাপকাঠি না থাকায় বিচারের প্রয়োজনে আড়ালে কুৎসা প্রচার চলতেই থাকে। তাই প্রাবন্ধিক বিচারকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন—

“ভালোমানুষিকতার নামে নির্বিচার প্রশংসা বা সত্যবাদিতার নামে নির্বিচার নিন্দা না করে বিচারের একটা যুক্তি সঙ্গত ভিত্তি স্থাপন করাই মঙ্গলপ্রদ।”^৩

শম্ভু মিত্র জানিয়েছেন যে, আমাদের দেশে অভিনয় মঞ্চ গড়ে উঠেছে অনেকদিন আগে

থেকেই। আর এই মধ্যেই দীর্ঘদিন ধরে অভিনয় করে গেছেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শিশিরকুমার ভাদুড়ি প্রমুখ প্রখ্যাত শিল্পীরা। এই সমস্ত নাট্যমঞ্চই আমাদের ঐতিহ্যের ধারাকে বহন করে চলেছে। তাহলে গতানুগতিকার বাইরে এসে হঠাৎ করে কেন নবনাট্য আন্দোলনের দরকার হয়ে উঠল? শঙ্কু মিত্র এই প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিয়েছেন—

“যদি এই নবনাট্য প্রচেষ্টার প্রয়োজন থেকে থাকে, তাহলে আমাদের জাতীয় মঞ্চ কোথাও জাতিভ্রষ্ট হয়েছে, তাই জাতির আর একটা চেতনাকে স্পষ্ট করার জন্যই এই আন্দোলন শুরু হয়েছে।”⁸

আমাদের অভিনয় মঞ্চে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অভিনেতা অভিনেত্রীর আগমন ঘটলেও সে অর্থে তেমন প্রতিভাবান নাট্যকার আসেননি। প্রাবন্ধিক বলেছেন যে, যদি অভিনয় না হলেও কেবলমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদেই শেক্সপীয়রের নাটক, গ্যেটে, ইবসেনের লেখা তিনি পড়তেন। অথচ বাংলাদেশের বেশির ভাগ নাটকে এই গভীর অন্বেষণে সাহায্য করতে পারে না। বাংলার নাটকে রয়েছে সেন্টিমেন্ট, কান্না, ছেলে ভুলানো গল্প। নাট্যমঞ্চের রথের চাকাকে সচল রাখবার জন্য যে সমস্ত প্রমোদ উপকরণ প্রয়োজন তারই যথোচ্চ সত্তার রয়েছে। কিন্তু টলস্টয়ের ‘অন্ধকারের ক্ষমতা’, রবীন্দ্রনাথের ‘রাজা’ প্রভৃতির দিকে চোখ রেখে একথা স্বীকার করেছেন শঙ্কু মিত্র যে, তৎকালীন নাট্যকারদের নাটকে বুদ্ধির ভাগ কম বরং হৃদয়াবেগ বেশি। আর এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের নাটক জাতীয় মঞ্চে অঙ্গীকৃত হয়নি। এরপর জোড়াসাঁকোর প্রাঙ্গনেও এক নবনাট্য আন্দোলন শুরু হয়। যেখানে মঞ্চে বুদ্ধিকে প্রসারিত করার চেষ্টা শুরু হয়। প্রাবন্ধিক তথাকথিত বিচারকদের জোড়াসাঁকোর নবনাট্য আন্দোলনের সাথে বাইরের নবনাট্য আন্দোলনের যোগসূত্র খুঁজতে বলেছেন। এখন জাতীয় মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয়ের তালিকা প্রকাশ করে বোঝাবার চেষ্টা করা হয় যে, রবীন্দ্রনাথের সাথে ‘সাধারণ রঙ্গালয়ে’র সম্পর্ক গভীর। আর এখানেই প্রাবন্ধিক বিচারক না হয়ে একজন সাক্ষী হিসাবে বলেছেন—

“আমি সাধারণ রঙ্গালয়ে ‘চিরকুমার সভা’র অভিনয় দেখেছি। সেখানে দেখেছি শ্রীশ কিংবা বিপিন লাফিয়ে রসিকের কোলে চড়ে বসলে, চন্দ্রবাবু

রসগোল্লা খেয়ে আঙ্গুলগুলো আমূল চাটতে লাগলেন। আমার সেই অল্প বয়সেই এগুলো অত্যন্ত স্থূল ও ‘অ-রাবীন্দ্রিক’ বলে মনে হয়েছিলো। আমি কী করবো? আমি কেমন করে মনে করবো যে, সাধারণ রঙ্গালয় ও জোড়াসাঁকো—এই দুই স্রোত মিলেছিলো।”^৫

আর প্রাবন্ধিক একথা বিশ্বাস করতেন যে, রবীন্দ্রনাথ দর্শকদের মুখোমুখি হলে তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে তাঁর নাট্যরচনায় এমন কৌশল আনতেন, যার দ্বারা শ্রেয় ও প্রেয় মিলে গিয়ে বাংলা মঞ্চকে অনেক যুগের জন্য বাঁচিয়ে দিতে পারতেন। তবে তিনি আবার প্রশ্ন করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথের নাট্যচর্চায় জীবনের যে গভীরতা ও জটিলতা বোঝাবার চেষ্টা, তার সঙ্গে সাধারণ রঙ্গালয়ের যোগ কোথায়? এর মধ্যে প্রাবন্ধিক বিশেষভাবে শিশিরকুমারের নাম স্মরণ করে বলেছেন—

“তাঁর নাট্য প্রয়োজনায়, তাঁর অভিনয়ে তাঁর বাচনভঙ্গীতে, তাঁর উচ্চারণ আমি নিজে প্রথম বুদ্ধির দীপ্তি স্পষ্টত অনুভব করলুম। কথা যে কেবল সেন্টিমেন্টবাহী নয়। তাতে যে বুদ্ধির বিচিত্র রং বালমল করে। সেটা কেবলমাত্র তাঁর অভিনয়েই বুঝতে পারতুম।”^৬

শঙ্কু মিত্র জানিয়েছেন ‘জীবনরঙ্গ’ নাটকের প্রথম অঙ্কের শেষ নাট্য কেমন হবে তার বর্ণনা ছিল একটা চরিত্রের মুখে। আর এটি অভিনয় করতেন শিশির কুমার প্রাবন্ধিক শিশিরকুমারের এই অভিনয়টি উল্লেখ করেছেন এই প্রবন্ধে। নাটকে শিষ্য জিজ্ঞাসা করেছে নাট্যাচার্যকে যে, লোকেতো থিয়েটার দেখতে আসে আনন্দ পাবার জন্য। শিক্ষা গ্রহণের জন্য নয়। তাহলে আপনি শিক্ষা দেবেন কী করে? নাট্যাচার্য তাঁর উত্তরে বলেন যে, নাটককে শুরু করতে হবে কেতুনপুরের ভূনাগ রাজার রানীর মতো—ঘাঘরা দুলিয়ে, উড়না উড়িয়ে ও চোখের চাহনির চতুর হাসি হেসে। এরপর হঠাৎই নাটকের মধ্যভাগে আসে সঙ্কট। তখন—

“বিনা মেঘে বজ্রবের মতো

উঠবে বেজে কাড়ানাকাড়া,

জ্যোৎস্নাকাশে চমকে ওঠে শশী,
বনবানিয়ে ঝিকিয়ে ওঠে অসি,
সোনাই তখন দ্বারের কাছে বসি ।”^৭

আসলে শিশিরকুমারের উচ্চারণ সম্পর্কে ছিলেন রুচিবান। তাই তাঁর অভিনয় ভঙ্গী প্রাবন্ধিককে মুগ্ধ করে। আর সেই কারণেই প্রাবন্ধিক শম্ভু মিত্র বিচারকদের বিচার করতে বলেছেন—

“শিশির কুমারের নাট্যচিত্তার সঙ্গে কি নবনাট্য আন্দোলনের কোনো যোগ আছে, নাকি আজকের ব্যবসায়িক মঞ্চের সঙ্গে তার যোগ আছে?”^৮

প্রাবন্ধিক মনে করেন যে, বাংলাদেশের থিয়েটারকে বুঝতে হলে এর দুটি ধারাকে বুঝতে হবে। আর সেই দুটি ধারা হল—ব্যবসায়িক ধারা আর অপরটি হল নাট্যসংস্কৃতির ধারা। তবে তাঁরা হয়তো বাইরে নিজেদের অন্য নামে প্রকাশিত করেন। আর সেই কারণেই প্রাবন্ধিক বিচারকদের অনুরোধ করে বলেছেন যে, তাঁরা যেন জ্ঞানহীনের মতো এই দুটি ধারাকে গুলিয়ে না ফেলেন। কারণ প্রাবন্ধিকের মতে—

“বাংলায় একটা গ্রাম্য কথা আছে—‘চোর চায় গোলমাল’ এবং এরই সঙ্গে আর একটা কথা আছে—‘এলোমেলো করে দেখা, লুটে-পুটে খাই।’ এই গোলমাল বা এলোমেলো করে দেওয়ার কাজ যারা করেন তাঁরা ঐ চোরদেরই সাহায্য করেন। তাতে গঠনের কোনো সাহায্য হবে না। যে সমাজ সংপ্রচেষ্টা ও অপচেষ্টা উভয়কেই তুল্যমূল্যে জ্ঞান করে, সে সমাজ ভেঙ্গে যেতে বাধ্য, এটা তার মৃত্যুর পূর্বের ভীমরতি।”^৯

এরপর প্রাবন্ধিক বলেছেন, প্রতিটি মানুষের জন্মলগ্নেই তার নামকরণের মতো নবনাট্য আন্দোলনের নামকরণও কেউ তার জন্মক্ষণেই করেছেন। তবে কর্মের গুণই নিশ্চিত করবে এর নামকরণের সার্থকতা। আর এই সার্থকতা বিচারের জন্য যদি এই নবনাট্য আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে গভীর ভাবে ভাবা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে এর আসল কথা নবনাট্য নয়, বরং এর আসল কথা হল নাট্যসংস্কৃতি বা জাতীয় শিল্পকলা।

শম্ভু মিত্রের কথা অনুসারে বাংলার অনেক নাটকই জাতীয় সংস্কৃতিকে তার মধ্যে প্রতিফলিত করতে পারেনি। সেই কারণেই নাট্যসংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য প্রকৃত সাধকের প্রয়োজন। আর নবনাট্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যদি এই প্রচেষ্টা সফল না হয় তাহলে আবার হয়তো অন্য কোনো আন্দোলন অন্য কোনো নাম নিয়ে হাজির হবে। প্রাবন্ধিক এখানে সংশয় প্রকাশ করে বলেছেন যে, হয়তো এখানে অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন যে—

“সেই বুদ্ধিবাদী ইন্টেলেকচুয়াল থিয়েটারই কি আমাদের জাতীয় থিয়েটার?”^{১০}

তবে প্রাবন্ধিক এই প্রশ্নের উত্তর হিসাবে বলেছেন যে, বুদ্ধিবাদী নাটকে বুদ্ধিমানদের প্রতিফলিত করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের খোরাকটাও থাকা প্রয়োজন। আর এর দুইয়ের মিলনই জাতীয় রঙ্গমঞ্চকে প্রকাশ করবে। শম্ভু মিত্র এই প্রসঙ্গে ব্রেখ্ট্ এর একটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি উল্লেখ করেছেন—

“নাট্যাভিনয় যেন মানুষকে হৃদয়াবেগের প্রাবল্যে দুর্বল করে না দেয়, বরঞ্চ তার বুদ্ধিকে যেন আরো জাগ্রত করে, আরো শানিত করে।”^{১১}

তাই ব্রেখ্ট্‌এর রঙ্গমঞ্চ তাঁর নিজের দেশে জাতীয়মঞ্চের মতই সম্মান পায়। আর তিনিও বিদেশে আধুনিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যশ্রেষ্ঠা হিসাবে শ্রদ্ধা পান।

প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন যে, শিশিরকুমারের ‘তপতী’, ‘বিসর্জন’ না চললেও ‘রীতিমত নাটক’ বেশ চলেছিলো। তবে অনেক সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত দল রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয় করলেও তার বেশিরভাগই চলেনি। অনেক নাট্যদল আবার রবীন্দ্রনাথের নির্ধারিত নাটক বাদ দিয়ে অন্য নাটক অভিনয় করার অনুমতি প্রার্থনা করেছে সরকারের কাছে। অথচ এদের মধ্যে কয়েকদলের লঘুরসাত্মক নাট্যাভিনয় বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

শম্ভু মিত্রের মতে, আমাদের দেশ এক অন্ধকার যুগ থেকে বেরিয়ে আসায় অতীতের ঐতিহ্যের সঙ্গে বর্তমানের কোনো ধারাবাহিক বন্ধন নেই। মার্ক্সের এই অন্ধকার যুগ সে ধারাকে

ছিন্ন করে দিয়েছে। কিন্তু বাকি পৃথিবী থেমে থাকেনি, তারা এগিয়ে গেছে বেশ অনেকটা। আর তাই আমাদের যা কিছু করার তা খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে। যেমন সাধারণের বিরোধিতা থাকলেও বিবাহ বিচ্ছেদ আইন বা বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়েছে। তবে এই আইন পাশ হওয়ার পর খোদ কলকাতায় হিন্দু বিবাহের মাহাত্ম্য কীর্তন করেও নারীর একানুগত্যের দামামা বাজিয়ে নাটক অভিনীত হয়েছে। আর সবচেয়ে লজ্জার কথা হল এই অভিনয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দর্শকের করতালিতে সম্বর্ধিত হয়েছে। এর পরেও কিন্তু এই আইন পাশ হয়েছে। এদের চোখের ঠুনি সরাবার অপেক্ষা না করে। আর এইভাবেই প্রাবন্ধিক আশা করেন—

“সং নাট্য প্রচেষ্টাও কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রিয় হবার চেষ্টা না করে দেশের বুদ্ধি বৃত্তিকে জাগ্রত করার চেষ্টা করবে, যাতে আবেগ ও বুদ্ধিতে সম্মতি আসে, জীবনে বোধের গভীরতা আসে। যাতে আমাদের জাতীয় নাট্য সংস্কৃতি গৌরবান্বিত হয়।”^{১২}

আর এই প্রচেষ্টার ফলেই অনেক দর্শক ভিড় করে রবীন্দ্রনাথের জটিল নাটকের অভিনয় দেখতে আসে। তবে প্রাবন্ধিক মনে করেন, কোনো জাতির যখন সমৃদ্ধি ঘটে তখন তা ঘটে একেবারে এর গোড়া থেকে। তাই কেবলমাত্র ওপরের সংস্কার করলেই তাকে সঠিকভাবে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। আর এই গড়ে তোলার দায়িত্ব কোনো ব্যক্তিবিশেষের নয়, সবার। এর জন্য জনসংযোগের মাধ্যমগুলি, যেমন—রেডিও, সিনেমা, খবরের কাগজ, সভা—এদের সকলেরই চরিত্র সংশোধনের প্রয়োজন। যদি এরা মৌল মানবনীতি, ভদ্রতা ত্যাগ করে বুদ্ধির পথ এড়িয়ে কেবলমাত্র ছজুগ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করে বা মানুষের সামান্য প্রবৃত্তিগুলোকেই উত্তেজিত করার চেষ্টা করে তাহলে সং শিল্পীও সাহিত্যিকদের পথ আরো কঠিন হয়ে পড়ে। তাই প্রাবন্ধিক শঙ্কু মিত্র সমগ্র জাতীর উদ্দেশ্যে বলেছেন—

“নাট্যসংস্কৃতি যাতে আমাদের দেশের গৌরবের বস্তু হয় তার জন্য চেষ্টা করার দায়িত্ব অনেকের এবং অনেক প্রকারের। যদি আমরা জাতি হিসাবে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারি তবেই বাঁচবো নইলে কি জানি নইলে কি হবে!”^{১৩}

কিছু পুরনো কথা (১৯৬৩):

প্রবন্ধ লেখা শব্দ মিত্রের মূল কাজ না হলেও তিনি কিছু কিছু প্রবন্ধ রচনা করেছেন নাট্য কর্মের পরিপ্রেক্ষিতেই। ‘কিছু পুরনো কথা’ এই প্রবন্ধটির মধ্যে দিয়ে তিনি নাট্যাভিনয়ের সময় কিছু বিশেষ বিশেষ ঘটনা ঘটেছিল সেগুলো তুলে ধরেছিলেন।

এই প্রবন্ধটি শব্দ মিত্র শুরু করেছেন রঙমহলে অভিনীত কেদার রায় নাটক অভিনয়ের সময় একটি ঘটনা ঘটেছিল সেটা নিয়ে। কেদার রায় নাটকটি যখন অভিনয় হয়, কেদার চরিত্রে অভিনয় করেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী (সম্ভাব্য) কার্ভালো চরিত্রে অভিনয় করেছিল শ্রীভূমেন রায়। আর শ্রী ভূমেন রায়কে নিয়ে গল্পটা তৈরী হয় রঙমহলে।

কারাগারে বন্দী রাজাকে কার্ভালো উদ্ধার করতে যায়, চুপি চুপি। কথা বলতে বলতে সচকিত হয়ে ওঠে কার্ভালো। সে বুঝতে পারে কেউ টের পেয়েছে তখন সে রাজার হাত ধরে পালাতে শুরু করে আর তখনই মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়।

দর্শকদের মধ্যে থেকে একজন বলে ওঠে—‘দুসশালা’। সঙ্গে সঙ্গে অনেক দর্শকই হেসে ওঠে। কিন্তু শ্রীভূমেন কার্ভালো চরিত্রে এক তিলও হেলাফেলা অভিনয় করেনি।

কারাগারের বাইরে যখন বেরিয়ে আসে কার্ভালো রাজার হাত ধরে তখন মঞ্চে আলো জ্বলে ওঠে। কার্ভালোর পিছনে একজন সিপাহী অস্ত্র নিয়ে ছুটে এলে কার্ভালো হাতের পিস্তল তুলে গুলি করে এবং সিপাহীটা চিৎকার করে পড়ে গেলে ভূমেন বাবু বলে ওঠে—‘দুসশালা’। এক একজনকে মারা পর আনন্দ লাফাতে থাকেন আর বলতে থাকেন—‘দুসশালা, দুসশালা, দুসশালা’ সব কটা মারার পর ফুটলাইটসের সামনে গিয়ে দর্শকদের দিকে বলে ওঠেন—‘যো শালা বোলা হ্যায় উয়ো ভি শালা।’ তারপর স্টেজের পিছনে ছুটে গিয়ে রাজাকে নিয়ে নৌকায় ওঠে এবং মাঝিকে নৌকা বাইতে বলে। এই সময় দর্শকরা প্রচণ্ড হেসে ওঠে এবং প্রথমে যারা হেসেছিল তারাও হাতে তালি দিয়ে হেসে ওঠে।

শব্দ মিত্র জানিয়েছেন কেদার রায় সাহিত্যে যে ভাবে বিখ্যাত ছিল না। আর কার্ভালো চরিত্রটি অবাস্তব ভাবে সৃষ্টি। কার্ভালো ইউরোপ থেকে জলদস্যু হিসাবে আসে। এ দেশে এসে

বাঙালীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ভাঙা ভাঙা বাংলা, হিন্দী বলত। তাই এই চরিত্রে অভিনয়ের সময় ইংরাজি বলবে না হিন্দী বলবে এই সময়ে অনেকের মনে সন্দেহ ছিল। রডা অভিনয়ের সময় ভাদুরী মশায় চট্টগ্রামের ভাষা ব্যবহার করতেন কিন্তু ভূমেনবাবু করেন না, তিনি অভিনয়ের সময় দুর্দান্ত বেপরোয়া এমন শিশুসুলভ সারল্য প্রকাশ করতেন সেটা দেখে লোকে তাঁকে ভালোবেসে ফেলতেন। তাই শম্ভু মিত্র ভূমেন বাবু সম্পর্কে বলেছেন—

“এই ভূমেন বাবুকে আমি আরো অনেক চরিত্রে অভিনয় করতে দেখেছি কিন্তু সবসময়েই মনে হতো তিনি দুর্বল অভিনেতা, কিন্তু যখনই তিনি রডা বা কার্ভালো করতেন—বিশেষ করে কার্ভালো—তখন মনে হতো মঞ্চে অন্য সমস্ত অভিনেতাকে ছাড়িয়ে তাঁর ক্ষমতা যেন অনেক উঁচুতে।”^১

কেদার রায় নাটকে অভিনয় করেছিলেন শ্রী অহীন্দ্র চৌধুরী, শ্রী নরেশ মিত্র প্রমুখ বিখ্যাত অভিনেতারা।

ভূপেন রায়ের মতো ঐরকম অভিনেতা শম্ভু মিত্র আরো এক আধ জনকে দেখেছিলেন। তারকবালা হলেন সেই রকম একজন অভিনেতা। তাঁর পরিচয় তিনি পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। প্রতাপাদিত্যের কল্যাণীর অনুকরণে তৈরী একটি চরিত্রে। সেখানে দেখা যায় গৃহবধূকে কয়েকজন বলাৎকারের উদ্দেশ্যে আসে এবং বধূ আত্মরক্ষার জন্য গৃহদেবীর হাত থেকে খাঁড়া খুলে নিয়ে অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রচণ্ড ভাষণ দেন। তারপর দেবীর কাছে প্রার্থনা করলেন এবং উচ্চগ্রামে তাঁর আবেগ যখন তারার সপ্তকে ছুঁয়ে গেল তখন তিনি খাঁড়া হাতে নিয়ে দস্যুদের ডাক দেয়। তাঁর সেই উন্মাদিনী চণ্ডীমূর্তি শম্ভু মিত্রের চোখের সামনে ঘটে। তাঁর সেই মূর্তিটা দেখে খুব মুগ্ধ হন এবং সেটা তিনি পাঠকদের জানান। অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে তিনি একটি মেয়েকে একটি বিশেষ অবস্থায় প্রকাশ হতে দেখে হতবাক ও মুগ্ধ হন। তিনি আরো জানান যেন—

“নাটকের অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁকে দেখিনি। শ্রীমতী তারকবালা যেন নিজের সেই সত্তাকে কোথায় লুকিয়ে ফেলেছিলেন।”^২

এই নাটকটি খুব ভালো মানের লেখা নয় এবং অভিনয়ের মানও ছিল সস্তার। কিন্তু তারকবালার

এই চণ্ডীমূর্তি দর্শকদের পাশাপাশি শম্ভু মিত্রকেও যে হতবুদ্ধি করে দিয়েছিল সেটা তিনি এই প্রবন্ধের মধ্যে আমাদের জানিয়েছেন।

শম্ভু মিত্র নির্মলেন্দু লাহিড়ীর সিরাজ চরিত্রের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। সিরাজ তাঁর আমত্যদের কাছে কাতর ভাবে বলছে—

“এ বাংলা হিন্দুর না, এ বাংলা মুসলমানের না, মিলিত হিন্দু মুসলমানের মাতৃভূমি এই বাংলা।”^৩

এখানে নির্মলেন্দু বাবু এটা বলছেন আবৃত্তির মতো করে। সেখানে কোনো যুক্তি তর্ক বোঝানোর চেষ্টা তার মধ্যে দেখা যায় না। কিন্তু তাঁর আবৃত্তির পদ্ধতি শম্ভু মিত্রের বুদ্ধি মেনে নিতে না পারলেও তাঁর মাংস পেশী, স্নায়ুতন্ত্র যেন মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল এমনকি দর্শকদের মধ্যেও একটা শিহরণের সৃষ্টি করে দিয়েছিল।

শম্ভু মিত্র নির্মলেন্দু বাবু শিহরণ জাগানো অভিনয় দেখার পর বলেছেন—‘অভিনয়ে একটা শরীরগত দিক আছে।’ তিনি আরো জানিয়েছেন a dreualin ইনজেকশনে যেমন মানুষকে অকারণে সন্ত্রস্ত ও আক্রমনোন্মুখ করে তোলে। সেই রকম কিছু কিছু অভিনেতার একটা ঘটনার প্রকাশ ভঙ্গি মানুষ অনুপ্রাণিত করে তোলে। যেমন—দুর্গাদাস বাবুর অকস্মাৎ খাদের পর্দায় নেমে যাবার ক্ষমচতা এবং সেটা দর্শকদের শরীর ও মনের ওপর একটা প্রভাব ফেলত।

উপরিক্ত আলোচনাগুলিকে শম্ভু মিত্র বলেছেন দর্শক মাতানোর এক একটি নিদর্শন।

জীবনরঙ্গ নাটকের রিহার্সেলে ভাদুড়ীমশায় একদিন নায়ক চরিত্রে অভিনয় করে দেখেছিলেন। ঐ নাটকটির বিষয়বস্তু ছিল—মঞ্চ নাটক দেখতে চুকে নায়ক অভিনেত্রীর প্রেমে পড়েছে এই সন্দেহ করে নায়কের শিক্ষিত স্ত্রী। স্বামীকে শিক্ষা দেবার জন্য স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে চলে গেছে। নায়ক মদ খেয়ে অভিনেত্রীর বাড়িতে এসে তার মনের কথা বলে। এখানে শিশির কুমার ভাদুড়ী মশায় চরিত্রের বাইরে এসে এমন ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন সেটার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে তার (নায়কে) অপ্রকাশিত মনোগত ইচ্ছা। যেখানে তিনি অভিনেত্রীকে মায়ের মতো

আদর করে শিষ্যার মতো তার পায়ে প্রণত হয় আবার আহত পৌরুষকে চাঙ্গা করে দেয় এই সকলে রূপে তুলে ধরেন। মহর্ষি তাঁর অভিনয় দেখে খুব খুশী হয়েছেন এবং এর চেয়ে আর অন্য কোনো পদ্ধতি হতে পারে না সেটা বলেছেন।

শম্ভু মিত্র জানিয়েছে, তিনি ছোটো বেলা থেকে শুনেছেন ভালো অভিনয় করতে হলে চরিত্রের মধ্যে ঢুকে যেতে হয়। কিন্তু শিশির কুমার ভাদুড়ীর অভিনয় দেখে তাঁর সকল ধারণা বদলে যায় এবং তখন তিনি নতুন কিছু অনুভব করেছেন সেটা তিনি বলেন। কিন্তু সেই সময় কিছু মানুষের কাছে ব্রেখট্ সম্পর্কে কোনো রকম ধারণা ছিল না। তাই এটা একেবারেই ছিল নতুন।

মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ীর অভিনয় দেখে খুশি হয়েছিলেন কিন্তু জানিয়েছেন ছিলেন সবসময় ওটা করা যাবে না। যেখানে চরিত্রটা অভিনেতার চরিত্রের থেকে ওজনে কম সেখানেই করা যাবে। তাছাড়া যে চরিত্রের বিস্তার বেশী সেখানে নায়কের বীরত্বটাকে ধরে রাখতে হবে।

‘রত্নদীপ’ নাটকে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য দেওয়ান চরিত্রে অভিনয় করেন। সেখানে নায়ক জোচ্চর ভবেশ সেজে এসেছে। একথা যখন বুড়ো মানুষটি শোনে তখন যে কিছু বুঝতে পারে না। তারপর যখন বুঝতে পারে তখন সে তার জামাটা চেপে ধরে বলে—‘তোমাকে আমি পুলিশে দেব!’ এই যে একজন বুড়ো মানুষের কিছু বুঝতে না পারা এবং বোঝার পর তার যে স্বীকারোক্তি সবটাই মনকে নাড়িয়ে দেয়।

একজন সৎ প্রকৃতির মানুষ কিভাবে প্রতারণিত হচ্ছে এবং প্রতারণাকে ভালোবাসতে না পারা সবই মূর্ত্তি হয়ে ওঠে অভিনয়ের মধ্যে।

শম্ভু মিত্র উপরের এই সকল আলোচনার পর জানিয়েছেন, অভিনয়টা কোনো একটা বাধা নিয়মে চলে না। সেটা গল্পের বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। একজন অভিনেতার কাজ হল কোনো রকমভাবে দর্শকদের নাটকের গল্পটা, অবস্থাটা শুধুমাত্র বুঝিয়ে দেওয়া নয়, তার কাজ

অভিনয়ের মাধ্যমে চরিত্রের ব্যক্তিগত গল্পটা প্রকাশ করা তাতে অনেক গভীরতা আসে এবং সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। মহর্ষি ‘পথিক’ নাটকের রাজু চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। সেটি তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনয় ছিল এবং বর্তমানে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবময় কীর্তি হয়ে উঠেছে, তাহলে বুঝতে হবে অভিনেতার কাজটা নাটকের ক্ষেত্রে কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

শম্ভু মিত্র এই রকম আর একজন বিখ্যাত অভিনেতা শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরীরর একটি অভিনয় তুলে ধরেছেন। সেখানে দেখা যায়—যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ। নানারকম কষ্ট জীবনে তিনি সহ্য করেছেন। তিনি মেয়েকে দেখতে মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে যান পায়ে হেঁটে রোদের মধ্যে। সেখানে গিয়ে শুনলেন মেয়ে কিছু দিন খেতে পায়নি এবং অনেক দিন পর আজ ভাত খেতে বসেছিল, তার জামাইও কিছু দিন বাড়িতে ছিল না। বাড়িতে ফিরে রাগারাগি করে বৌ-এর হাত ধরে টান মারায় দুর্বল শরীর সে সহ্য না করতে পারায় ভাতের থালার ওপর পরে মারা যায়।

যোগেশ বাবু জামাইয়ের কাছ থেকে এই সব ঘটনা শুনে কিছুই বুঝতে পারলেন না। তবে এই যে বুঝতে না পারাটা সেটা ছিল অন্য রকম। এবং স্টেজের পিছনে মৃত মেয়ে কাছ গিয়ে বলেন—

“ভবানী! ভবানী! তোকে যে আমি নিয়ে যেতে এসেছিলুম মা।”^৪

তাঁর এই অভিনয় দর্শকের হৃদয়কে স্পর্শ করে ফেলেছিল। এমনকি দর্শকদের কাছ থেকে একটা চাপা কান্নার আওয়াজ শুনতে পেরেছিলেন।

যোগেশবাবু সামনে এগিয়ে এলে, তাঁর জামাই তাকে বলে—

“আপনি আমাকে পুলিশে দিন।”^৫

তিনি তখন বলেন, তিনি ওসবের মধ্যে জড়াতে চান না। কিন্তু সেই সময় তাঁর চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল পড়ে না এবং সে বলে, যে এই ঘটনাটা বাড়িতে গিয়ে বৌমাকে বলি। তাঁর কান্না দেখে হয়তো তার চোখে জল আসবে। এই বলে সে ধীর পায়ে বেরিয়ে যায়।

শম্ভু মিত্র জানিয়েছেন তাঁর অভিনয় দেখে তিনি ধন্য হয়ে গেছেন। সেই অভিনয় দেখে তিনি এতটা মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, সেই সময় তিনি আর একবার চাইছেন, আবার যেন উচ্চস্বরে হাসতেও চাইছেন। কারণ তাঁর মনে হয়েছে এরকম জিনিস দেখাটা একটা ভাগ্যের বিষয়।

শম্ভু মিত্র প্রবন্ধের শেষে দুঃখের সঙ্গে জানিয়েছেন, এই সকল অভিনেতারা খুব কষ্ট করে অভিনয় করেছেন। লোকে সঠিক দাম দেননি এমনকি তারা টাকা না থাকার কষ্টও পেয়েছে। তাঁরা যে কারোর পথ অনুসরণ করেননি সেটা সকলে জেনেও তাঁদের এখন পর্যন্ত কোনো যোগ্য মর্যদা কেউ দিতে পারেন না। তাইতো শম্ভু মিত্র বলেন—

“কী জানি, জীবনটি বোধহয় এমনি নিযুক্ত।”^৬

আমরা এই প্রবন্ধটি পড়ে বুঝতে পারি এই সকল ব্যক্তিগুলি শম্ভু মিত্রের জীবনে অনেকটা অবদান রেখে গেছেন এবং শম্ভু মিত্র সবসময় তাদের মনে করেন। তাছাড়া তিনি যে তাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন এবং ভালোবাসতেন এখানেই তা বোঝা যায়।

একটি আলোচনা (১৯৫৩ / ১৯৬৪):

শম্ভু মিত্র বলছেন আজকের দিনে আমাদের দেশে প্রচুর থিয়েটার গড়ে উঠেছে। তার পাশাপাশি প্রতি বছর বিভিন্ন মহাসমারোহে যাত্রা উৎসবও হচ্ছে। এরা পাশাপাশি নানারকম চাঞ্চল্যকর সৃষ্টি যেমন—মুকাভিনয়, পুতুল নাচ ইত্যাদি হচ্ছে। এই সৃষ্টিতে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন এবং অনুমান করে নিয়েছেন নাট্য শিল্পের একটা শুভ সময় এসেছে। এই কথা ভেবে তিনি বলেন—

“দেশের ধমনীতে একটা নাট্যপ্রেমের জোয়ার জেগেছে।”^১

—যে সকল নাট্যপ্রেমী মানুষ আছেন যাঁরা নাট্যসংস্কৃতির ভিত গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন সেই সকল ব্যক্তির দিশেহারা হয়ে পড়েন। তাঁদের মনে হয়েছে ‘নবনাট্য আন্দোলন’, ‘প্রগতিবাদীনাট্য’, ‘আধুনিক নাট্য’ এই সমস্ত কথাগুলোর মানে হারিয়ে যাচ্ছে। তাঁরা এই গুলোর জন্য কত আন্দোলন করেছেন, কিন্তু আজ ঐ গুলোর মূল্য হারিয়ে যাচ্ছে। পিছন ফিরে আর কেউ কিছু তাকিয়ে দেখছে না। এই ভেবে তাঁরা আক্ষেপ প্রকাশ করছে।

শম্ভু মিত্র বলেন যাত্রা থিয়েটার বায়স্কোপ থেকে শুরু করে প্যান্টোমাইন, গীতিনাট্য নৃত্যনাট্য সবই নাট্যবস্তু হলেও কিন্তু এদের সঙ্গে কোন মিল নেই। শুধুমাত্র শিল্পীরা অভিনয়ের সময় বেশভূষা পরে অঙ্গভঙ্গী করে ভাব প্রকাশ করে এটাই মিল। তাই শম্ভু মিত্র পাঠকদের প্রশ্ন করেন—

“তাহলে কি ধরে নেওয়া যাবে যে আমি ছাড়া অন্য আর একজন সাজার চেষ্টার মধ্যেই নাট্য বস্তুটি নিহিত আছে?”^২

শম্ভু মিত্র এই প্রবন্ধের মধ্যে কথকতার উল্লেখ করেছেন। এই কথকতার প্রচলন কিন্তু প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। তিনি অভিনয়ের ওপর যে কথকতার প্রভাব সেটা জানান। এই কথকতার সংলাপ বহুল বর্ণনার মধ্যে অনেকটা নাটকীয়তা থাকে। কথক শুধুমাত্র গানের বা পদ্যেরই সংলাপ বলেন না, তিনি গদ্যের সংলাপ কিংবা গীতিনাট্যের সংলাপকেও গানের রূপে প্রকাশ করেন। শম্ভু মিত্র বলেন কথকের এই যে নানা ভঙ্গীতে সংলাপ বলা, ঘটনার বর্ণনা দেওয়া, সংলাপ উচ্চারণ করে অভিনয় করা এটাকে তিনি নাট্যশিল্পের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

শম্ভু মিত্র নাট্যশিল্পের সংজ্ঞা দিয়েছেন—

“মানুষ বা মানুষের তৈরী পুতুল বা ছবি যদি লিখিত অক্ষরের দ্বারা বা উচ্চারিত শব্দের দ্বারা বা অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা এক বা একাধিক চরিত্রের ভাব প্রকাশ করে তাকে নাট্যশিল্প অভিহিত করা চলে।”^২

শম্ভু মিত্র প্রদত্ত নাট্যের সংজ্ঞা থেকে মনে হয় নাটকের মধ্যে অনেক সময় বিষয় বস্তু অনুসারে রেলগাড়ির দৃশ্য (‘সেতু’- নাটক) বা বলাবনের দৃশ্য (‘অঙ্গার-নাটক) দেখানো হয় সেটি কি নাট্যশিল্পের মধ্যে পড়ে না। আবার বলেন নাটকের মধ্যে যে আবহ সঙ্গীতের ব্যবহার হয় সেটি কি নাট্যশিল্পের অঙ্গ নয়। কারণ সঙ্গীত নিজেই তো একটা পৃথক শিল্প।

শম্ভু মিত্র বলেন এই সকল প্রশ্নে বার বার মাথাগুলিয়ে যাবে। তাই তিনি অন্যভাবে নাট্যশিল্পের নির্ণয়ের কথা ভাবেন। তিনি বলেন নব বধুর যখন আগমন হয় তখন তার

সাজপোশাক দেখে সহজেই চেনা যায়। তার স্বামী এই সকল পোশাক বা সজ্জাকে দেখে ভুল করে না। নববধূর এসব সজ্জা ছাড়াও যে সে নববধূ। ঠিক সেই রকম আলো, সঙ্গীত, দৃশ্যপট এসব নাটকে থাকতেও পারে। আবার অবস্থা বিশেষ নাও থাকতে পারে। ঠিক যেন গান্ধর্বে বিবাহ। আবার শম্ভু মিত্র বলেন এগুলোর গুরুত্ব না থাকলে নাট্যবস্তুটা কোথায়? আলো, দৃশ্য, মঞ্চ এগুলি বাদ দিতে দিতে এক সময় হয়তো অভিনেতারও বাদ পড়ে যাবে। তিনি এ প্রসঙ্গে একটা উদাহরণ দেন শেক্সপীয়রের। তিনি বলেন শেক্সপীয়রের নাটক পড়ে সকলে মুগ্ধ হন। কিন্তু সেটার মঞ্চস্থ করা সকলের কাছে অবাস্তব কারণ মঞ্চাভিনয় তো শেক্সপীয়রের অদ্ভুত শিল্পকীর্তির একটা আভরণ মাত্র। তাই শম্ভু মিত্র বলেন, তিনি শুনেছেন ভিন্ন লোক যখন ভিন্নভিন্ন চরিত্রে নিজ নিজ আবেগ নিয়ে অভিনয় করে সেটা নাকি সকলের বুঝতে সুবিধা হয়। আর এটাই নাকি মঞ্চ প্রযোজনার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা।

শম্ভু মিত্র বলেন ছোটো শিশুদের পড়ানোর সময় CAT-এর পাশে বিড়ালের ছবি আবার DOG-এর পাশে কুকুরের ছবি থাকে শেখানোর জন্য। এই নাট্যাভিনয়ও সেই পর্যায়ে পড়ে, যারা সাহিত্য পড়ে বুঝতে পারে না তাদের বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। আবার বলেন যদি বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য হয় তাহলে এটাকে কলাশিল্প বলা যাবে না?

এই আলোচনা থেকে শম্ভু মিত্রের মনে হয় যে নাট্যকলার মূল সত্তাটা কোথায়? তখন অনেকে বলেন নাটকের মধ্যে। এই প্রশ্ন নিয়ে নাট্যপ্রেমীদের কারোরই স্বচ্ছতা নেই। তার কারণে যুগান্তকারী নটদের অভিনয়ের সমালোচনা মজবুত নয়। তাই শম্ভু মিত্র বলেন—

“নাট্যের সমালোচনার বসে আলোচনা হয় প্রধানত নাটকের, নাটকের গল্পের, তারপর সবশেষে বলা হয় অভিনয় যথাযথ হইয়াছে।”^৪

এই আলোচনার মধ্যে শম্ভু মিত্র পুরানো দিনের একটা ঘটনা তুলে ধরেছেন। তাঁর ছেলেবেলায় তাঁর বাল্যবন্ধু তাঁর পাড়ায় একটা নাটক অভিনীত করেছিল। সেই নাটকে শম্ভু মিত্রও অভিনয় করেন। তাঁর বন্ধু অমর সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। এই নাটকে প্রথম দৃশ্যে

আছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ অমর সিংহ যুদ্ধ ক্ষেত্রে থেকে থেকে চাইছে না এবং পরের আমত্যদের বাণী শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যান।

বন্ধুটি তাদের বাড়িতে প্রত্যেকদিন আগত একজন কবিরাজ মশায়কে জিজ্ঞাসা করেন তাঁর অভিনয় কেমন লেগেছে—

“বৃদ্ধ কবিরাজ মশায় ক্রুদ্ধভাবে বলেছিলেন গোড়ার দিকে তুমি কী একেবারে যাচ্ছে তাই একটা করছিলে, একেবারে বিচ্ছিরি।”^৫

কারণ প্রথম দিকে অমর সিংহ যুদ্ধ না করে বিলাস ব্যসনে মত্ত ছিলেন। তাই প্রথম দিকে তার যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেতে ভালো লাগেনি। যুদ্ধের জন্য যখন প্রস্তুত হল তখন ঐ ঘটনাকে মোহভঙ্গ বলেছেন। তাই তিনি বলেন মোহভঙ্গের পর থেকে তার ভালো লাগে। এই সমস্ত মানুষগুলোকে শঙ্কু মিত্রের বন্ধুর বড়োদাদা ‘মোহ ভাঙার’ দলবলে ডাকতেন। শঙ্কু মিত্র বলেন এই সমাজে ‘মোহভাঙার’ দলের লোকের সংখ্যাই বেশী। তিনি বলেন কোনো অভিনেতা যদি কোনো দর্শকের মনের মতো কথা বলেন তাহলে তার অভিনয়টা ভালো হয়। শঙ্কু মিত্র আরো বলেন—

“ন্যায় শাস্ত্রানুযায়ী আমরা ঠিক করে নিই যে মূল নাট্যবস্তুটি কেবলমাত্র নাটকেই আছে এবং সেটা কে পড়ে আমরা যতোটুকু যেমন বুঝি সেই ততোটুকুই যদি কোনো অভিনেতা প্রকাশ করতে পারেন তাহলেই আমরা সেই অভিনেতাকে শিল্পী বলি।”^৬

শঙ্কু মিত্র বলেন তাহলে নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী শিশিরকুমার কে প্রথম শ্রেণীর নাট্যকার বলা যাবে না। কারণ তাঁর অভিনীত ‘সীতা’, ‘আলমগীর’ কোনোটিই বাংলা সাহিত্যে সম্মান পায়নি। কিন্তু সকলেই জানেন শিশির কুমার একজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী ছিলেন। তিনি এমন কিছু সৃষ্টি করতে পারতেন দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের নাটকে যেটার জন্যই তাকে শিল্পী পদবাচ্য করা হয়েছে এবং তাঁর সৃষ্টি ছিল অপূর্ব। একজন অভিনেতা তখনই প্রথম শ্রেণীর শিল্পী হয়ে ওঠে যখন সে সৃষ্টির মধ্যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আনে অর্থাৎ তাল কী হবে, লয় কী হবে, কোথায়

ম্যাড়মেড়ে ভাব থাকবে আবার কোথাও চমক ইত্যাদি। এই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকার জন্য সে শিল্পী হয়ে ওঠে, না হলে কারিগর হতেন।

শম্ভু মিত্র পাঠকের উদ্দেশ্যে জানান, যার মঞ্চ সম্পর্কে, অভিনয় পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকে না সে কখনো শ্রেষ্ঠ নাটক রচনা করতে পারবে না। আবার অভিনয়ের ক্ষেত্রেও এমনটাই আছে। একজন অভিনেতাকে সাহিত্যের পদ্ধতি জানতে হবে, নাটকের ইঙ্গিতগুলি ধরতে হবে তবেই তিনি শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হয়ে উঠবেন। আর শ্রেষ্ঠ অভিনেতার নাটকের লিখিত চরিত্রের মধ্যে নিজেকে ডুবে দিয়ে গভীরতম সত্যকে প্রকাশ করেন। শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের মর্মে কোনো চরিত্রটা কঠিন, কোনটা সহজ এই সকল প্রশ্ন আসে না, ফলেই তাদের সৃষ্টিও সার্থক হয় ও শিল্পী পদমর্যাদা পায়।

শম্ভু মিত্র জানান, ইংল্যান্ডে একসময় নাটককারের অভাব ঘটেছিল আর শেক্সপীয়র ছিলেন তাঁদের একমাত্র অবলম্বন। তাই সেখানকার অভিনেতার শেক্সপীয়রের ওপর নির্ভর করে নাট্যের মর্যাদা বজায় রেখেছিল। আবার এই সকল দিগ্বিজয়ী নাট্যকারকে আশ্রয় করে নতুন নতুন নাটককার নাটক রচনা করেছেন। যেমন—ফোর্বস রবার্টসনকে সামনে রেখে বার্নার্ড শ লিখেছেন তাঁর সীজার ও ক্লিওপেট্রা নাটক। কিন্তু যেটা লিখবে সেটা নাটক হওয়া প্রয়োজন। তাই শম্ভু মিত্র বলেন—

“বড়ো নাটককার অভিনয়ের সেই সুযোগই করে দেন বড়ো অভিনেতাদের জন্যে। তাই তাদের নাটক মহৎ নাটক।”^৭

শম্ভু মিত্র প্রাচীনকালের নাট্য সম্পর্কিত কিছু জিনিস তিনি পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। তিনি জানান প্রাচীন গ্রীক জুড়ে ট্রাজিক নাটকের কাব্যই ছিল প্রধান বস্তু। এবং সেখানকার নাট্যের প্রধান কাজ ছিল সেটাকে ভালো করে আবৃত্তি করতে পারা। আবার ইতালিতে একটা যুগ ছিল যেখানে নাটক বলে কিছু ছিল না। সেখানে প্লট হিসাবে থাকত একটা গল্প সংলাপ, যা কিছু জীবন্ত সৌষ্ঠব সমস্তই অভিনেতার মঞ্চের ওপর করত এবং সেগুলি ছিল তাঁদের নিজস্ব সৃষ্টি। এই সকল পুরাতন ইতিহাস ঘটার পর শম্ভু মিত্র জানিয়েছে—

“নাট্যকলার মূল কেন্দ্র হোল একটি অভিনয়ের আসর ও নটনটীদের আবেগ,
তাদের Passion।”^৮

তিনি এও জানান একথাগুলির মধ্যে দিয়ে তিনি কোনো নাট্যকারের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেননি।

শম্ভু মিত্র বলেন, নাট্যকারের লেখা নাট্য অভিনয় আসরে নতুন করে নাটক সৃষ্টি করে। আমাদের সকলের মধ্যে ধারণা আছে অভিনয়ের সময় নির্দেশকের নির্দেশ অনুযায়ী নাটকের সংলাপ যথার্থভাবে বলতে হয় যেখানে হাস্য দরকার সেখানে হাসতে, আবার যেখানে কাঁদার দরকার সেখানে কাঁদতে হয়। সেটা কিন্তু মোটেই না কারণ নির্দেশকের নির্দেশ অনুযায়ী যদি সংলাপ বলে চলে তাহলে শিল্প হয়ে ওঠে না, বরঞ্চ অভিনেতারা তাদের শিল্পসত্তাকে হারিয়ে ফেলে। তাই এই প্রসঙ্গে শম্ভু মিত্র বলেন—

“‘রক্তকরবী’ নাট্যে যে interpretation প্রকাশ পায় সেটা কেবলমাত্র পাঠে আসে না। তাই নাট্য প্রযোজনাটা এক্ষেত্রে অবান্তর নয়, বরঞ্চ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল।”^৯

তিনি বলেন যদি প্রত্যেক নাটকের মধ্যে interpretation থাকে তবেই নাট্যভিনয়কে কলাশিল্প হিসাবে স্বীকার করা যাবে।

শম্ভু মিত্র পাঠকদের রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের কথা বলেছেন। ইনারা দুজনেই গল্প লিখতেন। গ্রামকেই কেন্দ্র করে দুজনেই অনেক গল্প লিখেছেন কিন্তু দুজনের গল্পের বিষয় কোনো সময় একরকম নয়। রবীন্দ্রনাথের রচনায় বোষ্টমী আছে কিন্তু শরৎচন্দ্রে আবার সেটা নেই। আবার শরৎচন্দ্রের রাজকীয় কমলতা রবীন্দ্রনাথের নেই। এইগুলো হল শিল্পীর নিজস্ব সত্তা ও নিজস্ব গভীর উপলব্ধি। নাটকের ক্ষেত্রেও তাই। ভিন্ন ভিন্ন শিল্পী তাঁর ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থিত হয়। তার মধ্য দিয়েই তাঁদের নিজস্বতা প্রকাশ পায়।

আমরা যদি অতীতের দিকে তাকাই দেখতে পাব সেখানে নাট্যে প্রকরণরীতিটাই বড় ছিল। তখন কুৎসিত দেখতে গোঁফ ওয়ালা লোক মঞ্চে প্রবেশ করলে দর্শক বলতে পারত এটা বদমাইস। শম্ভু মিত্র জানান এই প্রথা শিল্পের জগৎ থেকে সরে গেছে।

শম্ভু মিত্র বলেন, নাট্য মধ্যে একটা স্রোত থাকে। উপন্যাসের চরিত্রের মতো তারা চলমান। এই স্রোতের মধ্যে থেকে সবকিছু বুঝে নিতে হয়। পৃথিবীতে আমরা যেমন চলতে চলতে অনুমান করে নিই আশপাশের মানুষজন, এটাও ঠিক তাই।

নাটকের ক্ষেত্রে স্বকীয়তা কী এটা বলতে গিয়ে শম্ভু মিত্র বলেন—

“সেটা তোমার আচরণ হবে, অভিনয় হবে না।”^{১০}

তিনি বলেন একটা কুকুরকে দিয়ে যখন অভিনয়ে দেখানো হয় তখন সে নির্দেশকের নির্দেশ মেনে অভিনয় করে না। বরঞ্চ নির্দেশ তার আচরণকে প্রয়োজন মতো কাজে লাগান। তাহলে এখানে কিন্তু কুকুরের কোনো অভিনয় হল না, সেখানে ধরা পড়ল তার আচরণ। শম্ভু মিত্র বলেন কোনো ব্যক্তি যদি আচরণ ছেড়ে অভিনয় করতে যান তাহলে তিনি মনন সম্পন্ন ব্যক্তি হবেন। এবং তার কাজ হবে অভিনয়ে চরিত্রের টীকাকার হওয়া। আর এখানে পশুদের সঙ্গে অভিনয়ের পার্থক্যটা ধরা পড়বে। এই টীকার মধ্যে নানারকম ছোটো ছোটো বিষয় আসে যা অভিনয়ের চরিত্রটিকে সম্পূর্ণ করে তোলে। শম্ভু মিত্র বলেন—

“এলিওনোরা দুসের অভিনয়ে এই রকম details লক্ষ্য করেছিলেন বার্নার্ড শ। বর্ণনা আছে তাঁর সমালোচনায়।”^{১১}

শম্ভু মিত্র বলেন, তিনি মনে করেন নাট্য অভিনয়শ্রী তাছাড়া এর সঙ্গে যা কিছু আছে জুড়ে আছে সেগুলিকে তিনি আভরণ বলেছেন। আবার তিনি বলেন নাটককার অনেক সময় যে ভাষায় নাটক রচনা করেন সেটা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। নাট্যের বিষয় কথার উপর নির্ভর করে না। এর মধ্যে মঞ্চের কিছু নিজস্বতা থাকে যেটা অভিনয়ের ওপর নির্ভর করে। তাই শম্ভু মিত্র বলেন—

“ভিত্তি যদি শুধু নাটককারের গল্প হোত তাহলে A Doll's House নাটকে গল্প শেষ হয়ে যাবার পর স্বামী স্ত্রী তর্ক শুরু হোত না, তাহলে ডিটেকটিভ নাটকই শ্রেষ্ঠ নাট্যগুণাঙ্ঘিত বলে ইতিহাসে সাদৃশ্য থাকতো।”^{১২}

নাট্যসংস্কৃতির উন্নতির কথা শম্ভু মিত্র ভাবেন। তিনি বলেন নাট্যসংস্কৃতির মধ্যে আধুনিক প্রচেষ্টা আনতে হবে এবং সেটা শুধুমাত্র সংলাপ মুখস্থ বলার ক্ষেত্রে নয়, আধুনিক মনকে নাট্যের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করে। আর এটা সম্ভব হলে ভালো নাটক লিখবার পথ খুলে যাবে। কিন্তু শম্ভু মিত্রের মনে প্রশ্ন থেকে যায়—আধুনিকতার যুগ কেমন করে অভিনয় করলে সেটার অভিনয় পদ্ধতি আধুনিক হবে, কিভাবে সেটাও নাট্য প্রচেষ্টার মধ্যে যুক্ত হবে? কারণ আগের দিনের অভিনয় ছিল অস্বাভাবিক কিন্তু আজ কেন অভিনয় রীতি হচ্ছে স্বাভাবিক।

শম্ভু মিত্র বলেন অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে গভীর মনোভাব, গভীর উপলব্ধি প্রকাশ পায়। তিনি বলেন অভিনয়টা—‘আপনি চায়ে ক চামচ চিনি খান—?’ এই মনোভাব প্রকাশের জন্য নয়। তিনি অভিনয়টাকে স্বাভাবিক ব্যাপার বলেননি বলেছেন এটি ভিতরের ব্যাপার এবং এর সঙ্গে আছে সত্য হয়ে ওঠার প্রয়োজনীয়তা। শম্ভু মিত্র বলেন—

“আধুনিক বা সং নাট্য প্রচেষ্টা নাট্যের ওপর নির্ভর করে না, করে নাটকের ওপর।”^{১৩}

তাই নাটক অভিনয়ে কোনো আধুনিকতা নেই। এর প্রকাশভঙ্গী ও কৌশল শিল্পের ক্ষেত্রে এক।

শম্ভু মিত্র বলেন অভিনয়টা বর্তমানের বিষয় সেটা ভবিষ্যতের নয়। কারণ দর্শকরা যতটা কল্পনা করতে পারবে অভিনেতা তাদের সামনে ততটুকু তুলে ধরে। শম্ভু মিত্র জীবনে দু-ধণের ট্রাজেডি বিশেষ ভাবে জানতেন একজন হল শ্রীযোগেশ চৌধুরী আর অপরজন মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। কারণ এদের অভিনয়টা ছিল অন্যরকম। এঁরা বুদ্ধি ও হৃদয়ের অপূর্ব মিলন ঘটাতেন। কিন্তু সেই সময় এঁরা দুজন মানুষের কাছে যথেষ্ট সম্মান পাননি। কারণ শিল্পী হিসাবে তাঁরা আলাদা ছিলেন। কারণ সেই ভিন্নতার জন্য অনেক মানুষ তাদের অনেক সময় বুঝতে পারেনি। যদি বুঝতেন তাহলে তাঁরা পপুলার হয়ে উঠতেন। শম্ভু মিত্র তাঁদের শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেন এবং তাঁদের সম্মান জ্ঞাপন করেন বলেন—

“তাঁদের সমস্ত কষ্টই ব্যর্থ হবে যদি আমরা আজ গালভরা কথার আড়ালে লুকিয়ে নিজেদের কাজটাকে ভালো করে না বুঝি।”^{১৪}

তিনি তাঁদের নিয়ে আরো বলেন, যদি আমরা তাদের স্মরণ করি তাঁহলে সেই সময়ের মতো আমরা বঞ্চিত হব না।

আলোচনার শেষ বলা যায় শম্ভু মিত্র এই প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে পাঠকের নাটকের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো জানিয়ে দিয়েছেন। এমনকি অভিনয় বিষয় কেমন হবে, দর্শক কোনটা গ্রহণ করবে সেটা সহজে বলেছে। পরবর্তী নাট্য প্রেমীদের কথা ভেবে।

ইয়োকাস্তে:

প্রাবন্ধিক শম্ভু মিত্র সফোক্লেসের ‘রাজা অয়দিপাউস’-এর ইয়োকাস্তে চরিত্র নিয়ে ১৯৬৪ সালে ‘ইয়োকাস্তে’ প্রবন্ধটি রচনা করেন। যা পরবর্তীতে তাঁর প্রবন্ধ সংকলন ‘সম্মার্গ-সপার্যা’ গ্রন্থে স্থান পায়।

প্রবন্ধের শুরুতেই প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন যে, সফোক্লেসের নাটক অনুবাদ করতে গিয়েই তাঁদের ইয়োকাস্তে চরিত্র ও রাজা অয়দিপাউসের সাথে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে নানা প্রশ্ন জেগে উঠেছিল। বিশেষত নাটকটির মহলা দেবার সময় এসব প্রশ্ন বেশি করে উঠত। এই নাটকের একটি দৃশ্য রয়েছে শক্তিত অয়দিপাউস রানীকে জিজ্ঞাসা করেন যে, লাইয়েসের বয়স কত ছিলো আর সে কেমন দেখতে ছিলো। এই প্রশ্নের উত্তরে ইয়োকাস্তে বলে—

“দৈর্ঘ্যে সে তোমারই মতো ছিলো।—দেখতে অনেকটা তোমারই মতো।”^১

এই কথাটা কেমনভাবে বলা হবে তা নিয়ে প্রাবন্ধিকদের মধ্যে নানা সংশয় দেখা দেয়। একটা সংবাদ দেওয়ার মতো করে রানী এই কথা বলবে? নাকি অয়দিপাউসের সাথে লাইয়েসের সাদৃশ্য তিনি লক্ষ্য করেছেন এমন ভঙ্গীতে বলবেন? তবে এই সাদৃশ্য লক্ষ্য করে থাকলে তিনি আগে কোনোদিন এ কথা বলেননি। হয়তো এর কারণ প্রথম স্বামীর প্রতি তাঁর গভীর প্রেমের কারণেই নতুন স্বামীকে তারই মতো দেখতে হওয়ায় অয়দিপাউসকে তিনি ভালোবাসতে পেরেছিলেন। তবে নাটকে দেখা যায় অয়দিপাউস লাইয়েস সম্পর্কে আগে কোনো কিছুই জানতেন না। এমনকি লাইয়েসের মৃত্যু সংবাদ নিয়ে যে ব্যক্তি এসেছিল সে আসলে ঠিক কী সংবাদ দিয়ে গেল তাও

অয়দিপাউস জানতেন না। এখানেই প্রাবন্ধিকের প্রশ্ন হল—

“তাহলে কি রানী এই সাদৃশ্যের কথাটা গোপন করে গিয়েছিলো? কেন গোপন করে গিয়েছিল? অয়দিপাউসের হিংসা হবে বলে?”^২

অথচ দেখা যায় অয়দিপাউস প্রাজ্ঞ নায়কদের সামনে বলেন যে, তিনি লাইসের প্রতি তাঁর দায় পিতৃস্থানীয়ের প্রতি দায়ের মতো পালন করবেন। আর তাঁর এই বক্তব্যের কোথাও ঈর্ষার সামান্যতম ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না। আর এই কারণেই শঙ্কু মিত্রের মনে হয়েছে যে, অয়দিপাউস চরিত্রে কোনো হিংসা না থাকলেও রাণী ভুল বুঝে অর্থাৎ রাজার চরিত্রে হিংসা বর্তমান এই অনুমান করে রাজা অয়দিপাউসের কাছে লাইসের সমস্ত বর্ণনা গোপন করেছেন আর এখানেও প্রাবন্ধিক প্রশ্ন করেছেন যে—

“তা যদি হয় তাহলে আমাদের একথাও ভাবতে হবে যে এই ভুল রানী করলো কেন। তার কি অন্য পুরুষদের দেখে অর্থাৎ যে পুরুষকে সে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছে সেই লাইসকে দেখে প্রতীতি জন্মেছিলো যে, পুরুষেরা এসব ব্যাপারে স্বভাবতই ঈর্ষাপরায়ণ? সুতরাং তাদের সামনে অন্য পুরুষ সম্পর্কে আলোচনা না করাই ভালো?”^৩

প্রাবন্ধিক শঙ্কু মিত্র জানিয়েছেন মহলা দেবার সময় তৃপ্তি মিত্র এমনভাবে কথাটি বলেছিলেন, যাতে মনে হল যেন হঠাৎই এই মুহূর্তেই ইয়োকাস্তে সাদৃশ্যটি প্রত্যক্ষ করলেন। এর জন্য আবার একজন বলেন এমনভাবে বলা ঠিক কিনা? কারণ ইয়োকাস্তে অনেক দিন ধরেই অয়দিপাউসকে দেখে ফলে হঠাৎই এই সাদৃশ্য লক্ষ্য করা সম্ভব নয়। আর এসব প্রশ্নও তার অবসম্ভাবি সব উত্তরের সাহায্যেই ইয়োকাস্তের একটি চেহারা যেন ক্রমশ প্রাবন্ধিকদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে। প্রাবন্ধিকর বুঝতে পারেন যে, অয়দিপাউস যখন প্রথম এ রাজ্যে আসেন তখন ইয়োকাস্তে বিবাহযোগ্য নারী। যদি তা না হতো তাহলে ইয়োকাস্তের পুনর্বার বিবাহের প্রসঙ্গ উঠত না। অর্থাৎ অয়দিপাউস তাঁর মায়ের অর্থাৎ ইয়োকাস্তের প্রথম বয়সের সন্তান। আর অয়দিপাউসের লাইসকে ‘বৃদ্ধ’ বলে সম্বোধন করায় বোঝা যায় যে রাজা লাইস ইয়োকাস্তের

থেকে বয়সে অনেকটাই বড়ো ছিলেন অর্থাৎ ইয়োকাস্তে ও তাঁর প্রথম স্বামী লাইয়েসের বয়সের পার্থক্য ছিল বেশ খানিকটা।

এই নাটকের যে পুরোনো কাহিনিটি শম্ভু মিত্র জানিয়েছেন, তা হলো—রাজা লাইয়স একজনের প্রতি অন্যায় করায় সে অভিশপ্ত হয়। এরপর দৈবজ্ঞদের কাছে তাঁর সেই অভিশাপের কথা জানতে পেরে নিজ প্রাণ রক্ষার জন্য আপন সম্মানকে হত্যার জন্য ভৃত্যের হাতে তুলে দেয়। তবে এই সম্মান ছিল ইয়োকাস্তের অল্প বয়সের প্রথম সম্মান। তাই স্বামীর নির্দেশে হাসি মুখে শিশুকে হত্যার জন্য তুলে না দিলেও কাঁদতেও পারেননি তিনি। আবার নতুন মাতৃহ্ব হয়তো এই শোক ভোলাতে পারত। কিন্তু রাজা লাইয়স তাঁর নিজের প্রাণের ভয়ে ইয়োকাস্তেকে পুনরায় গর্ভ ধারণের সুযোগ দেননি। যুবতী ইয়োকাস্তের দেহজ কামনা-বাসনা তিনি কোনোদিন পূরণ করেননি। এমনকি প্রাণভারে ভালোবাসার মতো কোনো আধার কখনো তিনি ইয়োকাস্তেকে দেননি। অথচ ইয়োকাস্তে নিজস্ব ক্ষুধা মেটানোর জন্য অন্য পুরুষের কাছে প্রার্থী হওয়ার মতো মেয়েও তিনি নন। ফলে তিনি নিজ যৌবনের সকল ইচ্ছাকে অবদমিত করে সকলের প্রতি তাঁর সকল কর্তব্য পালন করে গেলেও তিনি স্বামীর স্বার্থপরতা ও দুরতা লক্ষ্য করে ঘৃণায় তাঁকে এড়িয়ে থেকেছেন।

তাই স্বামীর বেঁচে থাকাকালীন যে নারী বৈধব্য জীবন ভোগ করেন তাঁর কাছে স্বামীর মৃত্যু সংবাদে কিছু এসে যায় না। ফলে রাজ্যের প্রয়োজনে এবং নিজ কর্তব্য মনে করে পুনর্বীর বিবাহে তিনি প্রস্তুত হন। কিন্তু যার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয় তিনি অন্য প্রকৃতির মানুষ। স্বার্থপর নয়, বরং বীরের মতোই বুক ভরে ভালোবাসতে জানে। সুতরাং ইয়োকাস্তে এই “তীক্ষ্ণবুদ্ধি দামাল” স্বামীর হাতে নিজেকে সঁপে দেন। তখন তাঁর অতীতকে একটি দুঃস্বপ্ন বলে মনে হয়। তাই লাইয়সকে তিনি মনেও আনতে চান না। ফলে প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে যখন রাজা অয়দিপাউস ইয়োকাস্তেকে জিজ্ঞেস করেন যে, লাইয়স কেমন দেখতে ছিলেন তখনই তিনি এতোদিন পরে প্রথম স্পষ্ট করে সেই লাইয়সকে স্মরণ করার চেষ্টা করলেন। আর এতগুলো দিনের ব্যবধানে ও নিজের জীবনের পরিপূর্ণতার ফলে লাইয়সের প্রতি তাঁর আর কোনো ঘৃণা বা বিতৃষ্ণা না

থাকায় বৃদ্ধ ও স্বার্থপর লাইয়সের পরিবর্তে বিবাহের আসরে প্রথম দেখা লাইয়সের চেহারাটাই তাঁর মনে পড়ায় তিনি হঠাৎই লক্ষ্য করেন যে রাজা লাইয়স অয়দিপাউসের মতোই দেখতে ছিলেন এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে তৃপ্তি মিত্রের বলার ভঙ্গীই সঠিক ছিলো।

এরপরেও ইয়োকাস্তে চরিত্র সম্পর্কে প্রাবন্ধিক শঙ্কু মিত্রের মনে হয়েছে ইয়োকাস্তে কেবল পরিপূর্ণ নারীত্বের প্রতিমূর্তি নয় বরং তাঁর ভেতরেও কোথাও যেন লুকিয়ে রয়েছে অশান্তির সুপ্ত আগুন। ফলে এটা নিয়ে প্রাবন্ধিকরা আলোচনা করলেন। আর এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট হল যে, এত সুখের মাঝেও ইয়োকাস্তের মনে রয়ে গেছে ভয়। তাঁর প্রথম সন্তানের এমন অহেতুক নির্মম মৃত্যুই তাঁকে এমন আতঙ্কিত করে রেখেছে। ভাগ্যের নিষ্ঠুর হাত একদিন যেমন তাঁর শিশুকে কেড়ে নিয়েছে তেমনভাবে তাঁর জীবন থেকে পুনরায় সুখ কেড়ে নেবে না তো তাই তিনি ভাগ্যকে ভয় করেন। শঙ্কু মিত্র বলেছেন—

“তাছাড়া কখনো কি সে এক এক দিন রাত্রে নিজের ভাগ্যের কাছে কেঁদে বলেনি যে, এমন স্বামীই যদি তুমি আমাকে দিলে তাহলে আরো আগে দিলে না কেন? আমার বয়স থাকতে দিলে না কেন?”^৪

নাটকের শেষের দিকে এটাই প্রকাশ পায়। ইয়োকাস্তে উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠেন—

“ভয়? মানুষ কতো ভয় করবে অয়দিপাউস? কতো? আমাদের জীবনতো কতকগুলো আকস্মিকের খেলা। কতো বিভিন্ন রকমের আকস্মিক ঘটনারই যেন আমরা হাতের পুতুল। তাই কী করবে মানুষ? যতোটুকু সে পারবে ততোটুকু সে নিজের যেমন ইচ্ছে তেমনি করেই বাঁচবে। কোনো কিছুকে গ্রাহ্য না করেই বাঁচবে।”^৫

প্রাবন্ধিক মনে করেন ইয়োকাস্তের মনে কোনো বিশ্বাস ছিল না। তাই ভাগ্যের হাতে বলি হওয়ার আগে যতোটুকু সম্ভব ততোটুকুই পাগলের মতো বাঁচতে চেয়েছিলেন। এই ইয়োকাস্তের কাছে যখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, অয়দিপাউস তাঁরই সন্তান তখন সে পাগলের মতো

বাঁধা দিতে গিয়ে, তাঁকে ছুঁতে গিয়ে থমকে যায়। সে স্বামীকে না সন্তানকে স্পর্শ করছে? এই সময়টুকুতেই ইয়োকাস্তের জীবনের যে প্রচল্ড নাটকীয়তা প্রকাশ পায় তার অভিনয়ের সুযোগ যেন ধারণাতীত। এরপর যখন ইয়োকাস্তে দুই হাত দিয়ে অয়দিপাউসের মুখটা ধরে তখন তিনি শেষপর্যন্ত মা-তেই পরিণত হন। আর সেই স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে যেন তিনি নিজ মৃত্যুদণ্ড অপরিহার্য বলে ঘোষণা করেন।

একটি অন্বেষণে:

দ্রুত পরিবর্তমান সময়ের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে কিছু জিনিস পিছনে পড়ে যায়। আবার কিছু এমন দ্রুত ঘটে যায় যে অন্বেষণের সময় পাওয়া যায় না। আমরা যদি ভারতীয় নাট্যকলার দিকে তাকাই তাহলে দেখব সমাজের কেন্দ্র খোঁজার মধ্যে দিয়ে ভারতীয় নাট্যকলার ভিত্তি বোঝার চেষ্টা চলে আসছে। ১৯৬৫ সালে লেখা ‘একটি অন্বেষণে’ তার ছাপ দেখা যায়।

শম্ভু মিত্র জানিয়েছে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে ভারতীয়রা জাতি হিসাবে নিজেদের সত্ত্বাকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। জগতে পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগুলি আমাদের ভারতীয় বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে পারে কিন্তু আমাদের আধুনিক পরিচয় সম্পর্কে আমরা সকলেই অবগত নয়।

প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস ছিল খুব গৌরবময়। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা আর প্রাচীন ঐতিহ্যে ফিরে যেতে পারব না। তাইতো শম্ভু মিত্র বলেছেন আমরা ইংল্যান্ডের যন্ত্রশিল্পের অনুকরণে করে বিস্মৃত হচ্ছি বলে কি আমাদের আচার, ব্যবহার, সংস্কৃতি সবক্ষেত্রেই নকল করতে হবে? তিনি এও বলেছেন এ সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ তৈরী হয়ে সেটার প্রমাণ থাকবে ইতিহাস।

শম্ভু মিত্র জানিয়েছেন শিল্পকর্মের বিশেষ করে নাট্যশিল্পের প্রত্যেকটি স্তরে প্রচুর পরিশ্রমের প্রয়োজন। না হলে সেটা স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে গড়ে ওঠে না। পশ্চিমের দেশের অভিনয়ের মধ্যে বাস্তবতার ছোঁয়া দেখা যায়। শম্ভু মিত্র জানিয়েছেন, তিনি নাকি শুনেছেন সেখানে অভিনেতা আর অভিনয়ে চরিত্রকে এক বলে মনে করা হয়। আর সেটাই তাদের কাছে অভিনয় শিল্পের চরম।

শম্ভু মিত্র বলেছেন তিনি অনেক বিশিষ্ট অভিনেতাদের অভিনয় প্রতিভার কথা পড়েছেন, শুনেছেন, এমনকি তাঁদের সম্পর্কে অনেক বড় বক্তৃতা দিয়েছেন। কিন্তু প্রত্যেকটা অভিনেতাকে তাঁদের অভিনয়ে চরিত্র থেকে সর্বদা দূরে থাকতে হয়। আর দূরে থাকতে না পারাটা নাকি দুর্বলতার মধ্যে পড়ে। এটিই হল আধুনিক ইন্টেলেকচুয়াল বলে।

শম্ভু মিত্র বলেছেন, তিনি ‘আসল আর্ট’ কি এটা নিয়ে ভীষণ দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে গিয়েছেন। কারণ তিনি ‘জীবনের চেয়ে বড়ো’ তত্ত্বের অভিনয় মুগ্ধ হতে চাইছিলেন সেই মুহূর্তে আবার ‘সাবডিউড অ্যাকটিং’ এর বক্তৃতা শুনে দিশেহারা হয়ে পড়ছেন। আর তখনই তার মনে প্রশ্ন আসে ‘আসল আর্ট’ নিয়ে। আর সেটাই তিনি পাঠকের কাছে বলেন।

ভারতবর্ষের মানুষ হীনমন্যতায় ভোগে। নিজেদের ভালো লাগা খারাপ লাগাটা বোঝার জন্য পশ্চিম থেকে খবর নেবার চেষ্টা করে। তাই শম্ভু মিত্র বলেছেন, যদি আমরা হীনমন্যতাকে পেরিয়ে যেতে পারি তাহলে নিজেদের পরিচয় সহজে খুঁজে আনা সম্ভব হবে। তখন আর ঠিক ভুল বিচারের জন্য অন্যের ওপর নির্ভর করতে হবে না।

প্রাচীন গ্রীসীয় সভ্যতার সঙ্গে ভারতবর্ষের অনেক মিল আছে। কিন্তু ইউরোপীয়দের সঙ্গে ছিল গভীর পার্থক্য। এ দেশের লোকের কাছে ঈশ্বর ও শয়তানের মধ্যে কোনো পৃথক সত্তা ছিল। তাঁদের কাছে ঈশ্বর ছিল ভয়ঙ্কর এবং ভালো মন্দের জন্মদাতা তিনিই, শম্ভু মিত্র জানিয়েছেন এই দর্শনের কথা টয়েনবি উল্লেখ করেছেন।

ভারতবর্ষ দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনের পিছনে ছিল ইংরেজদের আগমন। ইংরেজদের রাজত্বের সময় থেকে এটা চলে আসছে। তারা দেশ ছেড়ে চলে যাবার পর থেকে সমাজে ভাঙন শুরু হয়। শম্ভু মিত্র বলেছেন আগের মতো মানুষ আর একানবর্তী পরিবারে থাকতে চাইছে না, সমাজের উচ্চবর্ণের লোকেদের হাতে যে অধিকার ছিল সেটাও চলে গেল, মেয়েদের বিবাহের নিয়ম ভেঙে গেল—এই যে দ্রুত পরিবর্তন সেটা তিনি নিজের চোখে দেখেছেন। এই পরিবর্তন কিন্তু শুধু শুধু হয়নি এর জন্য কঠোর সংঘাত কঠিন সংগ্রাম আছে। সেটা তিনিও অনুভব করতে পেরেছেন। তাই তিনি বলেছেন—

“সেই স্বর্ণ যুগের সংস্কৃত নাটকের মধ্যে আমার মন আর মুক্তি পাচ্ছে না। আমরা সংঘাত আর আলোড়ন দেখতে চাচ্ছি আমাদের নাটকে। অথচ এখনো রবীন্দ্রনাথের গান বা ঐ রকম কোনো স্থির শান্ত তদগতভঙ্গী, রসের প্রকাশ থাকলেও আমরা মুগ্ধ ও আবিষ্ট না হয়ে পারি না।”^১

কারণ আমরা ভারতবাসীরা শান্তি প্রিয় এবং আমাদের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে রয়েছে শান্তির প্রভাব। আর আমাদের ধর্ম আর ইউরোপীয়দের ধর্মের মধ্যে রয়েছে অনেক পার্থক্য। শম্ভু মিত্র বলেছেন—

“আমরা নিরীশ্বর ন্যায়শাস্ত্রের কথাও জানি সাংখ্য জানি, বৌদ্ধ-ন্যায় জানি। নাড়ীর মধ্যে এই সব অনুভব নিয়েই তো আমরা ভারতীয়।”^২

কিন্তু একটা সমস্যা আমরা ভারতবাসীরা নিজেদের যোগাযোগের পথ ছিন্ন করে ফেলেছি। সেতু বন্ধন গড়ে তুলতে পারছি না, পরিবর্তনশীল সমাজের সঙ্গে।

শম্ভু মিত্র বলেছেন এই (প্রাচীন ও আধুনিক) সংঘাতের মধ্যে যখন কেউ সংযোগ স্থাপন করতে পারছেন না এবং এটাকে অসম্ভব বলে মনে করছে তখন রবীন্দ্রনাথ সেই সংযোগ স্থাপন করেন। কারণ রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকের মধ্যে আধুনিকতার স্পর্শ তুলে ধরেন এবং সেখানে কোনো ইউরোপীয় প্রভাব থাকে না। তাই বিদেশী নাট্যশাস্ত্রীদের তাঁর নাটক বোঝার জন্য অনেক অসুবিধা পড়তে হয়। John Ganaer এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে পরিচয়টা দিয়েছেন সেটি শম্ভু মিত্র পাঠকদের কাছে তুলে ধরেন। সেটি হল—

“Tagore proved to be across between Macterlinck and a Hindu Sage।”^৩

শম্ভু মিত্র বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকের গভীরে যে সহজ-সরল Sophisticated রূপ সেটা ভারতীয়দের অনুপ্রাণিত করে, কিন্তু ইংরেজদের পক্ষে সেটা বোঝা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

তিনি বলেন রবীন্দ্রনাথের ‘রক্তকরবী’ ও ‘মুক্তধারা’ নাটকের মধ্যে আমরা আধুনিক কাহিনী দেখতে পাই। এখানে ইউরোপীয় নাটকের কোন রকম স্পর্শ নেই। এই নাটকের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল এখানকার চরিত্রগুলি সৃষ্টিতে তিনি বাস্তবতার সাহায্য নেননি কিন্তু অভিনয় দেখে বোঝা যায় সেটা কতটা বাস্তব।

এই বাস্তবতার মূল ভিত্তি হল ভাষা। এই ভাষা বাজার চলতি মুখের ভাষা নয়। ‘রক্তকরবী’ নাটক থেকে শঙ্কু মিত্র সেই ভাষার একটা লাইন তুলে ধরেছেন—

“কিশোর বলে, একদিন তোর জন্যে প্রাণ দেব নন্দিনী, একথা কতবার মনে মনে ভাবি।”^৪

শঙ্কু মিত্র জানিয়েছেন, এই ভাবে সংলাপ বয়ন সবচেয়ে কঠিন। তাঁর মনে হয়েছে, এই কথা বলার অনুভূতিটা একমাত্র কিশোরই আনতে পারবে। অভিনেতা মনে মনে পারলেও সেটা বলার সময় ন্যাকামি হয়ে যায়। এই অন্যরকম চিন্তা-ভাবনা চলে আসে বলেই শঙ্কু মিত্র জানিয়েছেন তাঁদের এই নাটকের ভাষা বলতে কষ্ট হয়।

আমরা সহজভাবে অন্তরের কথা প্রকাশ করতে পারি না। শঙ্কু মিত্র ‘চার অধ্যায়’ অভিনয় কালে দেখছেন প্রেমের মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ অন্তরের কিছু কথা বলেছেন। যেমন—

“আলো কমে গিয়েছে এস আরো কাছে এস। আমার চোখ দুটো এসেছে ছুটির দরবারে তোমার কাছে, একমাত্র তোমার কাছেই আমার ছুটি। অতি ছোট তার আয়তন ...।”^৫

কিংবা—

“এই যা দেখছি এই এক আশ্চর্য্য সত্য। এর মানে কী, তা আমি কাউকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না। কোনো এক অদ্বিতীয় কবির হাতে ধরা দিতে পারলো না বলেই এর অব্যক্ত মাধুর্য্যের মধ্যে এমন গভীর বিষাদ।”^৬

শম্ভু মিত্র জানিয়েছেন প্রেমের ক্ষেত্রে এই সকল কথা বলি না, আবার কেউ ব্যবহার করে না। কিন্তু একথা ঠিক যে মানুষের মনের মধ্যকার আবেগ অনুভূতি প্রকাশ করা যদি কোনো ভাষা থাকে সেটা ঐ ভাষা। এই ভাষা মানুষ বলতে পারে না। আর যিনি লিখতে পারেন তিনি হল মহৎ কবি। আর রবীন্দ্রনাথ সেটা পারতেন। তাইতো তিনি মহৎ কবি।

শম্ভু মিত্র মনে করেন, অভিনয় এমন ভাবে করাতে হবে তার মধ্যে দিয়ে অন্তরের আবেগ স্বাভাবিকতার সঙ্গে যেন সহজে প্রকাশ পায়। সেখানে বাইরের জীবন আর অন্তরের জীবন অঙ্গাঙ্গিভাবে প্রকাশিত হবে। কিন্তু বর্তমান কালের আধা রিয়ালিস্টিক সাঁচে লেখা আধুনিক নাটকগুলির মতো যদি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক অভিনয় করা হয় তাহলে সেখানে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে না। একথা শম্ভু মিত্র পাঠকদের জানায়।

শম্ভু মিত্র বর্তমান কালের অভিনেতার কথা পাঠকদের কাছে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, বর্তমান কালের অভিনেতারা রাগারাগির কিংবা কলহের দৃশ্য খুব সহজেই করতে পারে। কিন্তু তারা যদি গভীর অনুভূতি বা প্রেমের কথা উন্মত্তভাবে করতে যায় তখন সেটা কৃত্রিম হয়ে যায়। তা এর কারণ হল—

“ ‘আধুনিক বঙ্গ সংস্কৃতির’ ঐ কলহপটুতার তিক্ত কণ্ঠস্বরে তো সেটা হবে না। যে ভালোবাসে তার কণ্ঠস্বরে মিষ্টত্ব লাগে, সুর লাগে, কাব্য আসে।”^৭

শম্ভু মিত্র বলেছেন, প্রেমে পড়া ছেলে-মেয়েরা সবসময় খুশীতে থাকে। তাছাড়া শুধুমাত্র প্রেম প্রকাশের কথা নয়, আদ্যপান্ত মানুষকে প্রকাশ করা। যেমন—কিশোরের অন্তরটাকে অন্তরঙ্গভাবে প্রকাশ করা।

শম্ভু মিত্র বলেছেন, কোনো চরিত্রের আদ্যপূর্তি প্রকাশ করতে হলে সেই চরিত্রের অন্তরটা বুঝে হবে এবং সেই অনুযায়ী কণ্ঠস্বর, ভঙ্গীর দরকার হবে যাতে সহজেই দেখানো যাবে গভীরমনের বহুমাত্রিক অনুভূতির প্রকাশও তার পাশাপাশি চরিত্রের বলিষ্ঠতা। এই সহজ-সরলভাবে প্রকাশ করাটা শম্ভু মিত্র sophistication-এর ফল বলেছেন। শম্ভু মিত্র এই ঘটনা

সম্পর্কে বলেছেন—

“এটা খালি কিশোরের কথা নয়, প্রেমের কথাও নয়। এটা হলো আমাদের নাট্যাভিনয়ে আমরা কেমন করে চরিত্রগুলোর বহির্জীবন আর অন্তর্জীবন একই সঙ্গে প্রকাশ করতে পারি সেইটে বোঝবার একটা প্রয়াস।”^৮

তিনি বলেন এর মাধ্যমে নাট্য প্রচেষ্টাগুলি একটি নিজস্ব পক্ষ এবং নিজস্ব পরিচয় খুঁজে পেতে পারবে।

শম্ভু মিত্র বলেছেন, ভলো নাটক রচয়িতা বলতে যার কথা মনে পড়ে তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকে কোনো রকম Action নেই। কিন্তু নাটকগুলি বাস্তব ধর্মী এবং মনকে স্পর্শ করে যায়। তিনি উদাহরণ হিসাবে পাঠকদের সামনে ‘মুক্তধারা’ নাটকের কথা বলেন। মুক্তধারার রাজার চরিত্রের পাশাপাশি প্রত্যেকটি ছোটো ছোটো চরিত্র অত্যন্ত বাস্তব এবং প্রত্যেকেই যেন আলাদা আলাদা এক একটি গল্প হয়ে উঠেছে।

শম্ভু মিত্রের মনে হয়েছে রবীন্দ্রনাথের এই নাট্য প্রকাশ পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারলে ভারতীয় নাট্যদল তার নিজস্ব পরিচয় পাবে। সেখানে আর বিদেশী রঙ্গালয়ের অনুকরণ থাকবে না। আর বাড়বে ভারতীয় নাট্যকলা ও অভিনেতাদের আত্মসম্মান। তাই শম্ভু এই পথ ধরে এগিয়ে চলার জন্য বলেন—

“কেবল রবীন্দ্রনাথের দোহাই দিয়েই হবে না। কারণ তিনি তো আমাদের পথের শেষ ন’ন, তিনি আমাদের পথের পাথর। আমাদের মহার্ঘ দিশারী।”^৯

এই সকল আলোচনার পর শম্ভু মিত্র জানান এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে বহু পরিশ্রমের প্রয়োজন আছে। কারণ সেই সময়ে কারো জানা ছিল না ভারতীয় কলার রূপটি কি হবে, সকলের সেটা একটা কৌতুহলের বিষয়।

কিছু স্মরণীয় অভিনয়:

শম্ভু মিত্র এই প্রবন্ধটি ১৯৬৫ সালে রচনা করেন। এই প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে তাঁর মনে ছুঁয়ে যাওয়া কিছু অভিনয় আলোচনা করেছেন।

শম্ভু মিত্র তাঁর স্মরণীয় অভিনয়ের মধ্যে প্রথমেই শুরু করেছেন ভাদুড়ী মশায়ের অভিনয় দিয়ে। ভাদুড়ী মশায় একজন বিখ্যাত অভিনেতা ছিলেন। তিনি ‘আলমগীর’ নাটক নিয়ে মজা করতেন। কিন্তু জীবনে তিনি যত নাটক করে গেছেন তাঁর মধ্যে এই ‘আলমগীর’ নাটকটি দর্শকদের মনে একটা অবদান রেখে গেছে।

শম্ভু মিত্র জানিয়েছেন, নাটক কিভাবে কাটতে হয় এবং সাজাতে হয় সেই শিক্ষা তিনি প্রথম শিশির কুমার ভাদুড়ী মশায়ের কাছ থেকেই পেয়েছেন। শিশির কুমার ভাদুড়ী যখন এই ‘আলমগীর’ নাটকটি মঞ্চপযোগী করেন তখন শম্ভু মিত্র ও তা দেখে মুগ্ধ হন।

এই নাটকের একটি দৃশ্যে যেখানে আলমগীর মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় আছে এবং তাঁকে কুর্নিশ করে তয়বর এসে দাঁড়ায়। এই অবস্থায় তিনি তয়বরকে চিনতে পারেন না এবং তার কাছ থেকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। তখন তয়বর তাকে তার নামটা বলে। নামটা শুনে আলমগীর চিনতে পারেন না এবং এমন ভাবে নামটা উচ্চারণ করেছেন যেন সেটা তার স্মৃতির গভীরে ধাক্কা মারে এবং সে আপন মনে বলেন তথবর, তয়বর! তখন সেটা তার কাছে পরিচিত মনে হয়। তিনি জিজ্ঞাসাভাবে বলেন—তয়বর?—যেন সে বলতে চান যে তয়বর এই নামটা তিনি জানেন। তারপর তাঁর সব মনে পড়ে এবং শেষে বলেন—

“ও হ্যাঁ তাইতো, তয়বর—সেনাপতি তয়বর—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার বিশ্বস্ত অনুচর তয়বর,—বুঝতে পেরেছি, তয়বর, ঠিক, তয়বর।”^১

এই যে ‘তয়বর’ নামটি উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে তিনি আস্তে আস্তে দৈনন্দিন জীবনে ফিরে আসছে—এই ভাব শিশির কুমার ভাদুড়ী মশায় খুব সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন দর্শকদের সামনে। সেটা ছিল শম্ভু মিত্রের কাছে এক আশ্চর্য অনুভূতি।

শম্ভু মিত্র জানিয়েছেন তিনি যতবারই এই নাটকটি দেখেছেন ততবারই তাঁর কাছে নতুন লেগেছে এবং একটা করে নতুন অর্থ বহন করে এনেছে। অনেক স্থানে নাটকটির উদ্দেশ্যটা সেই সময় তিনি বুঝতে পারেননি। তবু তিনি বলেছেন—

“এই অভিনয় অংশটা যদি ঘটনাচক্রে কোনোদিন খারাপ হয়ে যেত তাহলে আমার দুঃখের সীমা থাকত না।”^২

আবার নাটকের আর একজায়গায় আছে আলমগীর তাঁর স্বপ্নের বিবরণ দিচ্ছেন দিলীর খার কাছে। তিনি দেখেছেন তাঁর আত্ম তাঁর দেহ ছেড়ে চলে যাচ্ছে এবং মৃত শরীরটার পাশে কতো হিন্দু, কতো মুসলমান, কতো ইহুদি ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে। তারা সকলে আলমগীরকে ডাকছেন কিন্তু কোনো রকম সাড়া পাচ্ছে না। সেই সময় কেউ একজন দিলীর বলে ডাকে তখনই তাঁর আত্মার মুখে বাণী ফুটে। আবার স্বপ্নের মধ্যে যখন তিনি তৃষণার্ত তখন কত এক সোনার ঝারিতে করে জল নিয়ে আসে তবুও তিনি তখন জলপান করতে পারছেন না।

এই ঘটনাগুলি বর্ণনার সময় ভাদুড়ী মশায়ের ঐ কণ্ঠস্বর শম্ভু মিত্র আকর্ষণ করে। এই কথা বলার মধ্যে সূক্ষ্ম স্বরবৈচিত্র্য ফুটে ওঠে সেটা সম্পূর্ণরূপে শম্ভু মিত্রকে গ্রাস করে। এগুলির মধ্যে কোনো গলা ফাটানো চিৎকার ছিল না। আর অভিনয় ছিল অতুলনীয়।

শ্রীমতী প্রভা দেবী ছিলেন একজন বিখ্যাত অভিনেত্রী। তিনি আলমগীর নাটকে উদিপুরী চরিত্রে অভিনয় করতেন। আলমগীরের প্রতি উদিপুরীর প্রেম রাগ যতটা সহজ ভাবে তিনি প্রকাশ করতেন সেটা অন্য কারোর পক্ষে সম্ভব ছিল না। শম্ভু মিত্র বলেন তিনি এই অভিনয় দেখতে পেয়েছেন বলে নিজেকে ধন্য মনে করেন।

শম্ভু মিত্র জানান তিনি ‘কর্নাজুন’ নাটকে প্রভা দেবীকে তিনি কুস্তীর অভিনয় করতে দেখেছেন, একজায়গায় কুস্তী আসেন কৃষ্ণের সঙ্গে কথা বলতে। সেখানে তিনি অপূর্ব একটা কণ্ঠস্বরে তাঁর বিসর্জন দেওয়া ছেলে বারবার তাঁর স্বপ্নে আসে সেটা বর্ণনা করেন। তাঁর গলার স্বর বচন ভঙ্গী দেখে শম্ভু মিত্রের মনে হয়েছিল ঐ জায়গায় অন্য কাউকে মানায় না। পরবর্তী

দৃশ্যে কুন্তী যখন কর্ণের সঙ্গে দেখা করে সেটা দেখার পর শম্ভু মিত্র থিয়েটার হল থেকে বেরিয়ে আসেন এবং এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলেন—

“হতে পারে আমি হয়তো রোম্যান্টিক। হতে পারে আমি হয়তো বোকার মতো অল্পেতেই অত্যন্ত বেশী মুগ্ধ হয়ে পড়ি। কিন্তু সেই বেকামির জন্য আমি আমার ভাগ্যের কাছে কৃতজ্ঞ। তবেই তো এতো আনন্দ আমি পেয়েছি। চালাক হলে তো পেতুম না।”^৩

‘বিন্দুর ছেলে’ নাটকে প্রভা দেবী বড় বউ-এর চরিত্রে অভিনয় করে। সেখানে একটি লাইন আছে—

“তুই কাকে কী বলি লা ছোটো বউ!”^৪

এটির অভিনয় শম্ভু মিত্রের কাছে পৃথিবীর বিখ্যাত অভিনয়ের মধ্যে পড়ে। মানুষের জীবনের বড় ট্রাজেডি হল বিশ্বাস ভাঙা। এখানে বিশ্বাস ভাঙার একটা ঘটনা আছে। শম্ভু মিত্র বলেন বিশ্বাস ভাঙার ঐ আঘাতের ঘটনাটায় প্রভা দেবীর অভিনয় দেখে মনে হতো তিনি যেন সত্যিই আঘাতটা পেয়েছেন এবং সেটা স্পষ্ট তুলে ধরেছেন, কিন্তু প্রভা দেবী এই নাটকের একটা দৃশ্যই অভিনয় করেছেন। তাই শম্ভু মিত্র বলেছেন—

“একটি দৃশ্যের অভিনয়ে যে গভীরতা প্রকাশ পেতো তাতে একজন বিরাট শিল্পীকে প্রত্যক্ষ করেছি আমরা।”^৫

শম্ভু মিত্র শিল্পের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন—

“শিল্পের বিচার গভীরতা দিয়ে, কোনো চালু ফ্যাশনের ‘বুড়ি’ ছোওয়া দিয়ে নয়।”^৬

আর অভিনয়ের গভীরতা যদি নির্ণয় করতে যাওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে অভিনয়ের গভীরতা আরো মানুষের মনের প্রকাশের ওপর। তাইতো অসংখ্য মানুষ নাট্যাভিনয়ের দোষে আসে বৈচিত্র্যময় প্রকাশ দেখার জন্য কোন ‘Confounded philosophy’ র জন্যে নয়। আর

নাট্যকারদের কাছে সবচেয়ে বড় জিনিস হল মানুষ। তাই শম্ভু মিত্র আলবেয়ার কামুর একটা কথা পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন—

“মানুষের ভেতরে যে সত্য লুকোনো থাকে, তার অন্তরে যে রহস্য থাকে, সে সম্বন্ধে যার ঔৎসুক্য আছে সে যেন থিয়েটারে আসে।”^৭

শম্ভু মিত্র এই প্রবন্ধের এই সকল ব্যক্তিদের পাশাপাশি আরেকজন বিখ্যাত অভিনেতার অভিনয় পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি হলেন মহর্ষি বা শ্রী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। তিনি ‘মাটির ঘর’ নাটকে সত্যপ্রসন্নের চরিত্রে অভিনয় করেন। নাটকে দেখা যায় সত্য প্রসন্নের এক মেয়ে আত্মহত্যা করে স্বামীর অত্যাচারে তখন তিনি আর একজনকে বলেন বিশ্বাস হারাতে নেই ‘রাত্রি যতো অন্ধাকরই হোক একদিন তারপরে সকাল হবেই।’ কিন্তু তার ঐ মেয়ের জীবনে আর সকাল এল না। সে পাগল হয়ে গেল এবং যে জামাই ছিল সে মারা গেল। তখন সত্য প্রসন্ন ওপরের দিকে তাকিয়ে বলে—

“তবু আমি কাঁদবো না, তুমি আমায় কাঁদাও দেখি, স্টুপিড, তুমি আমাকে কাঁদাতে পারবে না।”^৮

এই অংশটি অভিনয়ের সময় মহর্ষি চারিদিকে দিশাহীন ভাবে তাকায়, চোখের শিরাগুলো লাল হয়ে ফুটে ওঠে এবং অস্বাভাবিক কণ্ঠ স্বরে যখন বলে—‘তুমি স্টুপিড—তুমি আমাকে কাঁদাতে পারবে না’ তখন তাঁর এই অভিনয় দেখে সকলে মুগ্ধ হয়ে যায়। দর্শকরা ঢোক গিলতে পর্যন্ত পারে না। একথা শম্ভু মিত্র জানান, কারণ তিনি ঐ অভিনয় একজন দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। আর মহর্ষি সংযত অভিনেতা হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি কখনো অভিনয়ের মধ্যে বাড়াবাড়ি করেননি এবং সেটা পছন্দও করতেন না।

শম্ভু মিত্র বলেন যখন কোনো অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে মানুষের আবেগ প্রকাশিত হয় তখন সেটা নাটকের গভীরে ছাড়িয়ে চলে যায়। তাইতো বলেন—

“নাটক মাপবার সরলীকৃত মাপকাটি দিয়ে ভালো অভিনয়কে মাপা যায় না।”^৯

শম্ভু মিত্র জানিয়েছেন, অভিনয়ের আধুনিকতা বা প্রাচীনত্ব বিচার করতে গেলে শম্ভু মিত্র বলেন বিচার করার জন্য সংবেদনশীল মন থাকা প্রয়োজন যা আধুনিককালের পরিপ্রেক্ষিতে একটা মানুষের সত্য প্রকাশ দেখতে পায়, অনুভব করতে পারে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী একজন অসামান্য প্রতিভাবান অভিনেতা। তিনি ‘মহাশিক্ষা’ ও ‘বাংলার মেয়ে’ এই নাটক দুটিতে তিনি অসাধারণ অভিনয় করেন। শম্ভু মিত্রের পাশাপাশি দর্শকদের মনকে ছুঁয়ে যায়।

‘মহানিশা’ নাটকে তিনি একজন গ্রামের বদমেমাজি, সুদখোর এর চরিত্রে অভিনয়ও করেন। গল্পে আছে তিনি একদিন তার সংখ্যাটির বর্ণনা দিচ্ছিল। গুরুটা হলেও যত শেষের দিকে যাচ্ছি তত তার গলাটা ধরে আসছিল। এবং সেই সঙ্গে বদমেমাজি মানুষটার গোপন ক্ষতের জায়গাটা প্রকাশিত হয়। এইগুলো অভিনয়ের সময় প্রথম দিকে তাঁর গলার স্বরের কোনো পরিবর্তন হলনি। কিন্তু তাঁর শেষ অংশের অভিনয় দেকে দর্শকদের মনে হয়েছে লোক আতর্জনাদ করে বিলাপ করে উঠলো।

‘বাংলার মেয়ে’ নাটকের মধ্যেও তাঁর অভিনয় ছিল অতুলনীয় এবং এই নাটকটির অভিনয়ের সময় শম্ভু মিত্র শ্রীকালীপ্রসাদ ঘোষের ভ্রাম্যমান থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আর সেখানেই এই নাটকটা অভিনীত হয়। তখন কালীপ্রসাদ ঘোষের এবং আর কয়েকজন ব্যক্তির নির্দেশে শম্ভু মিত্র যোগেশ বাবুর নাটকের একটি বিশেষ স্মরণীয় দৃশ্যটা দেখেন।

শম্ভু মিত্র জানান, যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী ঐ নাটকে ব্রাহ্মণ চরিত্রে অভিনয় করেন। বৃদ্ধ ছিল মিতভাষী এবং তিনি দুঃখের আঘাতে জীর্ণ হয়ে গেছেন। তিনি একদিন মেয়ে দেখতে মেয়ের স্বপ্নের বাড়ি যান এবং সেখানে শুনতে পান তার মেয়ে মারা গেছেন। কারণ কয়েকদিন না খেয়ে থাকার পর খেতে বসছে সেই সময় তার স্বামী এসেছে আকস্মিক রাগে হাত ধরে টানাটানি করে এবং স্ত্রীটি ভাতের থালার ওপর পড়ে মারা যায়, তিনি জামাইয়ের কাছে একথা শুনে বোধগম্য হারিয়ে ফেলা এবং তিনি মাটিতে বসে পড়েন। এই যে মাটিতে পড়ে যাওয়া এই ঘটনাটি দর্শকদের সামনে তুলে ধরা খুব কঠিন কাজ। এবং সেটা দর্শকদের মনকে বিচলিত করে তোলে।

দেখা যায় ব্রাহ্মণটি কিছুক্ষণ চুপ চাপ থাকার পর তাঁর মেয়ে কোথায় জানতে চায় এবং জামাইয়ের নির্দেশে ধীরে ধীরে মৃত মেয়ের কাছে যান। সেখানে সে মেয়ের মাথার কাছে বসে বলে—

“ভবানী! ভবানী! তোকে যে নিয়ে যেতে এসেছিলুম মা।”^{১০}

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এই অংশটি যখন অভিনয় করেন তখন তার মধ্যে দিয়ে কোনো হাহাকার বড় গলার স্বরের মধ্যে কোনো রকম কৃত্রিমতা ফুঁটে ওঠেনি। কিন্তু তবুও দর্শকরা তাঁর অভিনয় দেখে সেই দুঃখটা নিজের মধ্যে অনুভব করে। আর তার অভিনয়ের মধ্যে এতটা বাস্তবতা ফুটে উঠেছিল যে, দর্শকদের মধ্যে থেকে তারা চাপা আতর্নাদ শুনতে পায়।

শম্ভু মিত্র জানান, বৃদ্ধের জামাই যখন তাকে পুলিশে ধরিয়ে দেবার কথা বলেন তখন সে কোন কথায় কান না দিয়ে বলেন—

“না না ও সব তোমরা যা পারো করো, আমাকে আর ওর মধ্যে জড়িয়ে না।”^{১১}

শম্ভু মিত্র জানান অপরাধীকে এই কথা বলার মধ্যে দিয়ে তিনি ‘ভীতিপ্রদ কমিকের’ উল্লেখ করেছেন আর বাস্তবে যে কমিক ও ট্র্যাজেডি গায়ে গা লেগে থাকে সেটা এখানে তুলে ধরেছেন এবং এই লেগে থাকার অনুভব তিনি এখানে প্রথম পেয়েছেন।

শম্ভু মিত্র জানান এই অংশের অভিনয় দেখার পর শম্ভু মিত্র সাজঘরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। তিনি কি করে এত সহজে এই অভিনয় করলেন জানতে চাইলে তিনি তাকে বলেন—

“কি জানো, ধ্যান করতে হয়, ধ্যান করলে—মন দিয়ে ধ্যান করলে,—তার পরে পাওয়া যায়।”^{১২}

ধ্যান কথা শুনে শম্ভু মিত্র যে একটু রেগে গিয়ে ছিলেন। কিন্তু সেটা প্রকাশ করতে পারেনি।

শম্ভু মিত্র জানিয়েছেন, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ছিলেন দেশের উচ্চতর শ্রেণীর শিল্পীদের মধ্যে একজন। তিনি বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন। যেমন—তঁাকে ‘রমা’ তে গোবিন্দ াগসুলীর মতো ধূর্ত চরিত্রে দেখা যায়, আবার সখবার একাদশীতে, ঘাটরাম ডেপুটির মতো নির্বোধ চরিত্রে। আলমগীর এ রাম সিং এর মতো ভাড়া চরিত্রেও দেখা যায়। সব জায়গায় তিনি দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করে গেছেন। নিজেদের ঐতিহ্যটা ধরে রেখেছেন। যারা তাঁদের নিজস্ব উপলব্ধি দিয়ে এ শিল্পকে একটা আকার দান করেছেন। আর জন্য বাঙালী নাট্য প্রেমিরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে আছেন। এই সকল ব্যক্তিদের অভিনয় দেখে বাঙালীরা অভিনয়ের মানটা বুঝেছে এবং তার পাশাপাশি গভীরতাটাও বুঝতে পেরেছে। তাই শম্ভু মিত্র বলেন—

“আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে পিতৃপুরুষদের এই কষ্টার্জিত সম্পদকে নষ্ট করে আমরা যেন কৌশলের পথে চলে নিজেদের সর্বনাম না-করি।”^{১৩}

শম্ভু মিত্র জানিয়েছেন, যোগেশচন্দ্র একটি অভিনয় করতেন না সেটা হল Heroic অভিনয়। এই Heroic চরিত্রের অভিনয়ের অভাবপূর্ণ করতে শিশির কুমার ভাদুড়ী মহাশয়। Heroic চরিত্র কিভাবে জীবন্ত হয়ে উঠত তাঁর হাতে। তাঁর অভিনয় সঙ্গে আর সাধারণ অভিনেতাদের অভিনয়ের কোনো মিল থাকত না। কারণ তাঁর ছন্দের সংলাপে সুরের প্রাধান্য থাকত। যেটা সবার পক্ষে সহজ ছিল না।

শম্ভু মিত্র জানিয়েছে, অনেক অভিনেতা শিশির কুমারের অভিনয় নকল করেছেন। কিন্তু তারা পুরোপুরি পারেননি, কারণ অনেক তাঁর অভিনয়ের বাবনের সূক্ষতা লক্ষ্য করতেন। শম্ভু মিত্র বলেছেন তিনিও হয়তো তাদের মতো হতেন। কিন্তু তাঁর পথ দেখানোর জন্য একজন গুরু ছিলেন, যাকে তিনি প্রথম গুরু বলেছেন। তিনি হলেন—

“ভাদুড়ী মশায়ের মুড দ্যাখো যেন সুইচ বোর্ডে বাঁধা আছে। যখনি সে মনোভাব দরকার, তখনই সেগুলো যেন পরপর পরীপর্ব চলে আসছে, তার সঙ্গে সঙ্গে গলার ‘modulation’ যেন আপনা থেকে হয়ে যাচ্ছে।”^{১৪}

তাই শম্ভু মিত্র জানিয়েছেন, শিশির কুমার ভাদুড়ীর এই পর প্রতিভার জন্য অনেক অধ্যয়নও করেছিলেন। তার পরেই তিনি নিজেকে ঐ জায়গায় পৌঁছাতে পেরেছেন।

প্রবন্ধের শেষে এসে, শম্ভু মিত্র জানিয়েছেন, নাট্য জগতে সবচেয়ে বড়শিল্পী হলেন অভিনেতা। তাঁরা কোনো নির্দেশক বা নাটকের সুতোয় বাঁধা থাকে না। তারা অভিনয়ের সময় নিজের প্রতিভা নিজের চেষ্টাতে তুলে ধরেন। আর একটা নাট্যাভিনয়ে মধ্যে একজন নাটককার, অভিনেতা ও মঞ্চ পরিচালক সহজেই নিজের শিল্পীর অধিকারে আত্মসম্মানে মন্ডিত। আর একটা আদর্শ থিয়েটারের জন্য এটা প্রয়োজন।

শম্ভু মিত্র এই প্রবন্ধ পড়ে আমাদের সব পাঠকদের এবং অভিনয়ের মানেরটা বুঝিয়ে দিতে পেরেছিলেন। যাতে পরবর্তী কালে বাঙালী থিয়েটার নষ্ট না হয়ে যায় এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে থিয়েটারকে চরমে নিয়ে যেতে পারে তার পথ তিনি খুলে দিয়ে গেছেন।

ব্রেখ্ট প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা (১৯৬৫):

এই প্রবন্ধটি শম্ভু মিত্র ১৯৬৫ সালে রচনা করেন। এই প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে তিনি বিখ্যাত নাট্যকার ব্রেখ্ট সম্পর্কে পাঠকদের জানিয়েছেন।

পূর্বজার্মানির একজন বিখ্যাত নাট্যকার ছিলেন ব্রেখ্ট। তিনি সারা পৃথিবীর নাট্যকারদের কাছে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছেন। ব্রেখ্ট এই নামটা যেমন উচ্চারণ করা কঠিন তেমনি তাঁর নাট্য সম্পর্কে লেখা টীকাগুলো পড়ে বোঝাও খুব শক্ত। একথা শম্ভু মিত্র এই প্রবন্ধে জানান। তিনিও ব্রেখ্টের Fan ছিলেন। ব্রেখ্ট তাঁর থিয়েটার সম্পর্কে শেষের দিকে একটা কথা বলেছেন—সেটা এই প্রবন্ধের মধ্যে শম্ভু মিত্র উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে—

“সমালোচকরা যদি আমার থিয়োরী না দেখে থিয়েটারটা দেখতে আসতো তাহলে দেখতে পেত যে এক একটা থিয়েটার, যে থিয়েটারে—আশাকরি—কল্পনা আছে, রসিকতা আছে এবং অর্থ আছে।”^১

তিনি আরো বলেছেন—

“I think the root of the trouble was that my plays have to be performed if they are to be effective, so that for the sake of (on deam me) a non anistotelian dramaturgy I had to out line (calamity!) an epic theatre I”^২

তঁার যে সরল ভাবে বলার ভঙ্গী সেটা শব্দু মিত্রে খুব ভালো লাগত। এবং এর জন্যই তিনি তাকে আপন মনে করত।

জার্মানিতে গিয়ে নাটক দেখা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই শব্দু মিত্র বলেন তাই অন্যদের কাছ থেকে অনেক ঝালকথা তঁার সম্পর্কে শুনতে হয়েছিল। আরও কিছু নাট্যতাত্ত্বিক আছে যাঁরা ব্রেখ্ট সম্পর্কে উদ্ভট কথা প্রচার করেন মানুষকে ভড়কিয়ে দেবার জন্য। শব্দু মিত্র তাদের উদ্দেশ্যে বলেন—

“ব্রেখ্টের থিয়েটারটা কিন্তু থিয়েটারই, থিয়োরী নয়।”^৩

যে সকল ব্যক্তির কাছের থেকে বক্তৃতা বেশি দিতেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে বলতেন—

“বক্তৃতা দিয়ো না। করে দেখাও।”^৪

শব্দু মিত্র বলেন ব্রেখ্টের মনে হতো থিয়েটারে কোনো নীতি জ্ঞান দান করা হয় না। সেখানে মানুষ যায় আনন্দ নেবার জন্য। তাছাড়া আনন্দ নেবার জায়গায় নীতি জ্ঞান চলে এনে সেটা তখন তার মর্যাদা হারিয়ে ফেলে। থিয়েটার আত্মিক ও দৈহিক ভাব সঞ্চায়নের মাধ্যমে যে আনন্দ সেটার বেশি আর কিছু নয়। তাছাড়া থিয়েটারটা এমন একটা জায়গা যেখানে আনন্দের কোনো জবাবদিহি হয় না।

শব্দু মিত্র ব্রেখ্ট সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, রবীন্দ্রনাথেরও লেখার মধ্যেও ব্রেখ্টের মতো চিন্তা ধারায় প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু সেই মুহূর্তে অনেকেই রবীন্দ্রনাথের এই সকল চিন্তা ভাবনা গ্রহণ করতে পারেনি। কারণ হিসাবে তিনি বলেছেন যখন মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের মুক্তধারা নাটকের

অভিনয় হচ্ছে সেখানে একটা দৃশ্য দেখা যায় রাজা চোখ রাঙিয়ে ধনঞ্জয়কে শাসান এবং ধনঞ্জয়ের তখন ‘গান আরম্ভ করে। এই গান চলাকালীন মঞ্চের উপরের সকল ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। সেই দৃশ্য দেখে অনেকে বলেন রবীন্দ্রনাথের নাট্যবোধের অভাব আছে। কিন্তু পশ্চিম থেকে যখন ব্রেখ্টের নাটকের পাশাপাশি থিয়োরীও এল তখন সেই একই রকম ঘটনা ঘটতে দেখে কেউ হতবাক হয়নি। এমনকি ব্রেখ্টকে নিয়ে তাঁদের কোনো প্রশ্ন জাগেনি। বরঞ্চ তাঁরা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

শব্দ মিত্রের মনে হয় ভারতীয়দের নাট্যজ্ঞান যথেষ্ট গভীর। সেই জ্ঞানের গভীরতা নিয়ে তারা যদি ব্রেখ্টের নাটক দেখে এবং পড়ে তাহলে যথেষ্ট কীর্তির অধিকারী হয়ে উঠবে। আর সেটা আধুনিক থিয়েটারের পক্ষে প্রয়োজন।

ব্রেখ্ট পশ্চিমের লোক হলেও তাঁর নাটকের মধ্যে প্রাচ্য নাট্যের অনেক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যার ফলে সেটা বিদেশীদের বোঝা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

শব্দ মিত্র জানান, ব্রেখ্ট বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কথা বলেছেন। আর তার ফল স্বরূপ তাঁর থিয়োরী আর থিয়েটারকে একসঙ্গে বুঝতে সকলের অসুবিধা হয়। আর একটা আশ্চর্য জিনিস হচ্ছে ব্রেখ্ট জীবনের শেষের দিকে একটা থিয়েটার পান নিজের হাতে। আর সেখানে তিনি নিজের ইচ্ছা মতো অভিনয় করানো, আর সেখানে তিনি নিজেকে একজন বাস্তববোধ সম্পন্ন শিল্পীর প্রমাণ দেন। এই শব্দ মিত্র বলেন—

“এইটাই ব্রেখ্ট এর সম্পর্ক অতিপ্রয়োজনীয় কথা যে তিনি বাস্তববোধ সম্পন্ন ছিলেন।”^৫

ব্রেখ্টের এই বাস্তববোধ তাঁর আত্মাকে রক্ষা করে।

ব্রেখ্টকে ২৫ বছর বয়সে যেতে হয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধে। সেখানে তিনি Medical orderly ছিলেন, কিন্তু তাঁর কাজ ছিল সৈনিক সুস্থ করা নয়, তাঁদের যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করা। যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো, কিন্তু জার্মান প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত হয়। তাঁরা দু-কেবার

সাম্যবাদী বিপ্লবের চেষ্টা করে কিন্তু কোনো রকম লাভ হয়নি। সেই সময় জার্মানির অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। সেখানে বামপন্থী দক্ষিণপন্থী প্রভৃতি রাজনৈতিক নেতারা মাথা তুলে দাঁড়ায়। নানা রকম উদ্ভট মতবাদ কৌশল শিল্পের ক্ষেত্রে আধুনিক বলে গণ্য হয়। মানবিক গুণ, নৈতিক গুণ ইত্যাদি মানুষের কাছে থেকে হারিয়ে যেতে শুরু করেছে। সেই মুহূর্তে এই রকম পরিস্থিতিতে আবির্ভাব ঘটে হিটলারের। এই প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে ব্রেখ্ট ও তৎকালীন সময় সম্পর্কে শম্ভু মিত্র পাঠকদের কাছে কিছুটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেন।

শম্ভু মিত্র জানান, ১৯৩৩-১৯৪৮ পর্যন্ত ১৫ বছর ব্রেখ্ট দেশ ছাড়া ছিলেন। সেই ১৫ বছর ছিল তাঁর কাছে খুব অন্ধকার সময় কারণ তিনি যেসব দেশে ঘুরেছেন সেখানে জার্মান কেউ বুঝত না। তাছাড়া তাঁর চিন্তা ছিল ভিন্ন প্রকৃতির আর সেটা ছিল বিদেশীদের কাছে বোঝা খুব কঠিন। তিনি এই রকম পরিস্থিতিতে অর্থ, শান্তি সব কিছুই অভাবের মুখোমুখি হন। তিনি ভেবেছিল এই অন্ধকার রাত্রি হয়তো কোনো দিন শেষ হবে না। আর এই অন্ধকার রাত্রির অভিজ্ঞতা নিয়ে সেই অন্ধকার দুর্দিনে *The Life of Galileo* ও *Mother Courage and her Children* -এর এই দুটি নাটক রচনা করেন। এই নাটক দুটি বিশ্বের সাহিত্যে এখনও স্মরণীয় হয়ে আছে।

শম্ভু মিত্র জানান, পৃথিবী জুড়ে যখন অন্যায় চলছে সেই অন্যায়কারীদের প্রশ্ন দিয়েছে শক্তিশালী ব্যক্তির আর ব্রেখ্টের মতো মানুষদের সেই পরিস্থিতিতে বাঁচা দায় হয়ে পড়ে। ব্রেখ্ট মানুষের কথা ভাবে এবং তাঁর মনে প্রশ্ন আসে মানুষ কী করবে, কেমন করে বাঁচবে? আর এই প্রশ্নের নাট্যরূপই হল ব্রেখ্টের বিখ্যাতই নাটক দুটি।

শম্ভু মিত্র প্রাগ শহরে গিয়ে ‘গ্যালিলিও’ নাটকের অভিনয় দেখেছিলেন এবং সেখানকার একটা দৃশ্য শিহরণ তিনি আজও ভুলিতে পারেননি সেটা পাঠকদের জানান। সেটি হল—

“গ্যালিলিও নতিস্বীকার করে মেনে নিয়েছে যে সূর্যই ঘোরে পৃথিবী ঘোরে না। ফিরে আসতে তার এক শিষ্য কেঁদে ফেলে বললে—সে দেশ অতি দুর্ভাগ্য

দেশ যেখানে একটাও বীর নেই। গ্যালিলেও তাঁর উত্তরে বলে—সে দেশ অতি দুর্ভাগা দেশ যেখানে কেবল বীরদেরই দরকার হয়।”^৬

শম্ভু মিত্র জানান ব্রেখটও ওই ঘটনার সম্মুখীন হল। তাঁর কষ্টের কথা তিনি তাঁর রচনার মধ্যে তুলে ধরেছেন। শম্ভু মিত্র এই প্রবন্ধে তাঁর লেখা দু’একটি উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর মনকে পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। এবং বোঝাতে চেয়েছেন তাকে—

“যে লোকটা হেরে গেল সে তো আর জ্ঞান এড়াতে পারে না। নিজেকে ধরে রাখো, আর তারপর ডুবে যাও। ভয় যদি পাও তো পাও। কিন্তু ডুবে যাও। একেবারে তলদেশে গিয়ে দেখবে তোমার জ্ঞান তোমার জন্য সেখানে অপেক্ষা করে আছে।”

আর এক জায়গায় তিনি লিখেছেন—

“সত্যিই আমি একটা অন্ধকার যুগে আছি।

যে পৃথিবী ক্ষতি করতে অপারগ

যে অংশটা বুদ্ধিহীন। মসৃণ ললাট

হোল অনুভূতি অভাবের পরিচয়। যে লোকটা উচ্চ স্বরে হাসছে

সে যে হাসতে পারছে—

তার কারণ

এখনো ‘সেই’ ভয়ঙ্কর সংবাদটা তাকে তো দেয়নি কেউ।

—এ কী যুগ!!”

যখন গাছের সম্পর্কে কোন কথা বলা যেন পাপ,

যেন তার মানে, আরো কতো বীভৎস ঘটনা নিয়ে প্রতিবাদ না জানানো।

ঐ যে মানুষটা শান্তভাবে রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছে

ও বোধহয় ওর বন্ধুদের নাগালের বাইরে

যে বন্ধুদের এখনি এই মুহূর্তে ওকে হয়তো খুবই দরকার।—

এটা তো সত্যি যে এখনও আমার জীবিকা আমি অর্জন করে থাকি।
কিন্তু বিশ্বাস করো সেটা নেহাতই একটা দৈবাৎ ঘটনা।
কারণ আমি যাই করি না কেন, তবু এখনো আমার পেট ভরে খাবার
অধিকার আমি অর্জন তো করতে পারিনি।
আমাকে এখনো
নেহাতই বরাত যেন পাকে চক্রে বাঁচিয়ে রেখেছে
(যদি সে বরাত ভাঙে, আমিও তো যাবো।)
তোমরা যারা এই বন্যার মধ্যে থেকে জেগে উঠে দাঁড়াবে
যে বন্যাতে আমরা সবাই তলিয়ে গেলুম—
সেই তোমরা যখন আমাদের ক্রটি গুলোর কথা বলবে
তখন এটুকুও ভেবো
যে কোন্ এক অন্ধকার যুগে আমরা বেঁচেছি
যে অন্ধকার থেকে তোমরা বেঁচে গেছ।”^৭

শম্ভু মিত্র জানান ব্রেখ্ট হতাশার মধ্যে দিয়ে যে জ্ঞান অর্জন করেছেন সেটা তিনি তাঁর রচনার মধ্যে তুলে ধরেন। তাই তাঁর রচনার এতো করুণা। ব্রেখ্ট জানিয়েছেন তাঁর রচনার গভীরতা যাঁরা বুঝতে পারবে তিনি তাঁদের প্রতি প্রশংসা জানাবেন একজন গভীর অনুভূতিসম্পন্ন মহৎশিল্পী বলে।

শিশিরকুমারের প্রয়োগকলা সম্পর্কে (১৯৬৬):

বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে নবযুগের প্রবর্তক শিশির কুমার ভাদুড়ী (১৮৮৯-১৯৫৯) ছিলেন পেশাদার নাট্যশিল্পী। উৎপল দত্ত তাঁকে ‘শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ অভিনেতা’ বলে উল্লেখ করেছেন। সেই প্রবাদ প্রতীম নাট্যশিল্পীর প্রয়োগ কলা সম্পর্কে আলোচ্য প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক শম্ভু মিত্র তাঁর নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেছেন। প্রবন্ধটি ১৯৫০ খ্রী: রচিত হয়।

শম্ভু মিত্র প্রথম শিশিরকুমারের অভিনয় দেখে ‘দ্বিগ্বিজয়ী’ নাটক ১৫/১৬ বছর বয়সে। তিনি নাটকটি দুইবার দেখেছিলেন। ‘দ্বিগ্বিজয়ী’ নাটকের অভিনয় দেখার আগে তিনি নাটকটি পড়েছিলেন। কিন্তু এই নাটকের অভিনয়টা তাকে খুব বেশি নাড়িয়ে দিয়ে ছিল। এই নাটকে যোগেশচন্দ্র ও অমলেন্দু লাহিড়ীর অভিনয় দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং তার পরেই তিনি Co-acting-এর খোঁজ পান।

শম্ভু মিত্র যে সময়ের কথা বলছে তখন বাংলা থিয়েটারে যে সকল পৌরাণিক বীরদের অভিনয় দেখা যেত তাদের মধ্যে ছিল গদাইলক্ষ্মরী চলন-বলন। কিন্তু এই নাটকটি ছিল একে বারে অন্যরকমের। প্রধান চরিত্র নাদিরশাহের বীরত্ব শার্দুলের ক্ষীণতার মতো ছড়িয়ে ছিল। তাঁর অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে যে কণ্ঠস্বর সৃষ্টি হয়েছে তা অন্য সকল চরিত্রকে সচেতন করে তোলে। তাই শম্ভু মিত্র এই নাটক দেখে মুগ্ধ হয়ে বলেছেন—

“এই প্রথম বুঝলুম যে এমন একজন লোক দরকার যার চিন্তাটা এই রকম প্রত্যেকটা চরিত্রাভিনয়ের খুঁটিনাটি পর্যন্ত বিস্তৃত। তাতে যে সম্বন্ধতা আসে, মুখে কিছু না বলেও যে বিচিত্র মানে প্রকাশ করা যায়, তা অন্যভাবে অসম্ভব।”^১

শম্ভু মিত্র বলেছেন, তিনি এতদিন পর্যন্ত জানতেন যেটা নাটকে লেখা থাকে সেটারই অভিনয় হয়। কিন্তু তিনি যখন ‘দ্বিগ্বিজয়ী’ নাটকটার অভিনয় দেখার পর পড়েন তখন দেখেন নাটক অতিসংক্ষিপ্ত। যেটুকু লেখা তা অতিসামান্য। প্রথম অঙ্কে যখন নাদির শাহ সিতারার পরিচয় নিচ্ছে তখন সিতারা বলে সে সদ্য বিবাহিতা স্বামীকে হত্যা করে পালিয়ে এসেছে। তখন তার কথা শুনে নাদির শাহ ‘শোভান আল্লা’ বলে উঠে এবং অতর্কিতে তার কোমর কাপড়ের মধ্যে থেকে ছোরাটা বের করে নিজের কোমরে গুঁজে রাখতে রাখতে বলে এবং বলে—‘তোমার ভালোবাসতে ইচ্ছে করছে।’—এই ঘটনাটি কিন্তু নাটকের মধ্যে নেই। কিন্তু এর প্রাচুর্য ছিল অসামান্য। সেটা চোখ কান হৃদয়, বুদ্ধিকে কখনো একটার পর একটা কখনো বা একসঙ্গে তৃপ্ত করে তোলা। যে তৃপ্ততার কোনো তুলনা হয় না।

নাটকে তৃতীয় অঙ্কের যে দৃশ্য ছিল সেটা তিনি তুলে ধরেছেন। দৃশ্যটা হচ্ছে একটা মসজিদের অভ্যন্তরস্থ প্রাঙ্গণ। কিন্তু সেটা দিল একটা ছাতার মতন। ছাতার পিছনের অংশটা ধাপের মতো উঁচু ছিলো। তবেই শেষে নিঁচু পাঁচিল ছাতার মতো আর পিছনের পটে আঁকা আছে দূরের বাড়িগুলির উপরের অংশ ও আকাশ। নাটকের বিষয়ের ওপর নির্ভর করে দৃশ্য পটগুলি তৈরী হয়। দৃশ্যগুলি এমন হয় দর্শকদের দেখা মাত্রই মন ভরে ওঠে। এই নাটকের দৃশ্যপট রচনা করে ছিলেন দেবুবাবু। তিনি প্রথমের দিকে শ্রীচারু রায়ের সহকারী ছিলেন। তিনি ১৯২৮ সালে অল্প বয়সে ‘দ্বিগ্বিজয়ী’ নাটকের দৃশ্য রচনা করেন। এই নাটকের পাশাপাশি চমকপদ আরো অনেক নাটকের দৃশ্যপট রচনা করেন। ‘শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া’র দৃশ্যপটও তিনি রচনা করেন। এখানে দেখা গিয়েছিল মঞ্চের তিন চতুর্থাংশ সাজানো আর খানিকটা জায়গা ফাঁকা। খালি অংশে গাঢ় নীল পর্দা। এই অন্ধকারে পিছন থেকে ভেসে আসে শচীর কণ্ঠের স্বর। তিনি পুত্রবধূর হাত ধরে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে আসেন এবং হারিয়ে যাওয়া ছেলেকে খুঁজে বেড়ান। এই অন্ধকার অংশটির দৃশ্যটা মনকে বিচলিত করে তোলে। এতে বোঝা যাচ্ছে একটা নাটকের মঞ্চ সাফল্যের পিছনে দৃশ্যপটের ভূমিকা কতটা।

আবার ‘দ্বিগ্বিজয়ী’ নাটকের মঞ্চসজ্জার দিকে যদি তাকায় তাহলে দেখতে পাব, নাদির শাহ যখন দিল্লীর ধ্বংসের আদেশ দিচ্ছেন তখন নেপথ্যে বিউগল ড্রাম বেজে ওঠে, বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যাচ্ছে সৈনিকদের আর্তনাদ ও আক্রান্তদের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। আর পিছনের পট লাল আলোর ধোয়ায় রঞ্জিত হয়ে ওঠে। আর যতক্ষণ এই তান্ডব ঘটছিল ততক্ষণ সামনের আলো নেভানো থাকত। আর নাদির শাহের ছায়া দেখা যায়। সেটা দর্শকদের আরো বেশি বিচলিত করে। এই সকল ঘটনার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের হা হা কার শোনা যায়। এইগুলো এত সুন্দর ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে শুধুমাত্র দৃশ্য পটের জন্য। তাই নাটকের লিখিত রূপের সঙ্গে নাট্যভিনয়ের অনেক প্রভেদ দেখা যায়। নাট্যভিনয়ের মধ্যে দিয়ে নাটকের জীবন্ত রূপ ধরা পড়ে।

শম্ভু মিত্র শিশির কুমারের কাছ থেকে নাট্যভিনয়ের অনেক শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর কাছ থেকে নাটককে কিভাবে কাটতে ও গাঁথতে হয় সেটা শিখেছেন। তার পাশাপাশি শিখেছেন নাটকে দৃশ্যপটকে অভিনয়কে কিভাবে এক নাট্যের মধ্যে ব্যবহার করা হয়।

শিশির কুমার আলো, দৃশ্যপট, অভিনয় দিয়ে থিয়েটারকে সাজিয়ে দিতেন। কিন্তু এই সূক্ষ্ম অনুভূতি তখনকার মানুষদের মধ্যে ছিল না। মানুষ থিয়েটারে অভ্যস্ত। আমরা বাঙালীরা যে একটা বাধা ধরা গভীর মধ্যে আবদ্ধ নতুনকে সহজে বরণ করে নেবার ক্ষমতা নেই। এই সকল মানুষের জন্য প্রথম নির্দেশক শিশির কুমারকে হারিয়ে যেতে হয়। তিনি মৃত্যুর পর মানুষের কাছ থেকে প্রচুর প্রশংসা কুড়িয়েছেন। কিন্তু বেঁচে থাকাকালীন মানুষ যদি সময় করে শ্রীরঙ্গমে নাট্যাভিনয়টা দেখতে যেতে তা হলে তাকে রঙ্গমঞ্চ ছাড়তে হত না।

আধুনিক নাট্যসৃষ্টিটা যদি সময় মতো চোখে না পড়ে তাহলে যে ক্ষতিটা হবে সেটা কোন দিন সামাল দেওয়া যাবে না। তাই তো শঙ্কু মিত্র বলেন—

“একটা জাতের থিয়েটার দেখেই যে জাতটাকে চিনতে পারা যায়।”^২

শঙ্কু মিত্র শিশিরকুমারকে অনুসরণ করে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়েছেন। তাঁর জীবনে এই ব্যক্তির অবদান অপরিসীম।

ব্রেখ্টের থিয়েটার (১৬৬৭):

বিদেশের রঙ্গমঞ্চে নাটক দেখার ইচ্ছা অনেক নাট্যপ্রেমির মধ্যে দেখা যায়। বিশেষ করে পূর্ব জার্মানিতে। ওখানে যাওয়ার একটি বিশেষ কারণ হল ব্রেখ্টের থিয়েটার। শঙ্কু মিত্রও অনেক কৌতূহল নিয়ে পূর্ব জার্মানিতে গিয়েছিলেন এবং ব্রেখ্টের থিয়েটারে নাট্যাভিনয়ও দেখেছিলেন। তাঁর এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথায় আমাদের আলোচ্য ‘ব্রেখ্টের’ থিয়েটার প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছে।

শঙ্কু মিত্র জানিয়েছেন, এই নাট্যশালার ছবি এবং অভিনীত নাটকের কথা অনেক শুনেছেন। সচক্ষে দেখার পর তার বিবরণ প্রবন্ধ মধ্যে ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন, এই প্রেক্ষাগৃহটি ছিল পুরানো কালের এবং এখানকার সাজসজ্জা গুলোতে প্রাচীন ঐতিহ্যের ছাপ স্পষ্ট ছিল। প্রাচীন ঐতিহ্য ধরে রাখার জন্য প্রেক্ষাগৃহের বাইরের কোনো রকম পরিবর্তন করেননি। বক্সের পাশ দিয়ে যে পরী মূর্তিগুলি আছে সেগুলি তিনি কোনো রকম বৈপ্লবিক তাড়নায় পরিবর্তন করেননি। বরঞ্চ তিনি এগুলিকে নাট্যাভিনয়ের কাজে ব্যবহার করেন। এই সকল পরীদের অনাবৃত

বগলের তলা দিয়ে দূর ক্ষেপের আলো ঝাঁলানো থাকত। তাই শম্ভু মিত্র রসিকতা করে বলেন—

“ঐ পরীগুলোর দিকে তাকিয়ে ব্রেখ্‌টের কী মনে হয়েছিলো? তাঁর মুখ টিপে হাসার যে একটা বিশেষ ভঙ্গী ছিল সেটা নিশ্চয়ই এই সময় তাঁর চোখমুখে চিকচিক করছিল!”^১

এই নাট্যসংস্থার ঘেরার মধ্যে নতুন প্রেক্ষাগৃহ বানানোর মতো জায়গা ছিল কিন্তু তিনি তা করেননি।

পণ্ডিত ব্যক্তির মনে করেন ব্রেখ্‌টের মঞ্চসজ্জা ছিল ভীষণ সরল এবং নিরাভরণ। যে পর্দাটা ব্যবহার হত সেটা পুরোপুরি ছিল না। এই সকল আলোচনা নিয়ে যখন পণ্ডিতরা ব্যস্ত ছিলেন তখন কলকাতায় মাতা কুরাজ এর চলচ্ছবি দেখানো হয়েছিল। সেখানকার দৃশ্য সজ্জাটা ছিল ফিল্মের মতো, এর দৃশ্য সজ্জা দেখে অনেকের মনে হয়েছিল এটা মঞ্চের অসম্ভব। কিন্তু সাহেবদের ব্যাপার বলে মনের কথা প্রকাশ পায়নি।

যে সকল বাংলা থিয়েটারের শিল্পীদের মধ্যে নগ্নাভরণ দেখতে পায় সেটাকে সকলের দারিদ্রের চাপ বলে মনে হয়। এরকম ঘটনা ব্রেখ্‌টের নাট্য পদ্ধতিতে দেখা যায়। কিন্তু তিনি শৈল্পিক কারণে দারিদ্র্যকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন অর্থের অভাবে নয়। তাই যখন ঐ ছবির দৃশ্য সজ্জা দেখেন তখন পণ্ডিতজনের প্রতিক্রিয়া সব তছনছ হয়ে যায়।

ব্রেখ্‌টের নাট্যকলার একটি বিশেষ দিক হল তিনি একই দৃশ্য সজ্জা বার বার ব্যবহার করতেন না। তাঁকে নানান প্রয়োজনাৎ নানান রকম দৃশ্য সজ্জা করতে দেখা যায়। শম্ভু মিত্র আমাদের একথা জানান, তিনি ‘মানুষ মানুষই’ নাটকটি দেখেন এবং তার আগে যে ছবিটা দেখেন এই দুটোর মধ্যে কোনো রকম মিল দেখতে পান না।

শম্ভু মিত্র আরো একটি নাটকের দৃশ্য সজ্জার বর্ণনা দিয়েছেন। সেটি হল শন ও কেসির লেখা ‘পার্পল ডাস্ট’ নাটকটি। এই নাটকের মঞ্চটি ছিল চব্বিশ ফুট প্রায় এবং পুরানো পাথরের দেওয়ালের মতো পট। সেখানে একটা দৃশ্যে দেখা যায় একটা রোলার দেওয়াল ভেঙে ধীরে ধীরে মঞ্চের মধ্যে প্রবেশ করেছে। দেওয়ালটা ভেঙে যাওয়া চারিদিকে ধুলোবালিতে অন্ধকার

হয়ে যায় এবং একটুখানি সময় ঝাপসা হয়ে যায়। এই দৃশ্য পটের মধ্যে আমরা বাস্তবের ছোঁয়া দেখতে পায়। এই দৃশ্যপট ছিল একে বারে অন্য রকম। বিশেষ করে আমাদের বাঙালী থিয়েটারে এরকমটা দেখা যায় না বললেই চলে।

প্রথম অবস্থায়, মঞ্চ নির্মাণের সময় যে সকল মিস্ট্রিরা কাজ করে তারাও যথেষ্ট পারদর্শী ছিল। একজন মিস্ট্রির কাজ দেখে শম্ভু মিত্র বেশ মজা পেয়েছিলেন। সে যখন ভারায় বসে কাজ করে তখন কথা বলার জন্য মুখ বের করার জন্য তাকে মাথা বুলে নেমে আসতে হয় এবং পা টা আটকানো থাকে। তাছাড়া মঞ্চটি ছিল গর্তের উপরে। তক্তা গুলো সারালেই সেটা বোঝা যায়। তার ভেতরে কাজ করা মজুরটি যখন সোজা হয়ে দাঁড়ায় তখন তার কাঁধ পর্যন্ত দেখা যায়। একবার মঞ্চ নির্মাণ করেই রেখে দেওয়া হয় না। সেগুলি মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখে নেন।

এত গেল দৃশ্য ও মঞ্চ সজ্জা ব্রেখটের থিয়েটারের। অভিনেতাদের দৈহিক ভঙ্গি কেমন হবে সেটা নির্দেশ করা হল নির্দেশকের বড় কাজ। সেই কাজে যে যত বুদ্ধির প্রয়োগ করতে পারবে তার কাজটা তত সূক্ষ্ম এবং আকর্ষিত হবে। আর এখান থেকেই তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

ব্রেখটের মঞ্চের একটি অন্যরকম জিনিস হল আলোর ব্যবহার। অন্য মঞ্চ দেখা যায় সব সময় সমান ভাবে আলোর ব্যবহার হয় না। কিন্তু তিনি আলোর ব্যবহারের কোন রকম কারিকুরি করেননি। তিনি সবসময় মঞ্চ উজ্জ্বল করে রাখতে চেয়েছেন এবং সব জায়গায় সমানভাবে আলো দিতে চেয়েছেন। হয়তো কথা সত্যি নয় কিন্তু খানিকটা সত্যের ভিত্তিতে আবদ্ধ। কিন্তু এ ধরনের মানসিকতা কেন? কারণ কুড়ির দশকে মঞ্চে আলোর কারিকুরি একটু বেশি হত। এই কারিকুরি করতে হত অনৈসর্গিক পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য। কিন্তু এই সকল সৃষ্টি করতে গিয়ে বাস্তবতা হারিয়ে যেত। তাই তিনি এমন নাটক চেয়েছিলেন যেখানে স্পষ্টতা থাকবে এবং একটি দৃশ্য অভিনীত হবে।

‘কমিউনের দিনগুলি’ এটি ছিল একটি আধুনিক নাট্য প্রযোজনা। এখানেও আলোর অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাজ লক্ষ্য করা যায়। মঞ্চে ওপর আলোর খেলা লক্ষ্য করা যায়। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাবে চারি দিক থেকে আলো এসে মঞ্চটিকে উজ্জ্বল করে তোলে। অভিনেতার চলে যাওয়ার সময় কোনো রকম ছায়া পড়ে না। প্রত্যেক আলোক ম্যান খুব দক্ষতার সঙ্গে এটি করে থাকে। আর অভিজ্ঞা লোকমাত্র বুঝতে পারেন যে পরিমাণে আলোর দরকার সেই পরিমাণ আলোর ব্যবহার হচ্ছে কিনা। এই ধরনের আলোর ব্যবহার সর্বত্র প্রচুর দেখা যায় আমাদের দেশ ছাড়া।

বেখটের থিয়েটারে অভিনয়ে এলিয়েনেশন পদ্ধতি দেখা যায়। শম্ভু মিত্র এলিয়েনেশনের অভিনয় পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন বিখ্যাত রুশি নির্দেশক শ্রীজাভাদক্ষিকে তিনি তাঁকে এই সকল বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে বারণ করেছিলেন। তিনি আর মাথা না ঘামিয়ে বিভিন্ন দেশে গিয়ে রেখটের অভিনয় দেখেছেন।

এক সময় আমাদের দেশে খুব প্রচলিত ছিল যে, স্তানিস্লাভস্কির রীতি ও বেখটের রীতি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত ও ভিন্ন। শম্ভু মিত্র এই দুই শ্রেণীর রীতির ভিন্নতা দেখার জন্য, তাদের অনুরাগীদের সঙ্গে আলাপ করেন এবং তাদের লেখা কিছু কিছু পড়েন। তিনি কোন রূপ ভিন্ন দেখতে পাননি। পূর্ব জার্মানে যখন আলোচনা সভা বসে সেখানে অনেক বিখ্যাত লোকের পাশাপাশি অনেক মঞ্চে লোক, কাগজের লোকও ছিল কিন্তু তারা কেউ বিপরীত বলেননি।

দূর থেকে গেস্টুম বা এপিক থিয়েটার এর মধ্যে আমরা পাণ্ডিত্য বা দুর্বোধ্য খুঁজে বেড়ায় সেই মুহূর্তে বেখটের কথা ভুলে যায়। তিনি সব সময় চেষ্টা করতেন কিভাবে মানুষের কাছে নাট্যটা পৌঁছাবে, এবং সেটা যাতে বেশি লোক পছন্দ করেন সেই চেষ্টা তিনি সারা জীবন করে গেছেন। শেষ পর্যন্ত এটা বুঝেছেন, তিনি থিয়েটার সম্পর্কে যে সকল কথা বলেছেন সেই কথাগুলির অর্ধেক মানে লোকে বুঝেছে আর যারা তাঁর মতের সঙ্গে সহমত প্রকাশ করেছেন তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন—

“কোনো গণিতাজ্ঞকে যদি কেউ লেখে যে মহাশয় আমি আপনার সঙ্গে

একেবারে একমত যে দুই আর দুয়ে পাঁচ হয়, তাহলে সেই গণিতজ্ঞের যে মনোভাব হবে তাঁরও সেই রকম হয়।”^২

ব্রেখ্টের তত্ত্বকে কেউ বোঝার চেষ্টা করেননি। এগুলি কে বোঝার জন্য ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে মন রেখে বুঝতে হবে। কিন্তু সেই ভাবে চেষ্টা করেনি। তার কথা গুলোকে তদন্ত করলে দেখা যায়, অনেক কথার মধ্যে দিয়ে এক একটি বিশেষ ব্যাপারে বিদ্রোহ লুকিয়ে আছে।

ব্রেখ্টের কিছু রচনার মধ্যে আমরা ব্যঙ্গের সুর দেখাতে পায়। ব্যঙ্গাত্মক যে সকল নাটক তিনি রচনা করেছেন সেখানে ব্যঙ্গের সুরটাই প্রধান হিসাবে দেখা যায়। ‘তিন পেনি গীতিনাট্য’ বা ‘মানুষ মানুষই’-এই সকল নাটকগুলিতে ব্যঙ্গের মধ্যে দিয়ে আসল কথাটা বলা হয়েছে। সিরিয়াস অভিনয়ের থেকে হাস্যরসাত্মক অভিনয় করা কঠিন অভিনেতাকে দুঃখের ঘটনাতেও দর্শকদের হাসাতে হয়। এই বৈষম্যের রীতি জগৎময় প্রচলিত, এবং যুগযুগান্তর থেকে প্রচলিত।

ব্রেখ্টের এই রকম নীতি লক্ষ্য করেছিলেন, শম্ভু মিত্র। শিশির কুমার ভাদুড়ীর ‘জীবনরঙ্গ’ নাটকের মহলা দেবার সময় সেখানে। তিনি কিছুটা দুরত্বের মধ্যে এরকম অভিনয় করে দেখান। কিন্তু তাঁরা যখন অভিনয় করতেন তখন ব্রেখ্টের তত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞান ছিল। ব্রেখ্টের প্রত্যেকটা নাটকের যেমন ‘মানুষ মানুষই’ ‘কমিউনের দিনগুলি’ ইত্যাদি যদি বিচার করা যায় তাহলে পৃথিবীব্যাপী ভালো অভিনয়ের সঙ্গে ভিন্ন, অদ্ভুত কিছু হবে না। সম্পূর্ণটাই ভালোতে পরিপূর্ণ।

শম্ভু মিত্র ভালো অভিনয়ের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, ভালো অভিনয়ের জন্য কোনো একটি নির্দিষ্ট দেশের দরকার হয় না। এটি পৃথিবীর যে কোনো দেশে, যে কোনো থিয়েটারে হতে পারে। আর সেটা দেখা মাত্রই মানুষ চিনে নিতে পারবে এটা ভালো অভিনয়। আবার অভিনয় নীতি যে কোনো রকমের হতে পারে সেটা জাপানের কাবুকির কিংবা জার্মানির ব্রেখ্টের হতে পারে।

শম্ভু মিত্র ছিলেন একজন নাট্যপ্রেমী মানুষ। তিনি ছোটবেলা থেকে নাট্য দেখতে অভ্যস্ত। তিনি আমাদের দেশে এত ভালো ভালো নাটকের অভিনয় দেখেছেন যে প্রথম শ্রেণীর অভিনেতাকে চিনতে তাঁর কোনো রকম অসুবিধা হয়নি। তিনি পৃথিবীর নানান দেশে নাট্যাভিনয় দেখেছেন এবং সেই অভিজ্ঞতায় সারা পৃথিবীর মধ্যে প্রথম শ্রেণীর অভিনয় কোনটা সেটা নির্ণয় করতে তাঁর কোনো রূপ অসুবিধা হয়নি। তিনি এই ক্ষমতা প্রাপ্তির জন্য দেশের নাট্যশিল্পীদের কাছে যথেষ্ট কৃতজ্ঞ।

শম্ভু মিত্র বাঙালী হয়েও ব্রেখটের বিদেশী নাটক দেখে তিনি যথেষ্ট মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর নাটকের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল ভাষার বৈশিষ্ট্য। সেটার সূক্ষ্মতা বোঝা সহজ ছিল না। ব্রেখট তাঁর নাটকে বাস্তবকে সাজিয়ে গুছিয়ে মিষ্টি মিষ্টি রূপ দেননি। তিনি কর্কশ, কোমল, তথ্য ইত্যাদিকে একত্রে মিলিয়ে দিতেন। তিনি নাটকে যে গানের ব্যবহার করতেন সেগুলি সহজ সরল হলেও মনকে ছুঁয়ে যেত।

শম্ভু মিত্র বলেছেন, পণ্ডিতদের কথায় বিশ্বাস না করে নিজের সহজ, স্বাভাবিক বুদ্ধি দিয়ে ব্রেখটকে দেখতে। সহজ ভাবে দেখলেই বুঝতে সুবিধা। কারণ তিনি হলেন মানবিক। আর কিছু নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষ তাঁকে অমানবিক করে তোলার চেষ্টা করেন।

‘রক্তকরবী’তে সঙ্গীত প্রয়োগ:

প্রাবন্ধিক শম্ভু মিত্র ‘রক্তকরবী’তে সঙ্গীত প্রয়োগ নামক প্রবন্ধটি ১৯৬৮ সালে রচনা করেন এবং প্রবন্ধটি ‘সম্মার্গ সপরিচয়’ প্রবন্ধ গ্রন্থে সংকলিত হয়।

শম্ভু মিত্র প্রবন্ধের শুরুতেই বলেছেন যে, ‘চার অধ্যায়’ অভিনয়ের সময় প্রথম ও শেষ অধ্যায়ের শেষে বন্দেমাতরম কথাটিতে জিগির দেওয়ার জন্য সুরের প্রয়োজন হওয়াই সেখানে সুরের সৃষ্টি করেছিলেন দেবব্রত বিশ্বাস। এছাড়াও এই অভিনয়ে আবহ সৃষ্টি করার জন্য কখনও বাড়ের শব্দ, কখনও কুকুরের ডাক, কখনও গির্জার ঘড়ির আওয়াজ ব্যবহার করা হয়েছিল। তবে ‘রক্তকরবী’ নাটকের আবহ সঙ্গীত হিসাবে কেবল কারখানা বা খনির আওয়াজ দিলে যেমন এর কাব্যগুণ নষ্ট হয়ে যাবে তেমনি যদি আবার অন্য সাধারণ নাটকের মতো সাধারণ আবহসঙ্গ

ীত প্রয়োগ করা হয় তাহলেও নাটকটির বাস্তব রূপকে ধরা যাবে না। সুতরাং দরকার এমন মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির ও অনন্য বোধশক্তির, যার মাধ্যমে সঙ্গীত ও নাট্যাভিনয় গভীরভাবে অনুভূত। শম্ভু মিত্র জানিয়েছেন, এমন অনন্য বোধশক্তির প্রমান রয়েছে শ্রীখালেদ চৌধুরীর সুরের সৃষ্টিতে। প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন—

“নাট্যের শুরু হয় একা নন্দিনীকে নিয়ে। সে মঞ্চের ওপর একটা চবুতরায় বসে ফুলের মালা গাঁথছে। এইখানে এমন একটা কিছুর দরকার হলো যাতে নাটকের একটা মানে প্রকাশ পায়। কল্পনা হলো যে এই যক্ষপুরীতে সুরকে খন্ডিত করে বেসুরের প্রতাপ খালেদ চৌধুরী টিউনিং ফর্ক নিয়ে বেরুলেন পুরোনো লোহালক্করের দোকানে খোঁজ করতে। যোগাড় করলেন গোটা কতক ভাঙা লোহার পাত। সেগুলো আলাদা পর্দায় বাজবে। সেই বাজানোর ছন্দে মাঝে মাঝে নাকড়ার উপর বাঁটা মেরে, কাঠের টুকরোর উপর কাঠি মেরে, একসঙ্গে একটা যন্ত্রের আওয়াজ তৈরী হলো। তারপর সেই বাজনটা মেলানো হলো বাঁশির সঙ্গে। বাঁশীর আওয়াজ মানুষের জীবনের উৎসারিত সুরের মতো, আর অপর আওয়াজগুলো যেন যান্ত্রিক জীবনের বেসুরত্ব। সে কেবলি বাঁশীর আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠতে চায়।”^১

শম্ভু মিত্রের মতে, নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে অনেক সময়ে চেনা যন্ত্রের চেনা আওয়াজ দর্শকের মনকে বিস্মিত করে দেয়। তাই প্রয়োজন পড়ে নতুন যন্ত্র বানানোর। এই জন্যই ‘রক্তকরবী’র একটি দৃশ্যে যেখানে সর্দারনীরা ধ্বজ পূজায় চলেছেন, সেটি নেপথ্যের ঘটনা হলেও দর্শকদের কাছে স্পষ্ট করে তোলার জন্য চিনাদের অনুকরণে কাঠের টুকরোর ভেতরটা কুরে কুরে আলাদা আলাদা সুরে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। এই বাদ্যযন্ত্রটির নাম দিয়েছিলেন ‘কাটুকুটুম’। এই যন্ত্রের সাথে ঘোড়ার গলার ঘন্টি ও নাকাড়া যোগ করে এক অনন্য সুরসৃষ্টি করা হয়। এছাড়াও ‘বহুরূপী’র লোকেরা ভাঙা ব্যাঞ্জের খোলে দোতারা বানিয়ে এমন একটা যন্ত্র বানিয়েছিল যে, যার সুর দর্শকদের চেনা মনে হচ্ছে আবার অচেনাও বোধ হয়। এই যন্ত্রের নাম দেওয়া হয়েছিল

‘ব্যান তারা’। প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন একদিন দিল্লি স্টেশনে এই ‘ব্যান-তারা’ হারিয়ে যাওয়ায় তাঁরা খুব দুঃখ পেয়েছিলেন।

এরপর প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন ‘রক্তকরবী’র রাজার ঐঁটোদের দৃশ্যে মোটা শিকলের আওয়াজের জন্য ‘ঘড়ঘড়ি’ বলে একটা যন্ত্র বানিয়েছিলেন। এই যন্ত্রটির সাথে সাথে বাঁঝ নাকাড়া ও বাঁশীও বাজানো হতো। প্রত্যেকবার নন্দিনীর ‘বিশুপাগল, পাগল ভাই’, বলে চিৎকার করে ডাকার সাথে সাথে উচ্চ সুরে বাঁশির সুর বেজে ওঠে। শম্ভু মিত্র বলেছেন—

“নাট্যের সঙ্গীত যে সমগ্র নাট্যের মধ্যে অঙ্গীভূত, সেখানে মঞ্চের ক্রিয়ার সঙ্গে সে এমনভাবে জড়িত যে রং আলো কথা সুর সব মিলিয়ে একটা অখণ্ড সত্তা পায়। সেই নিটোল সময় তৈরি হয় ‘রক্তকরবী’র বেশ কয়েক জায়গায়।”^২

শম্ভু মিত্র বলেছেন, ব্যবসার জগতে ‘সাসপেন্স মিউজিক’ বলে একটা কথা আছে। ‘নবান্ন’ নাটকের আগেই এর জন্ম স্বীকৃতি। ‘রক্তকরবী’ নাটকে একটা উৎকর্ষার দৃশ্যে অন্ধকার মঞ্চে ধীরে ধীরে একটি লাল মেঘের ছায়া ভেসে ওঠে। সেই দৃশ্যে একটি সুর বাজানো হয়েছিল নাকাড়ার গম্ভীর অথচ বিলম্বিত তালের সঙ্গে। তার সাথে একজন দুটি বাঁশি, খালেদ চৌধুরী সেতার ও আর একজন একটা বাঁঝ বাজান। এই সমস্ত কিছুই যেন নৈশব্দ শব্দের অঙ্গীভূত হয়। এছাড়াও যখন নৈবেদ্যবাহীরা মদ, পোশাক ইত্যাদি বয়ে নিয়ে যায় তখন সকলের অন্তরের ত্রাসের প্রকাশ ঘটেছে খালেদ চৌধুরীর বেহালার সুরমূর্ছনার মধ্যদিয়ে। তবে খালেদ চৌধুরী বাজানো বন্ধ করে দেওয়ায় শ্রী অসীম ব্যানার্জী তাঁর বাঁশী দিয়ে সেই জায়গাটা পূরণের চেষ্টা করেন।

এত কিছু পরে প্রাবন্ধিক দুঃখের সাথে জানিয়েছেন যে, আমাদের দেশের বিশৃঙ্খল অবস্থার জন্য এই সব অনন্য সৃষ্টির কোনো দলিল রাখা সম্ভবপর হয়নি। তিনি এই প্রবন্ধের শেষে বলেছেন—

“নাট্যের মধ্যে বাজনার ব্যবহার যে কতো মুক্ত হতে পারে এবং হলে তার ফল কী হয় তার প্রমাণ আছে ‘রক্তকরবী’তে স্বর্গীয় প্রহসন এ।”^৩

আর এ ব্যাপারে তিনি শ্রী খালেদ চৌধুরীর পদ্ধতিকে সবচেয়ে ‘উচিত পদ্ধতি’ বলে মনে করেছেন।

ন্যাশনাল থিয়েটার :

প্রাবন্ধিক শম্ভু মিত্র ১৯৬৮ সালে ‘ন্যাশনাল থিয়েটার’ নামক প্রবন্ধটি রচনা করেন। যা পরবর্তীতে ‘সম্মার্গ সপর্যা’ প্রবন্ধ গ্রন্থে সংকলিত হয়।

প্রাবন্ধিক শম্ভু মিত্র ন্যাশনাল থিয়েটার সম্পর্কে প্রথম শোনে শ্রী শিশির কুমার ভাদুড়ীর মুখে। তার আগে তিনি এই থিয়েটার সম্পর্কে ইংরাজিতে পড়ে থাকলেও সেই সম্পর্কে সম্যক বোধ তাঁর জন্মায়নি। তাঁর কাছে এটি ছিল একটি বিলিতি ব্যাপার। তবে শিশির কুমারের মুখে শুনে ন্যাশনাল থিয়েটারের একটি সম্যক রূপ তাঁর কাছে ধরা পড়ে। শিশির কুমার শম্ভু মিত্রকে জানিয়েছিলেন যে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস তাঁকে বলেছিলেন যে, তিনি দার্জিলিং যাবার আগে একটি ন্যাশনাল থিয়েটার গড়ে দেবেন। কিন্তু দার্জিলিং এ দেশবন্ধু মারা যান। ফলে তখনও বাংলাদেশে জাতীয় রঙ্গমঞ্চ তৈরি হল না। অথচ চেকোস্লোভাকিয়ার মতো ছোট্ট একটা দেশ পরাধীন অবস্থাতেই সাধারণের চাঁদায় গড়ে তুলেছিল একটা জাতীয় নাট্যশালা। পরবর্তীতে নাট্যশালাটি আঙুনে পুড়ে গেলেও পুনরায় চাঁদা তুলে সেখানেই আবার নতুন নাট্যশালা তৈরি করা হয় ঐ পরাধীন অবস্থাতেই।

আর আমাদের দেশে সরকারী অর্থে রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উপলক্ষে অনেক নাট্যগৃহ তৈরি হলেও তার বেশিরভাগই ত্রুটিপূর্ণ। আর যে সমস্ত সরকারী দপ্তর থেকে এই নাট্যগৃহগুলি নির্মিত হয়েছিল তারা স্থানীয় মঞ্চপ্রচেষ্টার কোনো সংবাদ রাখে বলে প্রাবন্ধিকের মনে হয়নি। তবে কলকাতায় রবীন্দ্রসদনটি জাতীয় নাট্যশালা রূপে পরিণত হবে বলে প্রাবন্ধিক শুনেছিলেন। প্রাবন্ধিক এও শুনেছিলেন দিল্লীর অনেক মানুষই চাইতেন যে, সেখানে একটি ন্যাশনাল থিয়েটার তৈরি হোক। আর তার জন্য সরকারী দপ্তর থেকে উদ্যোগও নেওয়া হয়েছিল। যদি সেখানে কেন্দ্রীয় আনুকূল্যে নাট্যশালা তৈরী হয় তবে তার নাম ভারতের ‘ন্যাশনাল থিয়েটার’ হবে বলেই প্রাবন্ধিকের ধারণা। আর তাতেই প্রাবন্ধিকের প্রশ্ন হল—

“তখন কলকাতার রবীন্দ্রসদন কি বাঙলা ন্যাশনাল থিয়েটার হবে? অর্থাৎ বাঙালি কি তখন আলাদা জাতি হবে? যেমন রাজনৈতিক স্লোগানে মুসলমান পৃথক জাতি বলে প্রতিপন্ন হয়েছিল?”^১

দিল্লির বহুলোক ভাবেন যে ইংল্যান্ডের মতো আমাদের দেশেও ‘ন্যাশনাল থিয়েটার’ একটি মাত্রই তৈরি হবে। আর সেটা তৈরি হবে দিল্লিতে। প্রাবন্ধিক বলেছেন—

“কিন্তু ভারতবর্ষ যে ইংল্যান্ডের চেয়ে আয়তনে কিছু বড়ো এবং যুরোপ যদি একটা ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হতো তাহলে যেমন তার একটি মাত্র ন্যাশনাল থিয়েটার হতে পারত না, তেমনি ভারতেও কেবলমাত্র দিল্লিতে একটা নাট্যশালা নির্মাণ করে তাকে ন্যাশনাল নাম দিলেই বোধহয় সেটা সত্যিই ন্যাশনাল হয়ে উঠতে পারবে না।”^২

কিন্তু প্রাবন্ধিকের চিন্তা হল, যতদিন বাংলার নাট্যসংঘের লোকেরা একে অন্যের সাথে তুচ্ছ কারণে ঝামেলায় নিযুক্ত থাকবে ততদিনে হয়তো দিল্লিতে ন্যাশনাল থিয়েটারের কাজ শুরু হয়ে যাবে। আর একবার শুরু হলে তা যে আর থামানো যাবে না, তা প্রাবন্ধিক শঙ্কু মিত্র ভালো করেই জানেন। কারণ অস্বাভাবিক খরচে নির্মিত অকর্মণ্য রবীন্দ্রনাট্যগৃহগুলোর নির্মাণও একদিন তারা আটকাতে পারেন নি। সুতরাং একবার একটা ঘটনা হয়ে গেলে তখন আর সেটাকে ওড়ানো যায় না বরং আধুনিক কালের আদর্শ দাম্পত্যজীবনের মতো মানিয়ে নেবার চেষ্টা করা হয়।

শঙ্কু মিত্র হতাশাক্লিষ্ট হয়ে জানিয়েছেন যে, দিল্লিতে ‘ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা’ নামে জাতীয় নাট্যশিক্ষণালয় আছে, যেখানে বছরে কয়েক লাখ টাকা খরচ করে হিন্দী ভাষায় অভিনয় শেখানো হয়। অথচ নাট্যসৃষ্টির দিক থেকে দিল্লী, মারাঠী বা বাংলার তুলনায় বেশি কিছু ঐতিহাসিক গুরুত্ব দাবী করতে পারে না। অথচ সেই দিল্লীতেই তৈরি হয়েছে ন্যাশনাল স্কুল আর প্রচুর টাকা ব্যয়ে তা চললেও তার দ্বারা বাংলা নাট্যপ্রচেষ্টা একটুও সহায়তা পায়নি। তাই প্রাবন্ধিক মনে করেন যে, কলকাতায় এমন নাট্যঅভিনয় শেখানোর প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন যাতে এখানকার ‘শিশিক্ষুরা’ হাতে কলমে আলোক সম্প্রাপ্ত, মঞ্চসজ্জা ও অভিনয় সম্পর্কে শিখতে পারে। আর তার ফলেই বাংলা নাট্যপ্রয়োজনার মান খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বেড়ে যাবে।

তবে উপরের উল্লেখগুলো থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, ‘ন্যাশনাল’ একটা নামমাত্র ভিন্ন ভিন্ন জনের কাছে এর অর্থও যেমন ভিন্ন, তেমনি এই থিয়েটার এর ব্যবহারও ধোঁয়াটে ও বিচারহীন। তাই প্রাবন্ধিক মনে করেন—

“কী হলে একটা প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল হয় এবং সেই ন্যাশনাল থিয়েটারটা কী ধরনের থিয়েটার, এটা আমাদের বিচার করা উচিত।

সরকারী উদ্যোগে যা করা হয় সেটাই কি ন্যাশনাল? তাহলে সরকারী খেতাব প্রত্যাখান করায় শিশিরকুমারকে অতো প্রশংসা করা হয়েছিল কেন? সে খেতাবও তো তা হলে জাতীয় খেতাব ছিলো।”^৭

কেবলমাত্র শিশিরকুমার নন, তাঁর পরে অনেকেই সরকারী খেতাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে, ‘পদ্মশ্রী’ বা ‘পদ্মভূষণ’ ইত্যাদি খেতাব সরকারী হলেও অনেকে এটাকে জাতিপ্রদত্ত সম্মান বলে মনে করেন না।

শম্ভু মিত্র জানিয়েছেন, ১৯০৮ সালে বিলেতে লাইসিয়াম নাট্যশালার সামনে শেক্সপীয়রের স্মৃতিতে একটা ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপনের দাবীতে এক জনসমাবেশ হয়েছিল। সেই সমাবেশে বার্গাড শ’ উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনিই লক্ষপতিদের কাছে টাকা চেয়ে ব্যক্তিগত ভাবে পত্র লেখেন। এর অনেক পরে বিলেতের লোকেরা চাঁদা তুলে ‘শেক্সপীয়ার মেমোরিয়াল থিয়েটার’ প্রতিষ্ঠা করে। যার বর্তমান নাম ‘রয়্যাল শেক্সপীয়ার কোম্পানী।’ একই রকমভাবে শ্রেষ্ঠীর অর্থ সাহায্য নিয়ে নিউ ইয়র্কে স্থাপিত হয়েছে লিঙ্কন সেন্টার, যেখানে প্রথম প্রয়োজনা ছিল ইলিয়া কাজানের নির্দেশনায় আর্থার মিলারের লেখা ‘আফটার দ্য ফল’। তবে মিউনিসিপ্যালিটি, বার কাউন্সিল ও বিভিন্ন রাজ্যের সাহায্য রয়েছে জার্মানীর নাট্যসৃষ্টিতে। জাপানে কাবুকি নাট্যভঙ্গীর অধঃপতন রোধ করার জন্য সেখানকার শ্রেষ্ঠীরা চাঁদা তুলে কাবুকি সম্প্রদায়গুলোকে সাহায্য শুরু করেন। আর এখানেই প্রাবন্ধিক হতাশার সঙ্গে জানিয়েছেন—

“কিন্তু বাংলাদেশে মিউনিসিপ্যালিটি বা ধনীব্যক্তির কেউই নাট্য সম্পর্কে তুলনীয় দায় অনুভব করেননি।”^৮

তবে বর্তমানে বিলেতের ন্যাশনাল থিয়েটার ও রয়াল শেক্সপীয়র কোম্পানী ইংরেজি নাট্যসাহিত্যের পথ প্রদর্শক। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে, কেবল সরকারের পয়সায় যেমন তেমন করে একটা নাট্যগৃহ চালালেই তা ‘ন্যাশনাল’ বা জাতীয় হয়ে উঠবে না। বরং জাতির মনে হওয়া চায় যে এটা তাদের জাতীয় সংস্কৃতির সম্পদ। আর তা যদি না হয় তাহলে ‘লোকরঞ্জনী শাখা’ মাত্রই ‘ন্যাশনাল’ হয়ে যাবে।

প্রাবন্ধিকের কথা থেকে জানা যায় যে, অনেকে নাকি মনে করেন যে, রবীন্দ্রসদন যদি সম্ভায় বিভিন্ন নাট্যসংস্থাকে ভাড়া দেওয়া হয় তাহলেই রবীন্দ্রসদন ‘ন্যাশনাল থিয়েটার’ হিসেবে মর্যাদা পাবে। কিন্তু কলকাতা শহর ও তার কাছাকাছি অঞ্চলে ৩৬৫টিরও বেশি নাট্যসংস্থা খুঁজলে পাওয়া কঠিন হবে না। ফলে প্রত্যেকটি সংস্থা যদি একটি দিন করে অভিনয়ের সুযোগ পায় তাহলেও ঐ একদিনে নাট্যকলার মানকে তারা কীভাবে উন্নত করবে তা নিয়ে প্রাবন্ধিকের মনে প্রশ্ন আছে। এছাড়াও কলকাতার দূরবর্তীও বাংলাদেশের অনেক নাট্যসংস্থাও রবীন্দ্রসদনের দাবীদার। তাই প্রাবন্ধিক ‘নীলদর্পণ’ থেকে উদাহরণ নিয়ে বলেছেন—

“আদ আব্দুল চুঙ্গিতে আট আব্দুল বারুদ পুরিলে কারেই ফাটে।”^৫

আর এর ফলস্বরূপ সম্পর্কে প্রাবন্ধিক বলেছেন—

“এর ফলে যারা নাট্যকর্মকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করে আত্মনিয়োগ করতে চায় তাদের তো কোনো সাহায্যই হবে না, উপরন্তু যারা থিয়েটারের ক্লাব বানিয়ে বছরে একদিন অভিনয় করেই খুশী তাদের দলকেই পুষ্ট করা হবে।”^৬

তবে শুধুমাত্র রবীন্দ্রসদনের উপর কেবলমাত্র যে নাট্যাভিনয়েরই দাবী আছে তা নয়, এর উপর নাচ, গান ও পুতুলনাচ, নৃত্যনাট্য সবারই দাবী রয়েছে। আর তাতেই রবীন্দ্রসদনের কতৃপক্ষ বলেছেন যে কেবলমাত্র নাট্যাভিনয়কেই এর মধ্যে প্রাধিকার তারা দিতে পারবেন না। এরফলে নাচ, গান, অভিনয় কোনো কিছুই উন্নতির জন্য কোনো ভিত্তি স্থাপন করা সম্ভব

হচ্ছিল না। প্রাবন্ধিক বলেছেন—

“যদি বিদেশী ব্যালে থিয়েটারের মতো এটাকে নতুন নৃত্য পরিকল্পনার জন্যে সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়া হত এবং শ্রী উদয়শঙ্করের মতো কোনো অসাধারণ শিল্পীর হাতে এই কাজের ভার ন্যস্ত হতো, ... আবার যদি এর একপেশে মঞ্চ ভেঙে বিদেশী কনসার্ট হলের মতো একে কেবলমাত্র আধুনিক বাজনার পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্র করা হতো যেখানে ভারতীয় সঙ্গীতের নতুন প্রকাশভঙ্গী আবিষ্কারের জন্যে একে অর্কেস্ট্রা সৃষ্টি করা হতো এবং সেই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার ভার যদি ন্যাস্ত হতো শ্রী আলি আকবর বা শ্রী রবিশঙ্করের মতো সঙ্গীতবিদের ওপর, তাহলেও আমরা বাংলা দেশের সাধারণ লোকেরা, রবীন্দ্রসদন কর্তৃপক্ষের কাছে কৃতজ্ঞ থাকতুম।”^৭

তবে রবীন্দ্রসদনের কর্তৃপক্ষ যদি ভাড়া দিয়েই সঙ্গীত, নৃত্য ও নাট্য—এই তিনটি কলাশিল্পের সৃষ্টির কাজেই সাহায্য করতেন তাহলে মাসে দশ দিন করে সাধারণ মানুষ এই তিনটি উচ্চমানের কলাশিল্পই দেখতে পেতেন। কিন্তু সেটা করা হয়নি। ফলে যে সমস্ত নাট্য শিল্পী বুকের রক্ত জল করে, হাড় ভাঙা পরিশ্রম করে নাট্যোন্নতির প্রচেষ্টা করে আসছেন তাঁরা রবীন্দ্রসদনকে নিজের করে ভাবতে পারেননি। বরঞ্চ রবীন্দ্রসদনকে কুৎসিত দলাদলির একটা আখড়া বলে তাঁদের মনে হয়েছে।

শম্ভু মিত্র মনে করেন যে, এখানে একটা প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, এমন একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করলে যে ব্যয়ভার কাঁধে এসে পড়বে তাঁর দায়ভার কার উপর পড়বে। তবে এক্ষেত্রে প্রাবন্ধিক বলেছেন যে, সরকারের যখন কোনো বিষয়ে খরচ করবার ইচ্ছা থাকে না তখনই টানাটানির কথা বলে অথচ অন্য কোনো স্থানে বা বিষয়ে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে তাদের বিন্দুমাত্র বাঁধে না। এর উদাহরণ হিসাবে প্রাবন্ধিক বলেছেন—বহু টাকা ব্যয় করে রবীন্দ্রসদনে যে ‘সাইক্লোরামা’ বা আকাশপট তৈরী করা হয়েছে তা ভুলভাবে ও ভুলস্থানে। খবরের কাগজ থেকে মাঝে মাঝে এও জানা যায় অনেক টাকা ব্যয় না করায় তা আবার কেন্দ্রের কাছে ফেরত চলে

যায়। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার স্থির করেছিলেন যে, রবীন্দ্র মঞ্চগুলোতে যদি নিয়মিত অভিনয় হয় তাহলে প্রতি বৎসরে তার ক্ষতির অর্ধাংশ কেন্দ্রীয় সরকার বহন করবে। আর এই ক্ষতির পরিমাণ লাখ টাকাও হতে পারে। এতেও যদি না হতো, তাহলে দেশের লোক রবীন্দ্রসদন সত্যই জাতীয় প্রতিষ্ঠান হবে এই বিশ্বাস নিয়ে চাঁদা তুলে সাহায্য করত।

প্রাবন্ধিক বলেছেন, যারা বিশ-পঁচিশ বৎসর ধরে উন্নতমানের নাট্য প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন, তারাই জনসাধারণের বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছেন। যদি তারা বিশ্বাস অর্জন করতে না পারতেন তাহলে লোকে তাঁদের অভিনয় দেখতে আসত না। নাটক অভিনয়কে জাতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ বলে মনে করতো না। আর এর জন্যই নাট্যকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন। যার মাধ্যমে নাট্যশিল্পের উন্নতির একটি সঠিক পথ খুঁজে পাওয়া।

বার্নার্ড শ কোর্ট থিয়েটারের প্রচেষ্টাকে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করে ন্যাশনাল থিয়েটারের কথা বলেছিলেন। তারপর নাট্যাভিনয়ের জন্যই মূলত সেখানে ন্যাশনাল থিয়েটার হল। কভেন্ট গার্ডেন ঢোকা উচিত বলে সেখানে কোনো ‘ডিমোক্র্যাটিক’ থিয়োরী আবিষ্কৃত হয়নি। এছাড়া জাপানেও নাচ বা গানের জন্য নয়, বরং নাট্যাভিনয়ের জন্যই ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপিত হয়েছে। অথচ আমাদের দেশে হঠাৎই ‘ডিমোক্র্যাটিক’ থিয়োরী আবিষ্কৃত হয়ে যায় অর্থাৎ অবস্থার কোনো বদল হবে না। যেমন আছে তেমনই থাকবে।

তবে যদি জাতীয় রঙ্গমঞ্চ কেবলমাত্র নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্র বলে স্বীকার করা হয়, তা হলে প্রশ্ন ওঠে যে, এ রঙ্গমঞ্চ চালাবে কারা? কাকে কাকেই বা এরমধ্যে নেওয়া হবে? প্রাবন্ধিক একে আর একটি বিবাদের ক্ষেত্র বলে মনে করেছেন। অনেকে মনে করেন যে, রেজিস্টারী নাট্যদলগুলি ভোটের মাধ্যমেই ঠিক করা হবে সবকিছু। আর প্রতিবছরই তার বদলে হবে। যাতে কেউই ‘মৌরুসিপাট্টা’ না তৈরী করতে পারে। তবে প্রাবন্ধিক এক্ষেত্রে কেবলমাত্র রেজিস্টারী দলের ভোটদানের ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করেছেন। কারণ, তার মতে, রেজিস্টারী নাট্যদলগুলির মধ্যে শখের দল এবং নাটককেই জীবনের ব্রত হিসেবে মনে করে এমন নাট্যদল উভয়ই বর্তমান। তাই কেবলমাত্র রেজিস্টারী খাতার নিরিখে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ উচিত নয়।

প্রাবন্ধিক শম্ভু মিত্র মনে করেন, যদি এমন একটা প্রক্রিয়া তৈরী করা যায়, যাতে কাজের মূল্য নেই অথচ ফিকিররাজের মূল্য আছে, তাহলে সেই প্রক্রিয়ায় সাধারণ ভালোমানুষও ফিকিরবাজ হতে বাধ্য। উদাহরণ হিসাবে তিনি একটি সুন্দর গল্প এখানে বলেছেন—বহুকাল আগে এক জমিদার বাড়িতে এক সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল যাত্রা দেখবার জন্য। সেখানে যাত্রায় রাম, সীতা এলো, দশরথের বিলাপ শেষে রামপিতৃসত্য পালনে বনে গেলো। কিন্তু সাহেব বাংলা ভাষা না বোঝায় মাঝে মাঝে তার নাক ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। এমন সময়ে আসরে হনুমানের প্রবেশ। তার লক্ষ্মবাম্প, ছেলেপুলেদের কলরবে সাহেবের ঘুম ভেঙে যায়। তিনি হনুমানের লক্ষ-বাম্প দেখে খুশী হয়ে দশ টাকা বকশিশ দেন। এরপর হনুমান চলে গেলে রাম ও সীতা এলো একে একে তাদের বিলাপ নিয়ে। সাহেব আবারও ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। এরপর অধৈর্য হয়ে সাহেব বলেন—‘বাবু কল দ্যাট হনুমান এগেন, ফির হনুমানকো বোলাও।’ পুনরায় হনুমান এসে আগের থেকে বেশি লাফ-বাপ দিয়ে আবারও দশ টাকা বকশিশ নিয়ে চলে গেল। শেষে দেখা গেল, রাম, সীতা, দশরথ, কৌশল্যা, কৈকেয়ী প্রত্যেকে একটা করে লেজ লাগিয়ে আসরে নেমে লক্ষ-বাম্প করতে লাগল।

প্রাবন্ধিক গল্পটিকে বানিয়ে বললেও। চারপাশে তাকিয়ে দেখলে এই গল্পটাকে সত্যি বলেই মনে হবে। তিনি মনে করেন যে এতটা অধঃপতনের পরে বাংলা নাট্যসংঘগুলির খানিকটা জ্ঞানোদয় হওয়া উচিত।

এরপর প্রাবন্ধিক বছর শেষে থিয়েটারগুলোকে ঢেলে সাজাবার কথা বলেছেন। রয়্যাল শেক্সপীয়র কোম্পানী শুরুতে অল্প সময়ের জন্য লোক নিয়োগ করলেও ক্রমশ তারা বুঝতে পারেন যে, তাঁদের থিয়েটারকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য একজনকেই বেশিদিন সময় দিতে হবে। তাই ১৯৬০ সালে পীটার হলকে তাঁরা আনলেন। আর তাঁর নেতৃত্বেই নানান নির্দেশকের সৃষ্টিতে রয়্যাল শেক্সপীয়র একটা বিশ্ব বিখ্যাত নাম। এছাড়াও ন্যাশনাল থিয়েটার তৈরি হলে তার দায়িত্ব পান লরেন্স ওলিভিয়ের। আবার ব্রেখট তাঁর নাট্যশালায় আমৃত্যু কাজ করেছেন। এ প্রসঙ্গে শম্ভু মিত্র বলেছেন—

“প্রতি বছর ভোট দিয়ে যদি কোনো শিশুর নতুন নতুন মা বাবা নির্বাচন করা হয় তাহলে কি সেই শিশুর পক্ষে মঙ্গল হয়? প্রত্যেক বছর যদি নতুন নতুন মা-বাবা নতুন নতুন থিয়োরীতে শিশু পালন শুরু করে তাহলে কি শিশুর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়।”^৪

একটা নাটকের চুক্তিতে সবার মধ্যে পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্য জন্মায় না। মঞ্চটাকেও নিজের বলে মনে হয় না। বরং সবাই পুনরায় নিযুক্ত হবার আশায় মালিকের মন রেখে চলার চেষ্টা করে। তবে এই নিয়মকে ভাঙার জন্য বিভিন্ন দেশ ও বিদেশের রঙ্গমঞ্চে আন্দোলন শুরু হয়েছে। শিল্পীদের পরস্পরের প্রতি যদি কোনো বোধ না জন্মায় তাহলে শ্রেষ্ঠ নাট্যাভিনয় সম্ভব নয়। আর তাই বেশিদিনের জন্য শিল্পী, নির্দেশককে নিয়োগ করতে হবে।

প্রবন্ধের শেষে এসে প্রাবন্ধিক শম্ভু মিত্র জানিয়েছেন, বাংলা নাট্যকর্মীদের এখনও অনেক কিছু কাজ বাকি আছে। সমস্ত কিছুর উর্দে গিয়ে বাংলা নাটকের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর তার জন্য এমন এক নাট্যভঙ্গী আয়ত্ত করতে হবে যা একান্তভাবে বাঙালীর তথা ভারতের। তার জন্য ন্যাশনাল থিয়েটার নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে হবে। শম্ভু মিত্র বলেছেন—

“এবং সেটা রবীন্দ্রসদনের মুখ চেয়ে নয়। জাতি তার নিজের নৈতিক জোরে জাতীয় রঙ্গমঞ্চ তৈরি করে নেবে।”^৫

প্রেমের পরিশ্রম (১৯৬৮):

এই প্রবন্ধটির মধ্যে দিয়ে শম্ভু মিত্রকে যে তাঁর নিজের কথা বলতে বলা হয়েছে তা তিনি উল্লেখ করেছেন। প্রথম দিকে তিনি ভয় পান কারণ আত্মকথা আত্মবিজ্ঞাপন হয়ে উঠবে বলে। তাছাড়া তিনি শিল্প কর্মের মধ্যে নিজেকে এমনভাবে জড়িয়ে ফেলেছিলেন যার ফলে তাঁর নিজের সম্পর্কে কিছু বলা কঠিন হয়ে যায় তাছাড়া ব্যক্তিগত আলোচনায় যেটুকু প্রমোদের সম্ভবনা যেটুকুকে মেনে নিয়ে গুন বিচার করতে হয়। শম্ভু মিত্র বারবার ‘আমি’ শব্দটি ব্যবহার করতে চাইছেন। তাই তিনি পাঠকদের বলেন তিনি এখানে এমন একজনের কথা বলছেন যিনি সম্পূর্ণ

রূপে শব্দ মিত্র নয়। কিন্তু তাঁর মধ্যে তাঁর সকল বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর চরিত্রের যতটুকু realised এবং unrealised থাকবে যাকে তিনি অন্তরঙ্গভাবে অনুভব করবে সেই লোকের কথাই থাকবে। এবং তাঁর নাম দেন ‘ক’। প্রবন্ধের মধ্যে তিনি আমির স্থানে ‘ক’ ব্যবহার করেছেন।

‘ক’ যে কেন থিয়েটারে এল একথা নিয়ে তিনি বহুবার ভেবেছেন। কোনো সময় সঠিক উত্তর পাননি। তাঁর মনে হয়েছে তিনি বুদ্ধিমান ও দেখতে সুন্দর ছিলেন না তবু কেন থিয়েটারে এসেছেন। কিন্তু তাঁর ভেতরের থিয়েটারের প্রতি একটা আকর্ষণ ছিল হয়তো সেই কারণে। অথবা থিয়েটারে মধ্যে দিয়ে দেহের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের যে সুযোগ সেটাই তাকে আকর্ষণ করেছিল সেটাও হতে পারে।

যে কারণেই হোক তিনি থিয়েটারে যোগদান করার পর নিজেকে তার জন্য প্রস্তুত করার চেষ্টা করেছেন এবং তার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। পনেরো বছর বয়স থেকে গলা তৈরী করতে শুরু করেছিলেন এবং সেটা পনেরো বছর ধরে চালিয়ে গিয়েছিলেন। একটানা দৈনিক দু’ঘন্টা কিংবা প্রায়দিন তিন-চার ঘন্টা অভ্যাস করতেন। তিনি পরে পুরানো কবিতা ও নাটকের বিশেষ বিশেষ চরিত্র আবেগময় কণ্ঠে আবৃত্তি করেছেন।

শব্দ মিত্রের এই অভ্যাস দেখে পাড়ার লোক অস্বস্তিতে ভুগতেন। একজন প্রতিবেশী আর একজন প্রতিবেশীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন—

“আচ্ছা, ওদের বাড়ির ছেলেটাকে কি কুকুরে কামড়েছে? নইলে অমন জলাতঙ্ক রুগীর মতো চেঁচায় কেন?”^১

চর্চা জিনিস ছিল নেশার মতো তিনি শুধুমাত্র তিন চার ঘন্টায় আবদ্ধ থাকতেন না। যখন সময় পেতেন তখনই কবিতার পাতার লাইন মনে করতেন। এমন কি পথে যেতে যেতে যখন মুখে ফুটে বেরিয়ে যেতো তখন তিনি ব্যাপারটা চাপা দেওয়ার জন্য কাশির শব্দও করতেন। এই ব্যাপারটা দেখে অন্যযাত্রীরা অবাক হয়ে যেতেন।

শব্দ মিত্র জানতেন ‘ক’ এর মনে কোনো রকম dedication ছিল না। সে অভিনয়ের

পাগলামিটাকে ভালোবাসতেন এবং অনেক দিন পর সে লোকের কাছে গম্ভীরভাবে এই dedication এর কথা বলেছেন। তাঁর এই গম্ভীর ভাবের জন্য অনেকে শ্রদ্ধাও করতেন। ‘ক’-র পক্ষে ছিল নেশা। সে প্রতি পদক্ষেপে চর্চা করতে করতে অনেক নতুন জিনিস আবিষ্কার করতেন। চর্চা করতে করতে তাঁর গলার মধ্যে থেকে একটা নতুন Modulation পরিচিত বেরত সেটি ছিল একদম আলাদা। সেই আওয়াজটা সে ইচ্ছা করে বের করেনি বা বের করব বলে করেনি। সেটা চর্চার ফলে তাঁর নিজের অজান্তে আচমকা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর পরিচিত লাইনগুলি তখন একটা নতুন রং পায় এবং আবেগের তীব্রতায় হঠাৎ যেন একটা মস্তুর মতো গভীর হয়ে ওঠে।

কবিতার মধ্যে যে ছন্দ থাকে সেই ছন্দের গুণে চেনা কথা গম্ভীর হয়ে ওঠে। ‘ক’ কবিতার ছবিকে আওয়াজের মধ্যে দিয়ে সব সময় ফুঁটিয়ে তোলার চেষ্টা করে, নানা রকম আবেগ ও অনুভব দিয়ে। কবিতার শব্দ আবেগ সমস্ত কিছুকে মিলিয়ে তিনি মানুষকে নেশার জগতে পৌঁছিয়ে দিতেন। সেখানে পৃথিবীর ছোটো ছোটো ঘটনাগুলিও স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় তাঁর সামনে। ‘Aldous Huxley’ একটি ঔষধ খেয়ে তুচ্ছ জিনিসের মধ্যে অসীমকে দেখতে পেতেন সেই রকম ‘ক’ নাটক বা কবিতা চর্চার মধ্যে দিয়ে সেই রকম অস্পষ্ট ফোকাসকে স্পষ্ট দেখতেন।

শব্দ মিত্র জানিয়েছেন ‘ক’ গলার চর্চা করতে করতে নতুন নতুন আওয়াজের মধ্যে দিয়ে নিজের নতুন সত্ত্বাকে আবিষ্কার করতেন। এই সকল আওয়াজ শুনে সে নিজেই ভাবতে থাকেন সে কে? অভিনয় বা আবৃত্তির মধ্যে দিয়ে যে ব্যক্তিটি প্রকাশ পাচ্ছে সেটা তিনি, নাকি দৈনন্দিন জীবনে যে ব্যক্তিটিকে তিনি চিরকাল জানেন ভেতরে থেকে সেই নাকি তিনি? আওয়াজ চর্চা করতে করতে নিজের সত্ত্বা নিয়ে দ্বন্দের মধ্যে পড়ে যান তিনি নিজেই।

‘ক’ এর এই বৈশিষ্ট্য দেখে পাঠকরা হতবাক হতে পারেন—এটা তিনি মনে করতেন। এর পাশাপাশি এও জানতেন ‘ক’ এই ঘটনার সম্মুখীন হতে অনেকটা হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন খুব সাধারণ। আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতো। চাকরি বাকরি করে হয়তো জীবন ধারণ করতেন। কিন্তু থিয়েটারের নেশা তাকে অন্যথাতে পরিচালনা করেছিল। থিয়েটারে অভিনয় করবার জন্য নিজের গলা তৈরী করতে গিয়ে কিছু কবিতা, কিছু নাটকের সংলাপের

সাহায্য নিয়েছিলেন। এই কবিতা ও সংলাপের মধ্যে অনুভূতিগুলিকে প্রকাশ করতে গিয়ে নিজের ভেতরে একটা নতুন সত্তা পেতে থাকেন। আর এই নতুন সত্তা পেয়ে সে নিজের পরিচয় সন্ধানের সমস্যায় জড়িয়ে পড়েন।

শুধুমাত্র এই টুকু কারণে শব্দ মিত্র ‘ক’-এর জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করেন না। তিনি দেখতে পেয়েছেন মানুষকে মারার জন্য জীবনের হাতে প্রচুর অস্ত্র থাকে। তাই ‘ক’ এর মাথায় আবার নতুন রকমের ভাবের উদ্ভব ঘটে। ‘ক’-এর মনে হয় কবিতা আবৃত্তি বা অভিনয়ের সময় তাঁর ভেতরে যে পরিচ্ছন্ন, সুবিন্যস্ত ও সূক্ষ্ম অনুভব সম্পন্ন ব্যক্তিটির প্রকাশ ঘটে সেটাই হল তাঁর অভিনয় সত্তা আর এই সত্তাকে প্রকাশ করতে তিনি একদিন পারদর্শী হয়ে ওঠেন। সেই মুহূর্তে জীবন তাঁকে দেখিয়ে দেয় তাঁর এই প্রকাশ ভঙ্গী বাস্তব থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছে। তখন ‘ক’-এর কাছে সব কিছু মূল্যহীন হয়ে পড়ে।

যুদ্ধের সময় অবিভক্ত বাংলা দেশে যখন ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল তখন প্রচুর লোক না খেতে পেয়ে মারা যান। অপর দিকে মজুতদারও মুনাফালোভী মানুষরা নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এই ঘটনাকে দেখে অন্য মানুষের মতো ‘ক’-এর মনে হয়েছিল অভিনয়ের মাধ্যমে ফুঁটিয়ে তুলতে। তিনি সেটা তুলে ধরার জন্য একটা ছোটো নাটিকা লেখেন এবং সেটি কোনো একটি জেলার গ্রাম্য ভাষায়। এই নাটিকার নায়ক ছিল গরীব গৃহস্থ চাষা।

এই নাটকে একটা সমস্যা দেখা দেয়। সেটি হল মহলার সময় ‘ক’ একজন দরিদ্র, দুর্দশাগ্রস্ত চাষীকে প্রকাশ করতে পারছেন না। কারণ তাঁর কণ্ঠে আবৃত্তি চর্চা করে এতটা পরিষ্কার উচ্চারণ, ও মার্জিত ভাব চলে এসেছে যে সেটা এই চাষী চরিত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। একজন মধ্যবয়সী চাষার মধ্যে থাকে সরলতা অমার্জিত কণ্ঠ, অপরিচ্ছন্ন প্রকাশভঙ্গী। এই সকল বৈশিষ্ট্যগুলি ‘ক’ কোনো মতে প্রকাশ করতে পারছেন না। ফলে চরিত্রটা জীবন্ত হয়ে উঠছে না। ‘ক’ এর পক্ষে সব থেকে দুঃখজনক ঘটনা হচ্ছে যাঁরা একে বারে নগন্য তাঁর মতো কোনো দিন অনুশীলন করেননি তারাই সহজে চাষার বাস্তবতাকে প্রকাশ করতে পারছেন। তাই ‘ক’-এর প্রশ্ন হল—

“তাহলে কি শিল্পে অনুশীলনের কোনো দাম নেই? অপরিশীলিত শিল্পীর মধ্যে যে সততা প্রকাশ পায় সেটা অনুশীলনের ফলে মারা যায়? তখন কি প্রাণের চেয়ে রূপটা বড়ো হয়ে ওঠে?”^২

এই ঘটনায় ‘ক’ এর খুব কষ্ট হয়। কারণ তখন তাঁর মনে হয় তাঁর মুখটা আর মুখ নেই মুখোশ হয়ে গেছে। তাঁর অন্তরের কষ্টটা তিনি কারোর কাছে বর্ণনা করতে পারছেন না। শুধু মাত্র ঐ দ্বিধা বিভক্ত মানুষের কতটা অনুমান করে নিতে হয় সেটাই শব্দ মিত্র জানান। শিল্পীদেবীর যে কতটা নিষ্ঠুর ‘ক’ এই প্রথম বুঝতে পারেন।

‘ক’ কিন্তু এই ঘটনার পর সব কিছু ছেড়ে পালিয়ে যাননি। আর এই গুণকে কাজে লাগিয়ে অর্থ উপার্জনও করেননি। তিনি থিয়েটারকে এতটাই ভালোবাসতেন যে এই সব কিছু মেনে থিয়েটারে রয়ে গিয়েছিলেন।

‘ক’ বুঝে ছিল শিল্পের সমস্ত প্রকাশভঙ্গী আসল মানুষ থেকে একঘাট দূরে এবং তাঁর অন্তরের কোনো নির্দিষ্ট অবয়ব রেখা সেটা থাকে। সেটি একটি amorphous এ পরিণত হয়। যার আদি প্রান্ত কোনো কিছু দেখা সম্ভব নয়। আমরা যেটুকু দেখি সেটুকু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিনিয়িত পরিবর্তন হতে থাকে। কোনো মানুষ যখন একটা প্রকাশ ভঙ্গিকে আশ্রয় করে সেটাই মানুষের পরিচয়কে সঙ্কীর্ণ করে তোলে। আর সেই ভঙ্গিটা এক সময় বিরাট এক রূপ ধারণ করে তার সামনে উঁচে হয়ে দাড়ায়। ফলে সে তখন নিজেকে খুঁজে বেড়ায়।

এই সকল সমস্যার যখন সম্মুখীন হলেন তখন তিনি তাঁর ঐ গুণ গুলিকে ভোলার জন্য চেষ্টা করেন। বাস্তব চাষা হয়ে ওঠার জন্য অপরিশীলিত অভিনেতাদের নকল করতে শুরু করেন এই নকল করতে করতে তাঁর শুধু এটাই মনে হয়েছিল—“অভিনয়টা কখন শিল্প হয়?” আবার তিনি বলেন যদি অভিনয়ের ক্ষেত্রে অনুশীলনের প্রয়োজন না হয় তাহলে সেটা আর Acting থাকে না behaving হয়ে যায়। সিনেমায় যখন পশু, পাখিদের নেওয়া হয় এবং তাদের ক্রিয়াকলাপকে নির্দেশক যখন খাপ খাইয়ে নেয় তাহলে সেটা কি Acting-এর চরম পর্যায়

এ কথা শব্দু মিত্র জানতে চান। আবার তিনি বলেন যদি কোন অকুশলী অভিনেতা সত্তা যদি behavior-এর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় তাহলে নির্দেশক সেটিকে দর্শকের সামনে প্রকাশ করতে পারেন। এবং রূপগঠন বিহীন সত্তার আবেগকে অনুভব করাতে পারেন।

মানুষ যদি সচেতন শিল্পী হতে চান তাহলে সেই সে খন্ডিত থেকে বিশিষ্ট হয়ে যেতে পারেন। কিন্তু একটা সমস্যা হচ্ছে ফিল্ম নির্দেশকরা বিশিষ্ট শিল্পী চান না। তাঁরা চান এমন এক অনভিজ্ঞ লোক যে Acting নয় behave করতে পারবে।

শব্দু মিত্র পাঠকদের জানান এই সমস্ত কারণে বিশিষ্ট শিল্পী থিয়েটার ও সিনেমার মধ্যে দিয়ে যে রোজগার করতেন সেটা তারা ক্রমশ হারাতে বসেছে। এই সকল নির্দেশকদের জন্য বিশিষ্ট অভিনেতারা আজ হারিয়ে যাচ্ছে। এই কারণ 'ক' ও হারিয়ে যেতে শুরু করে। নিজেকে কাপুরুষ বলে মেনে নেবার সংসাহস 'ক'-এর ছিল না। শব্দু মিত্র মনে করেন, একটা নিজস্ব সত্তা গঠন করাই হল এক ধরনের আদর্শ। 'ক'-এর সেই আদর্শ গড়তে যেমন সময় লাগে তেমনি সেই জায়গা থেকে, নেমে আসতেও সময় লাগে একজন বিশিষ্ট মানুষের সেখান থেকে নেমে আসতে অস্বাভাবিক লাগবেই তাই 'ক' ও পারেনি নিজেকে নামিয়ে আনতে। সে চেয়েছিল নিজের সমগ্র সত্তার মধ্যে সহজভাবে থাকতে।

'ক' তার idealized চরিত্রের জন্য অভ্যর্থিত হতে থাকলে কোথাও যেন তাঁর একটা ভয় থেকে যায় মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে বলে।

'ক' অভিনেতা হতে চেয়েছিল। সে অভিনয়ের মাধ্যমে একটা আত্মদ পেতে চেয়েছিল এবং মানুষ সেই আত্মদ দিতেও চেয়েছিল। আত্মদ নেওয়ার জন্য হৃদয়, বুদ্ধি ও দেহকে মেলাতে চেয়েছিল কিন্তু সেটা তাঁর কাছ থেকে কোথায় হারিয়ে গেছে। 'ক' জীবনে প্রচুর প্রশংসা কুড়ালেও কোথাও যেন এই তাঁর মনে হয়েছে আজ যাঁরা প্রশংসা করছেন কাল তাঁরা তাঁকে ঠক বলবে।

শব্দু মিত্র 'ক' কে অনেক দিন থেকে জানেন কারণ তিনি তাঁর আদর্শ দিয়ে 'ক' কে গড়ে তুলেছেন। 'ক' এর জয়-পরাজয়ে সব সময় তিনি তাঁর পাশে থেকেছেন। কতদিন তিনি

তাকে পরাজিত পশুর মতো বাসায় ফিরে আসতে দেখেছেন। ‘ক’ এখন বুঝেছে বারে বারে সে যেমন কোনো একটা জিনিস প্রকাশ করতে গিয়ে নানা রকম সত্য মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে তেমনি সেটা কিছুদিন পর প্রকাশের অসুবিধা হচ্ছে বলে সে নিঃশেষ করে ভাঙবে। কিন্তু এই ভাঙটাকে তিনি নিজেকে ভাঙা মনে করেন। এই শব্দ মিত্র বলেন সব কিছু ভাঙা সম্ভব হয় না এবং সব কথা ভোলা যায় না। যেটা ভোলা যায় না সেটা মৃত্যুর দিন পর্যন্ত অমর হয়ে থাকে। সাক্ষী রূপে। ‘ক’ এই অনিয়তকার মন নিয়ে বিভ্রান্তি হয়ে পড়েছিলেন। সে বুঝতে পারছে না সে এগোচ্ছে না ঘুরপাক খাচ্ছে?

শব্দ মিত্র পাঠকদের জানান—

“যদি সে (‘ক’) ঘৃণাক্ষরেও জানতো যে কেবল অভিনেতা হওয়ার জন্যে তাকে এতো দাম দিতে হবে, তাহলে সে কোনোদিন থিয়েটারে আসতো কিনা সন্দেহ।”^৩

তবুও ‘ক’ টিকে ছিল সব কিছু মেনে নিয়ে।

শব্দ মিত্র ‘ক’কে ভালোবাসতেন। তিনি দেখেছেন ‘ক’ তার আদর্শকে বাস্তব জীবনে মেলাতে পারেননি। শব্দ মিত্র তাঁর সমস্ত পাপ সমস্ত শুচিতাকেও জেনেছেন এ সব কিছু জেনেও তিনি তাঁকে ভালোবেসেছেন।

একদিন সন্ধ্যায় শব্দ মিত্র তাঁকে রাগ করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—

“তুই রয়েছিস কী করে এতোদিন থিয়েটারে? থিয়েটার তোকে কী দিয়েছে? বারে বারে শুধু তোকে ঠকিয়েছে। সার্থক করে দেবে বলে লোভ দেখিয়ে তার পরমুহূর্তেই তোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। তোর লজ্জা করে না? তুই আছিস কী করে?”^৪

এই কথাগুলো ‘ক’ ক্লান্ত ভাবে শুনে এবং ভাবে। ভেবে তাঁকে দুঃখের হাসি হেসে জানিয়েছিল কী করবে, সে যে ভালোবেসেছিল।

আমরা এই প্রবন্ধ পাঠের পরে বুঝতে পেরেছি, শম্ভু মিত্রের সৃষ্টি ‘ক’ নামক ব্যক্তিটা জীবনে আদর্শ মানুষ হলেও তাঁকে অনেক রকম ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে।

একত্র অথচ স্বাধীন হওয়ার সভ্যতা (১৯৬৯):

লোকসংখ্যার পাশাপাশি অনেক নাট্য সংস্থাও গড়ে উঠেছে। একটা প্রশ্ন এসে যায় বিভিন্ন সংস্থায় কি বিভিন্ন রূপে দেবীর প্রতিষ্ঠা করবে বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ? কিন্তু যদি সংস্থাগুলি একত্রিত হতে পারত তাহলে নানারকম সমস্যায় নাট্যসংস্থাকে পড়তে হত না। এই বিষয়েই শম্ভু মিত্র তাঁর একত্র অথচ স্বাধীন হওয়ার সভ্যতা প্রসঙ্গে নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

নাট্যদলে কিছু ব্যক্তি থাকে যাঁরা শিল্পটাকে ভালোবেসে নিস্বার্থভাবে কাজ করে যায় নাটকের জন্য যা যা প্রয়োজন যেমন—নাটক সংগ্রহ করা, জায়গা দেখা, প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা ঐ সকলব্যক্তির করেন। আর কিছু মানুষ থাকে যারা শখের জন্য আসে, আসে নিজের পরিচিতিটা বাড়াবার জন্য। একটু পরিশ্রম দেখলে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। কিন্তু তবু নাট্যানুষ্ঠান বন্ধ থাকে না। অভিনয়ের পরের দিন পত্রিকায় নাট্যসমালোচনা হয়। এই সব হওয়ার পর কিছু কিছু ব্যক্তির বলেন বঙ্গ সংস্কৃতির জন্য যা কিছু করা দরকার তা হল আবার কি? কারণ এই সকল ব্যক্তির নাট্যকলাকে ভালোবেসে ব্যবহার করে না। তাঁদের কাছে সেটা শুধুমাত্র দায়িত্ব পালন।

বর্তমান নাট্য দলের সংখ্যা অসংখ্য। এই কথা শুনে নাট্য প্রেমীদের মনে মনে আনন্দ হয়। কিছু কিছু মানুষ এই সংখ্যা ব্যবহার করে নিজের দাপটটা বাড়াতে চায় তখন সেটার গুণগত মান কমতে থাকে। তাদের মুখে নানা রকম কথা শোনা যায় যেমন—

“জানো আমি এক হাঁকে কতোগুলো লোক জড়ো করে তোমায় পিটিয়ে দিতে পারি!”^১

শম্ভু মিত্র জানিয়েছেন, গুণ না থাকলে যেমন কোনো কিছুর উন্নতি সম্ভব নয় তেমন নাট্যের ক্ষেত্রেও তাই মানুষের ক্ষেত্রেও তাই। প্রত্যেক মানুষ যদি নিজের গুণ সম্পর্কে সচেতন

হয় তাহলে সমাজের উন্নতি হবে। আমাদের মতো মানুষগুলোকে নিয়েই তো সমাজ গড়ে ওঠে। আর আমরা যদি নিজেরা অসৎ কর্ম করে সৎ সমাজ গড়ে তুলতে চায় তাহলে কিন্তু গুণফল শূন্য হবে। কারণ প্রত্যেকেই সমাজের এক একটা অংশ।

যাঁরা সরস্বতীর কাছাকাছি আসতে চায় এবং তাঁর সেবা করতে চায় তাঁদের একসঙ্গে কাজ করতে শিখতে হবে, পরস্পরকে শ্রদ্ধা করতে শিখতে হবে। তা না হলে টাইফুনের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারবে না। কোনো কিছু গড়ে ওঠার আগে ধ্বংস হয়ে যাবে।

শিল্পকলা আর ব্যবসা আলাদা আলাদা। ব্যবসার ক্ষেত্রে মুনাফা জড়িয়ে থাকে। আর শিল্পের ক্ষেত্রে থাকে সরস্বতীকে প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা।

নাট্যদলের মধ্যে কিছু কিছু নাট্যপ্রেমী ব্যক্তি থাকে যারা চাইলে সহজে মঞ্চ সংগ্রহ করতে পারে। কিন্তু তারা তা করেন না। তাঁরা চায় রুচিসম্মত বুদ্ধি চালিত নাট্যমঞ্চ সৃষ্টি করতে। যেখানে রাজনীতির কোন হস্তক্ষেপ থাকবে না। ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি থাকবে না। সেটা হবে শুধুমাত্র সামাজিক। এটাও লক্ষ্য রাখতে সমাজের নামে যেন কেউ সুবিধা নিতে না পারে।

সত্যের জন্য অনেক ভৎসনা, অনেক নিগ্রহ অনেক কুৎসা রটে। কিন্তু আমরা সকলে যদি এক হয়ে সত্যের পথ অবলম্বন করি তাহলেই মুক্তি সম্ভব। সত্য আর একতা মানুষকে লক্ষ্য পথে পৌঁছিয়ে দেয়।

পৃথিবীটা ক্রমশ ছোটো হয়ে আসছে বলে এক দেশ অপর দেশকে জানার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। আমরা স্বপ্নে দেখি রাষ্ট্রের বেড়া জাল ভেঙে দিয়ে এক দেশ অপর দেশকে একসঙ্গে বাঁচতে শেখাবে। আর থিয়েটারের ক্ষেত্রে তারা ভিন্ন হেঁসেলে থাকতে চায়? ভালো থিয়েটারে? তাহলে দেখবে একত্রে থাকতে গিয়েও কোথাও একটা প্রভেদ থেকেই যাচ্ছে। তাই শম্ভু মিত্র বলেন—

“এককালে ছিলে বারো রাজপুত্রের তের হাড়ি তাই দেশটাও গিয়েছিল। বাংলা নাট্যচেতনা কি এখনো সেই তের হাড়ির যুগ।”^২

বাংলা মঞ্চ ও অভিনয়ের বিবর্তন-রেখা (১৯৭০):

একাধারে নট-নাট্যকার, নাট্য পরিচালক ও প্রাবন্ধিক শম্ভু মিত্র তাঁর মারাঠী সাহিত্য সংঘে প্রদত্ত বক্তৃতা ‘বাংলা মঞ্চ ও অভিনয়ের বিবর্তন রেখা’ নামে ১৯৭০ সালে প্রবন্ধকারে অনুবাদ করেন। যা পরবর্তীতে ‘সম্মার্গ-সপর্যা’ প্রবন্ধ গ্রন্থে সংকলিত হয়।

প্রবন্ধের শুরুতেই প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন যে, আগে মানুষ ‘থিয়েটার’ বলতে প্রসেনিয়াম মঞ্চে প্রদর্শিত নাট্যাভিনয়কে বলত। কিন্তু বর্তমানে ‘এরীনা থিয়েটার’ বা থিয়েটার ইন দি রাউন্ড’ বিষয়ে অনেক জানার পরে এখন ‘থিয়েটার’ বলতে মানুষ বোঝে অভিনয়ের জন্য একটি মঞ্চ, যেখানে ঝালর, পর্দা, পট, সবই থাকতে পারে তবে সব অভিনয়ে সেগুলি ব্যবহৃত নাও হতে পারে। আর যাত্রা বা ঐ ধরনের নাট্যভঙ্গীকে সরকারী বা শিক্ষিত ভাষায় বলা হয় লোকনাট্য। প্রাবন্ধিক এই যাত্রা নিয়ে কৌতুকের সুরে বলেছেন—

“যাত্রা সেটা দর্শকের মাঝখানে একটি আসরে চিরদিন অভিনীত হত। সেটা কিছুদিন আগে পর্যন্ত মাত্রই একটা লোকনাট্য ছিল। অর্থাৎ খুব পুরানোও অমার্জিত একটা ফর্ম, যেটা আমরা আধুনিক বিদগ্ধজনেরা, অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে এসেছি। কিন্তু হঠাৎ সাহেবরা যখন আবার এটাকেই ‘থিয়েটার ইন দি রাউন্ড’ নাম দিয়ে গ্রহণ করেন তখন আমরাও হঠাৎ বিগলিত চক্ষে একেই আবার সবচেয়ে আধুনিক ও বৈপ্লবিক রীতি বলে স্বাগত জানাই।”^১

বাংলায় বহু প্রাচীনকাল থেকেই নাট্যাভিনয়ের প্রচলন ছিল। তবে সেই নাট্যের রূপ ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা প্রাবন্ধিকের নেই বলেই তিনি জানিয়েছেন। তবে তিনি এও জানিয়েছেন যে ভারতের নাট্যশাস্ত্রে দেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক অভিনয়রীতির উল্লেখ আছে। এর মধ্যে একটি রীতি হল ‘ওড্র মাগধী’। নাট্যশাস্ত্রের ত্রয়োদশ অধ্যায় অনুসারে এই রীতি বিহার, ওড়িশ্যা, বাংলা ও নেপালে প্রচলিত ছিল। তবে এই রীতির কতটুকু অংশ এখনও প্রচলিত রয়েছে তা গবেষকদের খুঁজে বের করা দরকার বলে প্রাবন্ধিক মনে করেন।

প্রাবন্ধিকের মতে, আমাদের বাংলায় এখনও জন্ম, বিবাহ ও বিভিন্ন ঋতুকালীন পার্বন উপলক্ষে নানা আচার অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। এই ব্রত বা আচারগুলির উদ্ভব প্রাক্‌আর্য সভ্যতায়। আর এই আর্য পূর্ব সংস্কৃতির প্রভাবই ভরতমুনি বর্ণিত ‘ওড্র মাগধী’ বলে প্রাবন্ধিকের মত। এরপরও শম্ভু মিত্র সংস্কৃত নাটক সম্পর্কে এ.বি. কীথ এর লেখা গ্রন্থ থেকে তাঁর একটি বক্তব্যকে স্মরণ করেছেন—

“নাটকের জনপ্রিয় শাখাটি যা বাংলা সাহিত্যে যাত্রা নামে বহুল পরিচিত, সেটি কিন্তু অনেক যুগ পেরিয়েও অস্তিত্ব বজায় রেখেছে, অথচ মার্জিত এবং পুরোহিত শাসিত বৈদিক নাটক কোনো উত্তরপুরুষ না রেখেই লোপ পেয়ে গেল।”^২

তিনি আরো বলেছেন যে—

“ফন শ্রয়ডারের শ্রয়ভারের মতে ‘যাত্রা ও বৈদিক নাটকের মূল এক হলেও পরে ভিন্ন ধারা অবলম্বন করেছে।”^৩

এরপর শম্ভু মিত্র যাত্রার নামকরণ প্রসঙ্গ নিয়ে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, অনেকে মনে করেন যে, রথযাত্রা, স্নানযাত্রা, সংযাত্রা ইত্যাদি পার্বন থেকেই নাট্যাভিনয়ের উৎপত্তি। তবে অন্যান্যরা মনে করেন যে, বাংলার পশ্চিম সীমান্তে কোনো উপজাতির মধ্যে যাত্রা নামে অনুষ্ঠানের প্রচলন ছিল। এই অনুষ্ঠানে অবিবাহিত তরুণ-তরুণীরা একটি খুঁটিকে ঘিরে নাচগান করত। শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর ‘বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস’ গ্রন্থে জানিয়েছেন যে, দক্ষিণাভ্যে ‘মারীযাত্রা’ নামে এক ধরনের অনুষ্ঠান দেখেছেন। এছাড়া পূর্ব সমুদ্রের তটবর্তী এলাকায় জেলেদের মধ্যে ‘যাত্রা’ নাম একটি পার্বণ প্রচলিত ছিল। এসব তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্রাবন্ধিক মনে করেন যে, নাট্যাভিনয় অর্থে যাত্রা শব্দটির উৎস হয়তো সংস্কৃত নয়, বরং সংস্কৃত পূর্ব আঞ্চলিক ভাষা থেকে গৃহীত হয়ে থাকতে পারে বলে মনে করেন। তবে অনেকে মনে করেন যে, নাট্যাভিনয়ের রূপটি প্রাক্‌ আর্য-যুগের হলেও এর নামকরণ হয়েছে পরে।

এছাড়াও মৌর্যযুগে বাংলার অনেকগুলি সমৃদ্ধনগরের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানেও হয়তো কোনো নাট্যাভিনয়ের পৃষ্ঠপোষকতা করা হতো। তবে এখনও তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

এরপর প্রাবন্ধিক বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন ‘চর্যাপদ’ এর একটি পদ উল্লেখ করেছেন—

“নাচন্তি বাজিল, গান্তি দেবী
বুদ্ধ নাটক বিসমাহেই।”^৪

এই পদ সম্পর্কে প্রাবন্ধিক বলেছেন যে, এখানে বজ্রাচার্য নাচ করছেন আর দেবী (অভিনেত্রী) গাইছেন এই হল বুদ্ধ নাটক। এর বেশি কোনো বর্ণনা এখানে নেই। নাটক সম্বন্ধে কোনো ব্যাখ্যা, আসর বা মঞ্চ কোথায় অভিনয় হতে সে সম্পর্কে কোনো বিবরণ নেই। শম্ভু মিত্র বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তিদের কথা অনুসারে জানিয়েছেন যে, সপ্তম-দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলাদেশে তিন ধরনের ভাষা প্রচলিত ছিল—১) সংস্কৃত, ২) প্রাকৃতের বিভিন্ন রূপ, ৩) সৌরশেনী অপভ্রংশ। এর মধ্যে যে কয়টি অভিনয়ের জন্য নাটক রচিত হয়েছে সেগুলির সবই সংস্কৃত ভাষায়, চর্যাগীতির ভাষায় লেখা। সাধারণের জন্য নাটকের কথা তখনও জানা যায়নি।

এরপর দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত জয়দেবের ‘গীতগোবিন্দম’-এ তৎকালীন সমাজের নানা চিত্রের পাশাপাশি তৎকালীন লৌকিক নাট্যরূপের অনেকগুলি লক্ষণ স্পষ্ট রয়েছে আর এও জানা যায় যে জয়দেব পত্নী পদ্মাবতী গীতেও নৃত্যে পটীয়সী ছিলেন। ক্ষিতিমোহন সেন বলেছেন—

“বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব সংগীত শিক্ষক মহারাষ্ট্র দেশবাসী পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী জয়দেবের মূল ঘরানার থেকে সুর এবং তাল শিখে পণ্ডিত ভাতখন্ডেকে শোনান। আচার্য ভাতখন্ডে শুনে অবাক হয়ে বলেন, ‘আরে এতো মালাবার থেকে নেওয়া।’”^৫

এই প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেছেন যে ড. নীহাররঞ্জন রায় শিখদের শ্রীগুরু গ্রন্থে জয়দেবের গুর্জরী ও মারু রাগে গীত দুটি গান তিনি গেয়েছেন। এর থেকে বোঝা যায় যে, গৌড়ীয় রীতিতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নানা প্রভাব রয়েছে।

‘গীতগোবিন্দম্’ এর পর রচিত ‘মনসামঙ্গল’, ‘চন্দ্রীমঙ্গল’, ‘কালিকামঙ্গল’ প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যগুলি নৃত্য সহযোগে গীত হত। তবে এই কাব্যগুলিতে গদ্য সংলাপের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু চৈতন্যযুগে গানের সঙ্গে কিছু সংলাপও সংযোজিত হয়েছে। তবে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, শ্রীচৈতন্যদেব ছিলেন একজন ভালো অভিনেতা। আর তাঁর প্রভাবে বৈষ্ণবধর্ম প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যাভিনয়ও প্রেরণা পেয়েছিল। এর ফলেই কৃষ্ণের নানা লীলা অবলম্বনে রচিত কৃষ্ণযাত্রা বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। এছাড়াও রামযাত্রা, শীতল যাত্রা বা ওলাবিবির যাত্রা বিখ্যাত হয়েছিল।

চৈতন্যদেবের পরবর্তী সময়ে কলকাতা যখন গুরুত্বপূর্ণ নগর হিসেবে গড়ে ওঠে, তখন বিষ্ণুপুর, বর্ধমান, বীরভূম, যশোহর এবং নদিয়া জেলায় বিভিন্ন অঞ্চলের যাত্রা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এইসব যাত্রাদলের মধ্যে পরমানন্দ অধিকারী শিশুরাম অধিকারী, লোচনঅধিকারীর যাত্রাদল উল্লেখযোগ্য। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ‘অধিকারী’ মানে মালিক। তবে এরা কেবলমাত্র মালিক নয়, বরং মালিকের পাশাপাশি নির্দেশক, পালার লেখক, সঙ্গীত নির্দেশক এবং কখনো কখনো গুরুত্বপূর্ণ অভিনেতা। তাঁদের পালাগুলির বিষয় ছিল কৃষ্ণযাত্রা, কালীদমন অথবা ভারতচন্দ্রের ‘বিদ্যাসুন্দর’। ‘বিদ্যাসুন্দর’ পালা হিসাবে রচিত হলেও পরবর্তীতে পালা হিসাবে এটি গৃহীত ও অভিনীত হয়। এর সংলাপগুলি ‘পয়ার’ ছন্দে রচিত হলেও কয়েকটি দৃশ্যে অভিনেতার মুখে মুখে সংলাপ তৈরি করায় তা মূলত গদ্যে পরিণত হত। বাকি অংশে ছিল নাচ বা গান। মূল অভিনয়ে স্ত্রীর চরিত্রে মেয়েরা না থাকলেও কুমুরে মেয়েরা থাকত।

এরপর প্রাবন্ধিক বলেছেন, কলকাতা নগরে পতনের পাশাপাশি এক শ্রেণীর বড়োলোকেরও উত্থান ঘটে। তাঁদের বাড়িতে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় মাঝে মাঝে যাত্রার আসর বসত। পরবর্তীতে কলকাতা ভারতের রাজধানী হবার ২১ বছর পর রুশ দেশীয় গেরাসিম লেবেডেফ একটি মঞ্চ নির্মাণ করেন ও ১৭৯৫ সালে নভেম্বর মাসে তারই প্রয়োজনায় ও তাঁরই তরজমা করা ইংরেজি নাটক ‘The disguise’ এর বাংলা তরজমা ‘কাল্পনিক সংবদল’ মঞ্চস্থ করেন। এই অভিনয়ে স্ত্রীর ভূমিকায় মেয়েরাই অভিনয় করেন। তবে এই অভিনয়ের সময়ে

টিকিটের হার ছিল চার টাকা ও আট টাকা। ১৭৯৫ সালে যা ছিল অস্বাভাবিক। টিকিটের মূল্য বেশি হওয়া সত্ত্বেও অভিনয় মঞ্চ সাফল্য পায়। প্রথমবারের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে লেবেডেফ পুনর্বীর অভিনয়ের জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দেন—

“দর্শকদের সুবিধার জন্য বসিবার আসন দুই শত করা হইয়াছে যাহা শীঘ্রই পূর্ণ হইয়া যাইবে। দর্শনপ্রার্থীদের লেবেডেফ এর নিকট এক স্বর্ণমোহর দর্শনী সহযোগে আবেদন করিতে হইবে। প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আবেদন পত্র গৃহীত হবে।”^৬

এই বিজ্ঞাপন দেওয়া হলেও দ্বিতীয়বার অভিনয় হয়নি। অভিনয়ের আগেই থিয়েটার আঙুনে পুড়ে যায়। প্রথমবার অভিনয়ের শেষে ‘ক্যালকাটা গেজেট’ পত্রিকায় তিনি দর্শকদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য ধন্যবাদ জানান। এরপর তিনি ইংল্যান্ডে ফিরে যান। সেখানে ১৮০১ সালে তার ‘এ গ্রামার অব দি পিওর অ্যান্ড মিক্সড ইস্ট ইন্ডিয়ান ডায়ালেক্টস’ প্রকাশিত হয়। লেবেডেফের বিদায়ের পর ১৮৩৫ সালে নবীনচন্দ্র বসুর গৃহে রঙ্গ মঞ্চ স্থাপনের আগে পর্যন্ত আর বাংলা থিয়েটারের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। তবে লেবেডেফ বলেছেন যে নাটকটির অনুবাদে তাঁর এই সাফল্য সেই অনুবাদে তাঁকে সহায়তা করেছিলেন তাঁর শিক্ষক গোলকনাথ দাস। তিনি লেবেডেফকে জানান যে, এই নাটকটি যদি তিনি অভিনয় করতে রাজি হন তাহলে গোলকনাথ দাসই দেশীয় অভিনেতা অভিনেত্রী সংগ্রহ করবেন। এই কথায় উৎসাহিত হয়েই লেবেডেফ নাটকটি মঞ্চস্থ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং তিন মাসের মধ্যে নাটকটি অভিনীত হয়। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত অভিনেতা শ্রী অহীন্দ্র চৌধুরী বলেছেন—

“লেবেডেফ স্বয়ং যখন স্বীকার করেছেন যে নাট্য প্রযোজনায় প্রথম পরিকল্পনা গোলকনাথ দাসের, তখন নিশ্চয় প্রমানিত হয় শেষোক্ত ব্যক্তির এই বিষয়ে এক ধরনের অভিজ্ঞতা ও বোধ ছিলো। দ্বিতীয়ত তিনি কোথা থেকে অভিনেতা-অভিনেত্রী সংগ্রহ করলেন যাঁদের মাত্র তিন মাসের মহলায় তৈরি করা গিয়েছিলো। তাছাড়া এই তিন মাসের মধ্যে লেবেডেফ কে নিশ্চয় রঙ্গ

মঞ্চ নির্মাণ, দৃশ্যপট-অঙ্কন ইত্যাদি ব্যাপারে অধিকাংশ সময়ে ব্যস্ত থাকতে হতো। সুতরাং অভিনেতাদের মহলা দেবার বেশির ভাগ দায়িত্ব ছিলো গোলকনাথ দাসের ওপর।”^৭

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে এই নাটকটি অভিনয় সাফল্যের সব কৃতিত্ব একা লেবেডেফের নয়, গোলকনাথ দাসেরও প্রাপ্য।

শঙ্কু মিত্রের মতে এই অভিনয়ের আগে বাংলা নাটকের বৈশিষ্ট্যগুলি হলো প্রথমত পালায় কোনো অঙ্ক বা দৃশ্য বিভাগ ছিলো না, দ্বিতীয়ত অভিনেতাদের পাট বা গান গাওয়া হয়ে গেলে আসবেই বসে পড়তেন আবার পরবর্তী দৃশ্যে প্রয়োজন মতো উঠে পড়তেন। লেবেডেফের প্রযোজিত নাট্যাভিনয়ের পরে এই রীতির পরিবর্তন শুরু হয়। আর এই পরিবর্তন প্রথম দেখা যায় ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত ‘কলিরাজার যাত্রা’য়। তবে এই বইটিতে ‘যাত্রা’ শব্দটিকে ‘নাট্যাভিনয়’ অর্থে ব্যবহৃত না করে ‘গমন’ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এই নাটকটির বিষয় হলো কলিরাজের চট্টগ্রাম থেকে কলকাতা গমন। এই নাটকে অভিনেতরা মঞ্চে প্রবেশ করতেন ও অভিনয় শেষে প্রস্থান করতেন। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, পুরানো যাত্রার চওকে ভেঙে নতুন রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। এরকম নতুন রীতির যাত্রাভিনয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১৮২২ খ্রি: অভিনীত ‘নল-দময়ন্তী’।

তবে নতুনরীতি শুরু হওয়ার পাশাপাশি নতুন নাটকগুলিতে ইংরেজি ভাষা ও সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়তে শুরু করে। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৮৩১ সালে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ‘হিন্দু থিয়েটার’ স্থাপিত হয়। এখানে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা ‘জুলিয়াস সীজার’ নাটকের অংশ বিশেষ ও উইলসন কৃত ‘উত্তররামচরিত’ অভিনয় করেন। তবে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা ইংরেজদের মতো অভিনয় করতে পারার জন্য গর্ববোধ করতেন। বৈষম্যবচরণ আঢ়, ‘সাঁসুসি’ থিয়েটারে ওথেলোর ভূমিকায় প্রসিদ্ধ লাভ করেন। ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ কাগজে এই নিয়ে লেখা হয়—

“বাংলা ভাষায় নাটক অভিনয়ের জন্য বাঙালীদের একটা মঞ্চ থাকা উচিত, যেমন আছে বোম্বাইতে গ্রান্ট রোড থিয়েটার।”^৮

পরবর্তীতে ১৮৩৫ সালে ধনী ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে রঙ্গমঞ্চ গড়ে উঠতে থাকে। ১৮৫৪ সালে প্রথম সামাজিক নাটক পণ্ডিত রামনারায়ন তর্করত্ন রচিত ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’ হল প্রথম বাংলা মৌলিক নাটক। এরপর থেকে সামাজিক কুসংস্কার ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে আঘাত করার জন্য থিয়েটারগুলি এক শক্ত মাধ্যমে পরিণত হয়।

প্রাবন্ধিকের মতে, এই সময় থেকেই যাত্রা তীব্র নাটকীয়তা তৈরীর উদ্দেশ্যে অপেরার ধরন থেকে বেরিয়ে এসে সংলাপ প্রধান হয়ে উঠেছিল। তবে ‘কুলীনকুল সর্বস্ব’ নাটকের সংলাপ কথ্য ভাষার হলেও আবেগের তীব্রতা প্রকাশের জন্য শব্দ চয়নের বিশেষ প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় না। এই কারণের জন্যই ১৮৫৮ সালে ‘রত্নাবলী’ নাটকের অভিনয় দেখে মধুসূদন দত্ত বলেছিলেন—

“রাজারা এই তুচ্ছ নাটকের জন্য কী বিপুল অর্থ ব্যয় করেছে।”^৯

এরপর তাঁর বন্ধুদের অনুরোধে তিনি লেখেন ‘শর্মিষ্ঠা’ নাটক যা ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত হয়। এর পরের বছর অর্থাৎ ১৮৬০ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর দুটি প্রহসন ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ ও ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ’। এই প্রহসনের একটির বিষয় নব্যবঙ্গ ও অন্যটি তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজ প্রসঙ্গে। দুটো নাটকই কথ্যভঙ্গিতে লেখা। ‘শর্মিষ্ঠা’ নাটকটিকে যাত্রার ঢঙে অভিনয় করানো হয় ও বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। এরপর মধুসূদন পদ্যাংশ অভিনয়ের জন্য তাঁর পরবর্তী নাটক ‘পদ্মবতী’তে নতুন অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন। অহীন্দ্রবাবু বলেন—

“মধুসূদনের ওপর থিয়েটারের দাবি তুলনায় বেশি, কেননা নাটককার রূপেই তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ এবং নাটকেই তিনি প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন।”^{১০}

প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন ঐ একই বছর অর্থাৎ ১৮৬০ সালে নীলকর সাহেবদের

অত্যাচারের বর্ণনা নিয়ে প্রকাশিত হয় দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পণ’ নাটক। এই নাটকের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশের জন্য পাদ্রি লঙের জরিমানাও হয়। আর মধুসূদনের দুটি প্রহসনই রক্ষনশীলদের চাপে পাইকপাড়ার রাজারা মঞ্চস্থ করলেন না।

প্রাবন্ধিক শম্ভু মিত্র বলেছেন—

“থিয়েটার যখনই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, যখন সমাজে তার ভূমিকা বিষয়ে সচেতন হবার চেষ্টা করে, তখনই প্রতিরোধ আসে বিভিন্ন কায়েমি স্বার্থের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে।”^{১১}

তবে থিয়েটারের প্রথম বিরোধিতা এসেছিল আমাদের সমাজ থেকে। অবশ্য ১৮৬৭ খ্রি: পর তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারও থিয়েটারের কণ্ঠরোধে সক্রিয় হয়ে ওঠে। আর এই ভাবেই শতাব্দিক বছর ধরে বাংলাদেশের রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস আবর্তিত হয়েছে।

১৮৬৮ সালে দুর্গাপূজার সময়ে একদল তরুন অভিনেতা নাটকের টানে মিলিত হয়ে দীনবন্ধু মিত্রের ‘সধবার একাদশী’ প্রহসনটি অভিনয় করলেন। এই নাটকে অভিনয় করেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ নামে ২৪ বছরের এক যুবক। যিনি রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যান এই নাটকে অভিনয়ের পর। তিনি নাটকের প্রধান চরিত্র নিমচাঁদের ভূমিকায় অভিনয় করেন। তাঁর চরিত্রের ট্রাজিক গভীরতা দর্শকদের কাছে জীবনের এক পরম অভিজ্ঞতা বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু গিরিশচন্দ্র কোনো অভিনয় শিক্ষা গ্রহণ করেননি। বরং নিজের চেষ্টায় দেশী-বিদেশী সাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চ বিষয়ে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি পাশ্চাত্য রীতি অনুসরণ করে নয় ছেলেবেলা থেকেই যাত্রা, কীর্তন এবং কথকতার অনুরাগী ছিল। বাংলা থিয়েটারে এই গিরিশচন্দ্র ছাড়াও আরো কয়েকজনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন, ‘সধবার একাদশী’ নাটকের বেশ কয়েকটি অভিনয়ের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে এই শৌখিন অভিনেতারা একটি সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার কথা ভাবলেন, যেখানে সাধারণ দর্শক তার নিজের ইচ্ছামতো টিকিট কেটে নাট্যাভিনয় দেখতে পারে। প্রতিটি অভিনয়ের

জন্য চাঁদা তোলার সমস্যা থেকে মুক্তি পাবার জন্য এই রঙ্গালয়ের পরিকল্পনা সুতরাং তৈরি হল সাধারণ রঙ্গালয়। যুবকরা নাম দিলেন ‘ন্যাশনাল থিয়েটার’। তবে এর নামকরণ ‘ন্যাশনাল’ দেওয়ার কারণ হল এর ব্যয়ভার কেবলমাত্র সেই যুবকদের বহন করার সামর্থ্য নেই। আর এই প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় তথা ‘ন্যাশনাল থিয়েটার’ এর উদ্বোধন হল ১৮৭২ সালে ‘নীলদর্পণ’ নাটক দিয়ে।

এরপর ১৮৭৫ সালে ভারতবর্ষে এলেন তৎকালীন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ‘প্রিন্স অব ওয়েলস’ যিনি পরবর্তীতে সপ্তম এডওয়ার্ড নামে পরিচিত হন। এই প্রিন্সকে জগদানন্দ নামে একজন নিজগৃহে আমন্ত্রণ জানান। এই ঘটনা নিয়ে ‘জগদানন্দ’ ব্যঙ্গনামে একটি নকশা করা হয় এবং এই নকশার জন্য দুটো গান রচনা করেন গিরিশচন্দ্র, তবে মহারানীর অনুগত এই জগদানন্দকে বিদ্রূপ করার অভিযোগে পুলিশ এই অভিনয় বন্ধ করে দেন। তৎকালীন পুলিশ কমিশনার ছিলেন মি: হগ ও পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টের নাম ছিল মি: ল্যাম। এঁদেরকে ‘শুভ্র’ ও ‘ভেড়ার পুলিশ’ নাম দিয়ে একটি নকশা লেখা ও অভিনয় হলো। এই ইংরেজ সাহেবরা বরদাস্ত করতে না পেরে ভারত সরকারের গেজেটে পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় ঘোষণা করেন—

“জনসাধারণের স্বার্থে সরকার যে কোনো নাট্যাভিনয়কে ব্যক্তিগত কুৎসা বা আক্রমণ পূর্ণ রাষ্ট্রবিরোধী অশ্লীল অথবা অন্য কোনো কারণে আপত্তিকর মেনে মনে করলেই তার অভিনয় বন্ধ করে দিতে পারেন।”^{১২}

এর কিছুদিন পর ১৮৭৬ সালে নাট্য নিয়ন্ত্রন বিল পাশ হয়।

প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন, গিরিশচন্দ্র ন্যাশনাল থিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলেও পুনরায় তাঁদের অনুরোধে তিনি পুনরায় ন্যাশনাল থিয়েটারে যোগ দিলেও ১৮৭৭ খ্রি: গিরিশচন্দ্র নিজস্ব মঞ্চ তৈরি করেন। এই মঞ্চে অভিনয়ের জন্যই ‘মেঘনাদবধ’ কাব্যের নাট্যরূপ দেন ও এটি সাফল্যের সাথে মঞ্চস্থ হয়। এই সময়েই অল্পবয়সী অভিনেত্রী বিনোদিনী জনপ্রিয় হন এবং পরবর্তীতে তিনি বাংলার মঞ্চে একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হিসাবে স্বীকৃতি পান। পেশাদারি রঙ্গ মঞ্চে স্ত্রীর ভূমিকায় মেয়েরা অভিনয় করলেও ব্যক্তিগত রঙ্গশালায় অভিনেত্রীর প্রচলন ছিল না।

প্রথম সাধারণ রঙ্গশালা বন্ধ হয়ে গেলে ১৮৭৩ সালে বেঙ্গল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠার পর থিয়েটারে অভিনেত্রীদের দ্বারা অভিনয় করানোটা রেওয়াজ হয়ে যায়। স্বভাবতই তখন অভিনেত্রীদের আনা হতো একটি বিশেষ পল্লী থেকে। কিন্তু বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হবার চার বছরের মধ্যেই বিশেষ পল্লী থেকে আগত অভিনেত্রী বিনোদিনী দাসী বাংলা রঙ্গমঞ্চের একজন অভিনেত্রীরূপে গন্য হন।

শম্ভু মিত্রের কথা থেকে জানা যায় যে, গিরিশচন্দ্র নটী বিনোদিনীকে ভালো ভালো নাটক পড়ে শোনাতেন ও তরজমা করে বুঝিয়েও দিতেন। এমনকি দেশী-বিদেশী নানা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কথা বলতেন এবং অভিনয় শিক্ষা দিতেন। বিনোদিনী ছাড়াও অনেক নট-নটীকে তিনি অভিনয় শিক্ষা দিয়েছিলেন। যার জন্য তাঁকে জীবনকালেই ‘বাংলা রঙ্গমঞ্চের জনক’ আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। এই নটী বিনোদিনী পরবর্তীতে তাঁর আত্ম জীবনী রচনা করেন যা বাংলা রঙ্গ মঞ্চের কর্মীদের পড়া আবশ্যিক বলে প্রাবন্ধিক মনে করেন।

এরপর প্রাবন্ধিক মধুসূদনের ‘মেঘনাদ বধে’র গিরিশচন্দ্রকৃত নাট্যরূপের আলোচনায় ফিরে যান তিনি বলেন—

“মধুসূদন লিখেছিলেন—

সন্মুখ সমর পড়ি বীরচূড়ামণি

বীরবাছ চলি যবে গেলা যমপুরে অকালে।”^{১৩}

গিরিশচন্দ্র দেখলেন ‘মেঘনাদ বধ কাব্য’-এর প্রতিটি পঙ্ক্তি চৌদ্দ মাত্রার হওয়ায় তা সংলাপ হিসাবে ব্যবহারে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। এরজন্য গিরিশচন্দ্র আমিত্রাক্ষর ছন্দকে ভেঙে অভিনয়ের উপযোগী সংলাপ তৈরি করলেন। আর এই কারণেই গিরিশচন্দ্রের এই সৃষ্টি সাফল্যের জন্যই এই ছন্দের নাম দেওয়া হয় ‘গৈরিশছন্দ’। এই ছন্দকে অভিনেতারা ও দর্শক সমাজ অনায়াসেই গ্রহণ করতে পারলেন। মধুসূদন যখন প্রথম আমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনা করলেন তখন তা অনেকের কাছে ‘বিদেশ থেকে আমদানি করা জিনিস’ মনে হয়েছিল। কিন্তু যখন গিরিশচন্দ্র এই আমিত্রাক্ষর

ছন্দকেই আমাদের বাকস্পন্দের সঙ্গেও সম্মতি রেখে ভাঙলেন তখনই তা আমাদের কানে দেশীয় রীতির আদিম, পুরোনো ঐতিহ্যপূর্ণ বলে মনে হলো।

প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন, গিরিশচন্দ্র কিন্তু নাট্যকার হতে চাননি, তিনি আসলে ছিলেন একজন মহান অভিনেতা। অপর একজন মহান অভিনেতা শিশির কুমার ভাদুড়ি কুড়ি বা বাইশ বছর বয়সে গিরিশ ঘোষের একটি অভিনয় দেখেন ৫২ বছর বয়সে এসেও শিশির কুমার সেই অভিনয়ের একটি দৃশ্যের কথা বলেন। এ থেকে বোঝা যায় যে তিনি কতটা মুগ্ধ হয়েছিলেন সেই মহান অভিনেতার অভিনয়ে। গিরিশচন্দ্র নাট্যকার না হতে চাইলেও বাধ্য হয়েই তিনি অনেকগুলি নাটক রচনাও করেন। তাঁর নাটকগুলির মধ্যে ‘প্রফুল্ল’, ‘বলিদান’, ‘চৈতন্যলীলা’, ‘শঙ্করাচার্য’ উল্লেখযোগ্য। তাঁর অধিকাংশ নাটকগুলিই মাইকেল অথবা দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির সঙ্গে তুলনীয় বলে প্রাবন্ধিক মনে করেন। অবশ্য গিরিশচন্দ্র যতদিন ছিলেন ততদিন তাঁর আশেপাশে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলেন না বলেই প্রাবন্ধিকের মত। তিনি থিয়েটারকে একটা মর্যাদা দিয়েছিলেন বলে কেবলমাত্র প্রমোদ-বিতরনের কেন্দ্র হয়ে ওঠায় অধঃপতন থেকে রক্ষা করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন। তিনি মারা যান ১৯২২ সালে।

গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পরবর্তীতে রঙ্গমঞ্চের অবস্থা কেমন হয়েছিল সেই সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে প্রাবন্ধিক কতগুলি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রথমত প্রাবন্ধিকের মতে, ১৮৭৬ সালের ‘নাট্য নিয়ন্ত্রন বিল’ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর ফলে রামনারায়নের ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’, মাইকেল মধুসূদনের দুটি প্রহসন ও দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসন ‘সধবার একাদশী’তে যে পথের সূচনা হয়েছিল, জাতীয়তার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের নতুন নাটক রচিত হওয়ার আগেই এই আইন বাংলা রঙ্গমঞ্চের কণ্ঠবোধ করে দেয়। সুতরাং গিরিশচন্দ্রও এই নতুন পথ থেকে সরে এসে মধুসূদনের কাব্যের নাট্যরূপ দিতে থাকেন। এছড়াও নবীন সেনের ‘পলাশীর যুদ্ধ’ ও নাট্যাকৃত হয়। এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসেরও নাট্যরূপ দেওয়া শুরু হয়। সেগুলি জনপ্রিয় হলেও শেক্সপীয়রের নাটকগুলির তরজমার ক্ষেত্রে টিকিট বিক্রি খুব কম হয়। আর এই কারণেই গিরিশচন্দ্র টিকিট বিক্রির কথা মাথায় রেখে নাটক রচনা করতে শুরু করেন। তিনি যদি নাটক

রচনা শুরু না করতেন তাহলে সাধারণ রঙ্গমঞ্চগুলিতে নিয়মিত অভিনয় বন্ধ হয়ে যেত বলে প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত থিয়েটার সম্পর্কে সাধারণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ছিল গোঁড়ামি। তাঁদের এই গোঁড়ামির কারণ হল থিয়েটারে সংগৃহীত হত গনিকা পল্লীর অভিনেত্রী। তাঁদের ধারণা ছিল যে—

“থিয়েটারের নামে একদল মাতাল এবং বেশ্যারা বেলেলাপনা করে।”^{১৪}

এই কারণেই অনেক থিয়েটারকে অচ্ছুৎ করে রাখা হয়েছিল বলে প্রাবন্ধিকের মত। সুতরাং একদিকে সরকারের রক্তচক্ষু অপরদিকে শিক্ষিত ভদ্রলোকের থিয়েটারের প্রতি তাচ্ছিল্য থাকায় সাধারণ দর্শকদের উপর থিয়েটারগুলোকে নির্ভর করতে হতো।

তৃতীয়ত, প্রাবন্ধিক রামকৃষ্ণের আগমন ও তাঁর বানীর কথা বলেছেন। সমাজ যখন অসংখ্য পথ ও মতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে তখন সমাজকে সুসংহত করার জন্য রামকৃষ্ণ আবির্ভূত হয় তাঁর গভীর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। আর তাঁর এই চিন্তা ধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পড়েন কেশব সেন, স্বামী বিবেকানন্দ। এমন বুদ্ধিজীবীদের পাশাপাশি তাঁর চিন্তাধারায় সাধারণ মানুষ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে আকর্ষিত হতে শুরু করে। আর এই নিয়ে থিয়েটারগুলিও তার একটি কেন্দ্র খুঁজে পায়। ফলে ধর্মীও বিষয় নিয়ে লেখা নাটকগুলো যে কেবলি জনপ্রিয় হলো তাই নয়, দর্শকদের মনেও প্রচণ্ড আলোড়ন তুলতে সক্ষম হল। তবে সেই সময়টাকে ধর্মীয় আন্দোলনের যুগ বলে প্রাবন্ধিকের মনে হয় না। কারণ দেশে তখন আধ্যাত্মিক উন্নতির পাশাপাশি প্রয়োজন ছিলো রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং আর্থিক উন্নয়নের। স্বামী বিবেকানন্দও এটি বিশেষভাবে অনুভব করেছিলেন বলেই তাঁর কর্মধারায় এসবের সমন্বয় দেখা গেছে। তবে গিরিশচন্দ্রের স্বাধীনতা সম্পর্কিত যে-কোনো নাটকের বিরুদ্ধেই ছিল ইংরেজ আইন। আটের দশকে গিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত হয়ে ওঠেন ও রামকৃষ্ণ বাংলা রঙ্গমঞ্চের অভিভাবক সত্তরূপে গণ্য হন।

প্রাবন্ধিকের মতে এই সময়ে বাংলা থিয়েটার শক্তি লাভ করলেও এর দুর্বলতাও ছিল। প্রাবন্ধিক বলেছেন—

“শ্রীচৈতন্য বা কবীরের সময়ে ধর্মীয় নাট্য হয়তো বৈপ্লবিক হতে পারতো, কিন্তু উনিশ শতকের শেষার্ধ্বে তার এই প্রভাব আংশিক হতে বাধ্য।”^{১৫}

শম্ভু মিত্র জানিয়েছেন ১৯৩৫ সালে বড়লাট বঙ্গবিভাগ করলে বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু হয়। থিয়েটারগুলি প্রকাশ্যে এই আন্দোলনে ভূমিকা না নিতে পারলেও গিরিশচন্দ্র ‘মীরকাশিম’ ‘সিরাজদৌল্লা’ প্রভৃতি জাতীয় নাটক মঞ্চস্থ করেন এবং এগুলো অসাধারণ সাফল্য লাভ করে। কিন্তু এই নাটকগুলোর অভিনয়ও তৎকালীন ইংরেজ সরকার নিষিদ্ধ করে দেন। গিরিশচন্দ্রের মহৎ নাট্য প্রতিভা বাংলা থিয়েটারকে একটি শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করায় বলে প্রাবন্ধিকের মত।

প্রাবন্ধিকের মতে গিরিশচন্দ্রের পর বাংলা রঙ্গমঞ্চের পুনর্ব্যবস্থা নতুন মঞ্চের সূচনা হয় শিশিরকুমার ভাদুড়ির আবির্ভাবে। তিনি কলেজের অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে দিয়ে নাট্যজগতে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন তৃতীয় দশকে। ১৯২৫ সালে যোগেশ চৌধুরীর ‘সীতা’ নাটক নিয়ে নিজস্ব নাট্যসম্প্রদায় গড়ে তোলেন এবং নাম দেন ‘নাট্যমন্দির’। শিশিরকুমারের ‘নাট্যমন্দির’ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে স্টার থিয়েটারের একটি নাট্যসংস্থা মহাসমারোহে ‘কর্ণার্জুন’ করেছিলেন। এই নাট্য সংস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন শ্রী অহীন্দ্র চৌধুরী, শ্রী দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী নরেশ মিত্র প্রমুখ। এই নাটকের প্রযোজনা ও পোশাক পরিচ্ছদ ছিল অনেক উন্নত। এছাড়াও নবাগতদের অভিনয়ের ধরন তৎকালীন পুরোনো অভিনেতাদের থেকে আলাদা ছিল। শম্ভু মিত্র শিশিরকুমারকেই প্রকৃত অর্থে বাংলা রঙ্গ মঞ্চের প্রথম নির্দেশক বলেছেন। কারণ তাঁর মঞ্চসজ্জা, পোশাক পরিচ্ছদ ছিল আধুনিক। তাঁর প্রযোজিত যোগেশ চৌধুরীর ‘সীতা’, ‘দিগ্বিজয়ী’ নাটক, শরৎচন্দ্রের ‘ষোড়শী’ এবং ‘রমা’, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের ‘নরনারায়ণ’, ‘আলমগীর’ এবং ‘রঘুবীর’ উল্লেখযোগ্য। তবে তাঁর প্রযোজিত নাটকে নৃত্য-গীতের ভূমিকা গৌণ হয়ে পড়লেও তিনিই প্রথম নন, গিরিশচন্দ্রের অনেক নাটকেও রঘু প্রধান চরিত্রের মুখে কোনো গানছিল না। আসলে শিশিরকুমার নাটকের প্রধান ঝাঁক সংগীতের চেয়ে সংঘাতে বেশি দৃষ্টি দিয়েছেন। অবশ্য ‘নাট্যমন্দিরে’ নাচগানের জন্য যে ‘সখীরদল’ ছিল তার খ্যাতি ছিল প্রভূত।

শিশিরকুমার একজন মহান অভিনেতা হলেও প্রাবন্ধিক যখন কলেজে ভর্তি হন সেখানে তিনি তাঁর সংস্কৃতের অধ্যাপকের কাছ থেকে শিশিরকুমার সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেন। শিশিরকুমার সম্পর্কে সেই অধ্যাপকের প্রধান আপত্তি ছিল যে, তাঁর অভিনয় অনেক বেশি ‘ন্যাচারাল’। কিন্তু প্রাবন্ধিক যখন শিশিরকুমারের অভিনয় দেখেন তখন তাঁর অভিনয়কে ন্যাচারালিস্টিক বলে মনে হয়নি।

শম্ভু মিত্রের মতে—

“অভিনয় অন্যান্য শিল্পকর্মের মতোই বাস্তবের প্রতিফলন এবং সেই সঙ্গে অভিনয়ে রূপ পায় আমাদের অন্তর্নিহিত অতি গোপন আশা আকাঙ্ক্ষা যা বাস্তবে পরিণত করার কামনা আমাদের মধ্যে নিহিত থাকে। যা লব্ধ ও যা অলব্ধ, এবং যা লভ্য ও যা অলভ্য, এই সব বিপরীতের বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বিকর্ষণের ফলে এক অবননীয় জটিল প্যাটার্ন তৈরি হয় আমাদের মনে, বাস্তবের ও স্বপ্নের এই নিগূঢ় সংখাতের ফলে।”^{১৬}

এই সময়ের নতুন অভিনেতা যে নতুন রীতি আনলেন তা কাব্যময় ও আবেগপ্রবণ। তবে ‘ন্যাচারালিস্টিক’ অর্থে এই অভিনয় বাস্তব ছিল না। শ্রী যোগেশ চৌধুরী এবং মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ছাড়া কারো অভিনয়ে এই স্বাভাবিকতা ছিল না বলেই প্রাবন্ধিকের মত। অথচ সেই সময়ে নাট্যকাররা ও নাট্য প্রয়োজকরা ক্রমশ বাস্তবানুকরণের দিকেই ঝুঁকিয়েছিল। তবে সামাজিক নাটকও রচিত হয়েছে। শ্রী শচীন সেনগুপ্ত অনেকগুলি সামাজিক নাটক রচনা করেছেন। কিন্তু সাধারণভাবে থিয়েটারের ‘রিয়ালিস্টিক’ প্রয়োজনার ধরনটাই নাটক রচনার প্রতিকূল ছিল।

প্রাবন্ধিকের মতে ভালো অভিনেতারও এক যুগ পর্যন্ত সংলাপের বাকস্পন্দ ও ধ্বনিমাধুর্য ধরে রাখতে পারে। তারপর তাঁর কথ্যভাষার ভঙ্গিও বদলে যেতে থাকে। এমনকি স্বরের মডিউলেশনের মানেও বদলে যায়। যদি কোনো অভিনেতার আবেগ প্রকাশের বাচনভঙ্গি দু-দশক ধরেও জীবন্ত লাগে তাহলেও তিনি অসাধারণ অভিনেতা বলে প্রাবন্ধিক মনে করেন। কিন্তু তিরিশের বা তার পরবর্তী যুগের অভিনয়ের ধারায় তৎকালীন সামাজিক স্বর পরিবর্তনের কোনো

চিহ্ন পাওয়া যায় না। সেজন্য নাটকগুলি তৈরি হতো স্থানের ও কালের নির্দিষ্টতার মধ্যে। তবে নাটকের কোনো কোনো সংলাপ বাস্তবানুগ হলেও অভিনয়ের ধরনের জন্য তা কৃত্রিম বলে মনে হতো।

প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন যে, মঞ্চ সজ্জার ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। বাস্তব বার বার চেষ্টা করা হলেও কখনো বাস্তব বলে মনে হতো না, এর ফলে রিয়ালিস্টিক ধরনটা খুব কৃত্রিম লাগতো। আর এই কারণেই নবনাট্যধারা তিরিশে এসেই প্রিয়মান হয়ে যায়। যদিও এই ধারার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন শিশিরকুমার। তাঁর অভিনয় প্রাবন্ধিকের দেখা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অভিনয়গুলির সঙ্গে তুল্য বলে মনে হয়েছে। অথচ শেষদিকে এসে তিনি তাঁর ক্ষমতার উপযুক্ত নাটক পাননি। ফলে তাঁর শক্তির বিকাশও পুরোপুরি হয়নি। অবশ্য বৃদ্ধ বয়সে তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভূমিকায় অভিনয় করেন।

প্রাবন্ধিকের মতে ইউরোপে রিয়ালিস্টিক আবির্ভাবের একটি পটভূমি আছে। আর তা হল বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যদিয়ে বাস্তব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা। যন্ত্র শিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে চিত্রশিল্পী, লেখক ও মঞ্চশিল্পীদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে কিন্তু আমাদের দেশে এমন কোনো অবস্থা ছিল না, ফলে পশ্চিমের নাট্যরীতিকে অনুসরণ করলেও নাট্যকার ঐ রীতিতে দেশের বাস্তবরূপকে ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। তবে এর ব্যতিক্রম হলেন রবীন্দ্রনাথ। শঙ্কু মিত্র বলেছেন—

“তিরিশের শুরুতেই জগদ্ব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট, বেকার সমস্যা, স্বাধীনতা আন্দোলনের তীব্রতা, মুসলিম লীগের প্রসারণ এবং তারই ফল হিসেবে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক অবিশ্বাস-এর কোনো অভিঘাতের জন্যই থিয়েটারের প্রস্তুতি ছিলো না। আর চল্লিশের শুরুতেই থিয়েটারকে দেখাতে লাগলো প্রাণহীন উদ্যমহীন লুপ্তযৌবনের মতো।”^{১৭}

এই সময়ে রঙ্গমঞ্চ নতুন আন্দোলনের ঢেউ ওঠে। পেশাদারি রঙ্গমঞ্চগুলি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। আর এর উপলক্ষ হল পঞ্চাশের মঘসত্তর। প্রথম যে নাটকটি জনসাধারণের মনে

সাড়া জাগালো, তা হলো ১৯৪৪ সালে নবনাট্যধারার ‘নবান্ন’ নাটক। গণনাট্য সংঘ অনেক তরুণ-তরুণীকে আকর্ষণ করেছিল। তাঁরা বুঝেছিল থিয়েটারের সামাজিক ভূমিকার কথা। তাঁদের নিষ্ঠা আর আনুগত্যেই সম্ভব হয়েছিলো এর ঐতিহাসিক প্রযোজনার। এই ‘নবান্ন’ নাটকে ছক কাটা কোনো গল্পের কাঠামো ছিল না, যাকে কেন্দ্র করে চরিত্রের মধ্যে সংঘাত তৈরি হয় বা ঘটনা চরমে ওঠে। অথচ এটাই ছিলো সে যুগের ‘বাস্তববাদী’ নাটক লেখার রীতি। দ্বিতীয়ত, এই নাটকের মধ্গসজ্জা বাস্তবানুগের পাশাপাশি একই দৃশ্যে দুটি ভিন্ন স্তরের প্রয়োগ হয়। নাটকটির অভিনয়রীতি তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত অভিনেতাদের রীতির চেয়ে অনেক বেশি স্বাভাবিক ছিল। এই স্বাভাবিকতায় মাধ্যমেই অনেক গভীর কার্যমুহূর্ত সৃষ্টি হয়েছে। প্রাবন্ধিক বলেছেন—

“নবান্নের অভিনয় আরও প্রমান করলো যে অভিনেতার পক্ষে কবিতায় কণামাত্র বিসর্জন না দিয়ে, একটুও কৃত্রিম না হয়ে, সবাক ও আবেগময় হওয়া সম্ভব।”^{১৮}

‘নবান্ন’ নাটকের সার্থকতা এই নাটকের সাথে জড়িত সকলেই বুঝেছিলেন তা নয়, যদি তা সম্ভব হত তাহলে হয়তো নাটকটি বিপুল সাফল্য লাভ করত। ১৯৫৮ সালে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের কোনো শক্তি এই নাটককে বিশেষ রাজনৈতিক প্রচার বলে চালাতে চাইলেন। ‘বহুরূপী’ নামে ১৯৪৮ সালে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে আরো অনেক নাট্য সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা হল ‘নতুন ইহুদি’। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের কাহিনী।

এরপর প্রাবন্ধিক নাট্যকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কারের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন—

“যতদিন আমরা পশ্চিমীরীতির মাপকাঠিতে রবীন্দ্রনাথকে বিচার করবার চেষ্টা করেছি ততোদিন তাঁকে অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য বলে মনে হয়েছে। কিন্তু নবান্নকে কেন্দ্র করে যে নতুন নাট্য ধারার সূচনা, তার লক্ষ্য ছিল এমন এক নাট্যরূপের যা একদিকে যেমন আধুনিক, অপরদিকে তেমনি বিশিষ্ট ভাবে

ভারতীয় এবং এই বুদ্ধিদীপ্ত ভারতীয় থিয়েটার গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষাই এই নাট্যকর্মীদের রবীন্দ্রনাথের নাটক মঞ্চস্থ করার বিশিষ্ট নাট্যরূপে পৌঁছে দিয়েছে।”^{১৯}

প্রাবন্ধিকের মতে, রবীন্দ্রনাথের নাটকের গঠন যেন আমাদের দেশীয় যাত্রার সাথে মেলে। তবে তার অনুকরণ তিনি করেননি।

প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন যে, এই সময়ে শ্রী বাদল সরকারের নাটক নিয়েও প্রচুর উৎসাহ ও আলোচনা লক্ষ্য করা গেছে। এই সময়েই ব্রেখ্ট, ইয়োনেক্সো, টেনেসি ইউলিয়ামস, এডওয়ার্ড অলরি প্রমুখের নাটকের তরজমা অভিনীত হচ্ছে। তবে এই সময়ে নতুন নাটক রচিত হলেও নতুন যুগের সূচনা করার মতো নাটক সৃষ্টি হয়নি। আরও একটি সমস্যা হল ‘অন্য থিয়েটার’ ও ব্যবসায়িক থিয়েটারের মধ্যে বিভেদটা যেন লুপ্ত হয়ে যেতে বসেছে। খ্যাতির জন্য অনেক অভিনেতা ও প্রযোজক ব্যবসায়িক থিয়েটারে যোগ দিতে থাকে। ফলে থিয়েটারের আবহাওয়া হতে থাকে কলুষিত। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা নাট্যজগতের বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ। স্বাধীনতার পর থেকে লাখে লাখে উদ্বাস্তুদের আগমনে রাজ্যের অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে। ফলে শিল্পীরাও হারিয়ে ফেলেছেন তাঁদের কেন্দ্র।

এত সমস্যার মধ্যেও প্রাবন্ধিক আশা করেন যে, এর মধ্য থেকেই উদ্ভীর্ণ হয়েই একদিন জন্ম নেবে নতুন সমাজ। আর তখন থিয়েটারও আসবে তার নতুন রূপ নিয়ে, আরো উন্নত বোধ ও প্রখর চেতনা নিয়ে। আবার তিনি এও মনে করেন—

“কিংবা এবার হয়তো উন্নততর নাট্য জন্ম নেবে ভারতের অন্য কোনো ভাষার মাটিতে, বাংলায় নয়।”^{২০}

আলোচনার পরিশেষে এসে বলা যায় যুক্তি বোধ, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণধর্মীতা, সমকাল চেতনা তাঁর প্রবন্ধগুলিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। নাট্য নির্দেশক, নাট্য সম্পাদক, নাট্য সংগঠক, নাট্য ইতিহাসবিদ শম্ভু মিত্রকে চিনতে হলে উক্ত প্রবন্ধগুলি সবচেয়ে বড়ো সহায়ক।

ব্রাত্যের স্বপ্ন (১৯৭১):

১৯৪২-১৯৪৩ এই সময় বাংলা থিয়েটারে একটু অন্য স্বাদের নাট্যরচনার সূত্রপাত হতে দেখা যায়। অন্য ধরনের নাটক লেখা ও অভিনয় করার যুগের সূত্রপাত এই সময়টা। এই সময়ে যে পরিবর্তনের টেডে দেখা দিয়েছিল সেটার কি কারণ সে নিয়ে কেউ কোনরকম কথা লিখেননি। শুধুমাত্র কিছু কিছু বিষয় দেখে বোঝা গিয়েছিল কিছু পরিবর্তন হয়েছে।

এই সময়ের আগে নাট্য জগতে নতুন নতুন ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। এই নতুন নতুন নাট্য শিল্পীরা তাঁদের নতুন ভাবনা চিন্তাকে প্রকাশ করার জন্য সাধারণ রঙ্গালয়কে পেয়েছেন। এই সাধারণ রঙ্গালয় মানুষের কাছে ‘পাবলিক থিয়েটার’ নামে পরিচিত। এই রঙ্গালয়ে প্রত্যেক মানুষের অবাধে প্রবেশের অধিকার ছিল। কিন্তু এর পূর্বে রাজা জমিদারদের বাড়িতে অনেক রঙ্গালয় গড়ে উঠতে দেখা যায়। এগুলি ‘সখের থিয়েটার’ নামে পরিচিত ছিল। এখানে শুধু রাজা বা জমিদারের কাছের মানুষ আর নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরাই যেতে পারতেন। এর ফলে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হত। আর তখন তাদের কথা ভেবে সাধারণ রঙ্গালয় গড়ে ওঠে। আর এই রঙ্গালয়ে নাট্য যা কিছু চেষ্টা ও চর্চা হয়ে থাকত।

এই সকল থিয়েটারের পাশাপাশি আর এক ধরনের থিয়েটার দেখা যায় সেটি শৌখিন থিয়েটার নামে পরিচিত। মুখে মুখে সেটি অ্যামেচার নামে পরিচিত। এই থিয়েটারের পয়সা নিয়ে অভিনয় দেখানো হত না। এই থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন সমাজের কোনো ধনী ব্যক্তি আর তিনি নিজেই সমস্ত ব্যয় ভাব বহন করতেন। এই থিয়েটারে অনেক সময় দেখা যেত নটনটীদের নিয়ে গিয়ে মদ্যাদি সহযোগে পেশাদারী থিয়েটারের করা কোনো নাটক অভিনীত হত। তবে সব শৌখিন সম্প্রদায় এরকম ছিল না।

আমরা দেখেছি সাধারণ রঙ্গালয় প্রথম নাট্য চর্চা শুরু হয়। ১৯৪৩-৪৪ সালের মধ্যে একটা নির্ণাবান নাট্যচর্চা শুরু হতে দেখা দিয়েছি বাংলায়। নির্ণাবান নাট্য চর্চার ফলে যে সকল নাটকগুলি সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলি সাধারণ রঙ্গালয়ের পক্ষে সুবিধার ছিল না কিংবা রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষদের মনে হত এগুলি পাবলিকরা মেনে নেবে না। নতুন চিন্তা ভাবনা তুলে ধরার মতো

ক্ষমতা সাধারণ রঙ্গালয়ের ছিল না। আর এর ফলেই পেশাদারী থিয়েটারের উদ্ভব হল সাধারণ রঙ্গালয় থেকে।

শুনেছি বিলেতে কিছু কিছু খেলাতে পেশাদারী ব্যক্তিদের নেওয়া হত না। আমোচার থিয়েটারেও তেমনটা দেখা যায়। কিন্তু এই সময়ের অর্থনৈতিক পটভূমিকায় যে সকল নাট্যকর্মীদের আর্বিভাব হয়েছিল তাঁরা ঠিক অন্যরকম ছিল। তাঁদের মধ্যে নতুন কিছু করে দেখাবার চেষ্টা ছিল। আর এরফলেই পেশাদারী রঙ্গালয়গুলির রূপ বদলাতে থাকে এবং সেগুলি স্পষ্ট হতে থাকে। রূপ স্পষ্ট হওয়ার পাশাপাশি মানুষের মুখে মুখে আনার জন্য তাঁদের নামের প্রয়োজন হয়। ‘ব্যবসায়িক রঙ্গমঞ্চ’ নামে এগুলি পরিচিত হতে থাকে।

১৯৪৩-৪৪ সালে যে নতুন চর্চা শুরু হয়ে ছিল তার নতুন রূপ পায় ১৯৫৪-৫৫ সাল থেকে।

ষাট থেকে সত্তরের দশকে সামাজিক বিশৃঙ্খলার একটি রূপ দেখা যায়। এই বিশৃঙ্খলা বীজ অনেক দিন থেকেই রোপন হয়েছিল। কিন্তু মানুষ টের পায় বিকট রূপ ধারণ করার পর। আর এই রকম মুহূর্তে নতুন স্তরের প্রয়োজন আমাদের দেশের মানুষের চেতনায় কড়া নেড়েছে।

আমাদের দেশের অবস্থা এতো জটিল যে এর ডালপালার নাগাল পাওয়া অসম্ভব। এর শিকড় এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে চাইলেও উপড়ে ফেলতে পারবে না। দেশের এই জটিল অবস্থা থেকে চাইলেও কোনো রকম ভাবে পিছু ছাড়াতে পারবে না। দেশের এরকম অবস্থা ঘটেছে শুধুমাত্র সত্যকে স্বীকার করার জন্য নয়, সত্য থেকে মুখ লুকিয়ে রাখার জন্য। আমরা ‘এবং ইন্ডিজিৎ’ নাটকে ইন্ডিজিৎ নির্মল নাম নিয়ে মুখ লুকিয়ে রাখতে দেখি আবার দেখা যায় একটা আহত রক্তাক্ত ছেলে সারাদিন রাস্তায় পড়ে ‘জল জল’ করে গোঙায় কিন্তু কেউ জল দিতে পারে না। এই সত্যটা লেখার মতো সাহস নাট্যকার পায় না অভিনেতারা বিপদের ভয়ে অভিনয়ও করতে পারে না। তাছাড়াও আরো কারণ আছে—

“দেখে মনে হয়, মানুষেরা যতো বিখ্যাত হয়, যতো বয়স্ক হয়, ততো নানাদিকে

তাদের জীবনটা লম্বী হয়ে যায় ফলে, তারা একটু সাবধানে চলাটাই শ্রেয় মনে করে।”^১

অল্পবয়সী ছেলেদের অল্পতেই মাথা গরম হয়ে ওঠে। তাই তারা উক্তি করাটাকে বিদ্রোহের চরম অভিব্যক্তি বলে মনে করেন, এরা একটা বয়স পর্যন্ত non-conformism এর বিগ্রহ মূর্তিমান ধারণ করে ঘুরত। কিন্তু পরে তাদের স্থিত অবস্থায় দেখতে পায়।

সাধারণ রঙ্গালয় বা পেশাদারী রঙ্গালয় এর বাইরের যে নাট্য প্রচেষ্টা চলছিল সেটা কোথাও ঠাঁই হয়ে যায়। যথার্থ নাট্যশিল্পীরা যদি নেশা আর পেশা কে এক করতে না পারে তাহলে বাংলার নাট্য সৃষ্টিটা নতুন স্তরে যেতে পারবে না।

যার চরিত্রের মধ্যে বিদ্রোহ করার ক্ষমতা আছে তার বাস্তব বোধ বেশি হয়। আর যে শিল্পী বাস্তবকে নাট্যরূপ দিয়ে প্রকাশ করবেন তাঁর সত্যবাদীতার রূপ স্পষ্ট উঠে আসে। তাইতো শম্ভু মিত্র বলেছেন—

“আজকের এই সেই হারানো যুগের মধ্যে আমি এই আশাকরি এই কল্পনা করি আর তাই বাংলা নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করাটা আমার কাছে এতো জরুরী।”^২

যা দেখেছি (১৯৭২):

শম্ভু মিত্র এই প্রবন্ধটি ১৯৭২ সালে রচনা করেন। ভারতবর্ষের কোথায় কী রকম ধরনের নাটকের অভিনয় হচ্ছে সেইসব কথা তুলে ধরেছেন।

শম্ভু মিত্র জানার চেষ্টা করেছেন পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে কি ধরনের নাটক হচ্ছে। কিভাবে কাজ করছে তাঁরা এবং কিভাবে আধুনিক ঐতিহ্যের মিলন ঘটাচ্ছে এই সব খবর রাখাছিলেন। তার জন্য আগে জানা দরকার ছিল লোকনাট্যের প্রকরণটা। না হলে নাট্য কৃতি যেভাবে চলছে তার থেকে তাঁরা হয়তো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। তাছাড়াও ভালো জিনিস দেখা এবং সেটা মনের খাতায় জমা রাখার লোভটা থেকে তিনি নিজেকে বঞ্চিত করতে চাননি। তাই তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরেছেন এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

শম্ভু মিত্র জানিয়েছেন তিনি একটি ‘মারাঠী’ ‘তামাসা’ দেখেছিলেন। সেখানে রূপারোপ ছিল আশ্চর্য ধরনের। তিনি জানান, তাঁদের অভিনয় ছিল খুব সহজ এবং সাবলীল। সেটা দেখে তিনি মুগ্ধ হন এবং তিনি বলেন—

“ঐ বৃদ্ধ অভিনেতা যদি বিলেতের বা জার্মানীর বা ঐরকম কোনো দেশের হতেন তাহলে তাঁর আশ্চর্য অভিনয় কৌশল সম্পর্কে অজস্র লেখা হোত, বই বেরুতো, এবং আমরা ... সেগুলো পড়ে কী করতুম?”^১

শম্ভু মিত্র হাথরাসের দলের ‘নৌটাক্কি’ দেখেছিলেন যেখানে একজন অভিনেতার অভিনয় দেখে মুগ্ধ হন। আর সেই সঙ্গে তিনিও ছিলেন নাট্যশ্রেমী মানুষ, তাই অভিনয়ের পর সেই অভিনেতাকে ধন্যবাদ জানাতে গিয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি তাঁর সঙ্গে ঠিক মতো কথা বলতে পারেননি। কারণ নির্দর্শকের সঙ্গে তাঁর কলহ হয়েছিল সেটা তিনি পরে জানতে পারেন। পরে তিনি তাঁর সঙ্গে বহু বার দেখা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু সেটা হয়ে ওঠেনি।

শম্ভু মিত্র দিল্লী গিয়েছিলেন এবং সেখানে ‘অভিযান’ নাট্যগোষ্ঠী গান্ধিজীর হত্যা নিয়ে একটা নাটক করে ছিলেন। সেটা দেখে তিনি মুগ্ধ হন। সেই নাটকে ছিল একটা গুপ্তগোষ্ঠী গান্ধিজীকে হত্যা করবে না করবে সেই নিয়ে একটি বিচার সভার আয়োজন করে সেখানে পক্ষ ও বিপক্ষে দুটো দল থাকে। পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি নিয়ে অভিনেতা দর্শকদের সামনে উপস্থিত হয়েছিল সেটার মঞ্চরূপ খুব সুন্দর ছিল। এবং তাঁদের অভিনয়ও শম্ভু মিত্রের খুব ভালো লেগেছিল। নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পাশাপাশি তিনি ক্ষেত্র প্রকাশ করে জানান যে—

“আমাদের এখানে শুনেছি বাঙালী ছেলেরা সিনেমা করে গান্ধিজীর ছবি দেখলেই অশ্লীল চিৎকার করতো তাঁর গ্রন্থাবলী যে দোকানে বিক্রি হোত তার ওপরেও নাকি বৈপ্লবিক আক্রমণ হয়েছে, কিন্তু এই সমস্ত বুদ্ধিহীন ফ্যাসিস্ট সুলভ আচরণ না করে যদি এমনি একটা নাটক লিখতো সত্যবাদিকতার সঙ্গে , তাহলে দেশের উপকার হতো।”^২

শম্ভু মিত্র জানান তিনি প্রথম দিকে শ্রীমোহন রাকেশের লেখা ‘আষাঢ় কা এক দিন’-এর গল্পটা যখন শুনেছিলেন ততটা তাঁর ভালো লেগেছিল না তখন। তাই তিনি সেই ভাবে সেটার প্রতি আগ্রহও দেখিয়ে ছিলেন না। তাঁর লেখা আর একটি নাটক ‘লহরৌ পে রাজহনস্’-এটি যখন কলকাতায় অভিনীত হয় তখন শ্রী শ্যামানন্দ জানান সেখানে অভিনয় করে। সেটা দেখে তিনি অবাক হন। ঐ নাটকের শেষ দৃশ্যের গভীর ব্যঞ্জনাময় অভিনয় তাঁকে আকৃষ্ট করে। তাই তিনি (শম্ভু মিত্র) বলেন—

“সচরাচর যে সব অভিনয় দেখে আমরা প্রশংসা করি এ-অভিনয় সে জাতেরই নয়। এ আলাদা এ একটা বড়ো অভিনেতার স্তরের অভিনয়।”^৩

শম্ভু মিত্র পরবর্তী কালে শ্রীমোহন রাকেশ এক ‘আধে আধুরা’ নাটকটা এবং দুটি একাঙ্ক নাটকও শোনেন। তাঁর কথপোকথনের মধ্যে যে নাটকীয় ভঙ্গী ছিল সেটা তাঁকে মুগ্ধ করে। কারণ তাঁর বলার মধ্যে দিয়েই অভিনয় ধারা প্রকাশ পায়। এই নাট্যজগতে তিনি এই নতুন কথ্যভঙ্গীটা নিয়ে আসেন। সেটা সকলের মধ্যে দেখা যায় না। এই নতুন জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি শম্ভু মিত্র শ্রীমোহন রাকেশকে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলেন।

শম্ভু মিত্র জানান বোম্বাইয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় শ্রীপৃথ্বীরাজ কাপুরের আবির্ভাব হয়। তিনি সেই সময় হিন্দিতে নাটক আরম্ভ করেছিলেন। এর আগে এমন কোনো নাট্যগোষ্ঠী ছিল না হিন্দিতে নাটক করার জন্য। নানা রকম অসুবিধার সম্মুখীন হয়েও এই থিয়েটারকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন শ্রীপৃথ্বীরাজ কাপুর এবং সেটা সাফল্যের ডিপিতে দাঁড় করিয়েছিলেন। কোনো কিছুই তো চিরস্থায়ী নয়। তাই যে কোনো কারণে যখন পৃথ্বী থিয়েটারের জৌলুষ কমতে শুরু করে, আর সেই সময় দিল্লীতে হিন্দি ভাষার থিয়েটারের আবির্ভাব ঘটে। পৃথ্বী থিয়েটারের জৌলুষ কমার সঙ্গে হিন্দি থিয়েটার আর বন্ধ হয়ে যায় না। দিল্লি হয়ে ওঠে হিন্দি সংস্কৃতির কেন্দ্র স্থল। পাঞ্জাব, সিমলা প্রভৃতি বিভিন্ন নাট্যপ্রেমী মানুষ দিল্লীতে এসে কাজ শুরু করে দেয়। এমনকি অন্য ভাষার যে সকল বিখ্যাত নাটক ছিল সেগুলি হিন্দিতে অভিনয় হতে শুরু হয়। হিন্দি চর্চা যখন জোর কদমে চলছে তখন শ্রীমোহন রাকেশের আবির্ভাব হয় এবং হিন্দি চর্চার পতন শুরু

হয়। ‘অভিযান’ নামক নাট্যগোষ্ঠীর আর্বিভাব ঘটে যারা ভারতের সকল ভাষায় নাটক চর্চা করতেন।

বোম্বাইতে মারাঠী, গুজরাতি ও হিন্দি প্রভৃতি ভাষার নাট্য সংস্থা আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী আছে মারাঠী নাট্যমঞ্চ ও মারাঠী অভিনেতা। বোম্বাইতে প্রত্যেকদিন অভিনয় হয় রবিবারে সবচেয়ে বেশী হয়।

অভিনয়ের দিক থেকে মারাঠী নাট্যমঞ্চ অনেক বেশী খ্যাতি অর্জন করেন শম্ভু মিত্র সেটা জানান। কিন্তু মারাঠী কোনো স্থায়ী গৃহে পেশাদারী নাট্য সংস্থার অভিনয় করে যাননি। তারা সারা বছর বিভিন্ন স্থানে গিয়েছেন অভিনয় করতে তাদের পক্ষে শুধুমাত্র বোম্বাইতে বসে থাকা সম্ভব ছিল না। কলকাতার মতো বোম্বাইতে কোনো স্থায়ী প্রেক্ষাগৃহ ছিল না। আবার সিনেমা কোম্পানী আসার ফলে তারা নিয়মিত বায়স্কোপ দেখানো শুরু করে। এই সকল কারণে তারা অনেকটা বাস্তবচ্যুত হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বোম্বাইতে দামোদর হল তৈরী হয়। শম্ভু মিত্র এই প্রেক্ষাগৃহ সম্পর্কে বলেন—

“ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রথম সম্মেলনের সময়েই দামোদর হলের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। তখন তার চেহারা দেখে মনে হয়েছিল কলকাতার মঞ্চগুলো ঢের ভালো। সেটা ১৯৪৩ সাল।”^৪

শম্ভু মিত্র জানান তিনি বিখ্যাত শ্রীরাঙ্গনেকরের সংস্থায় তিনি অভিনয় দেখেন। এর পাশাপাশি শ্রীপুল দেশপাড়ের দলের অভিনয় দেখেন। যেখানে একজন অভিনেতা তিনটে চরিত্রে অভিনয় করেন। তিনি তাঁর অভিনয় দেখে মুগ্ধ ও চমৎকৃত হন। এর পাশাপাশি তিনি পাঠকদের জানান সেই অভিনেতা একই নাটকে তিনটে ভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করেন। এবং যখন ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা নিয়ে মঞ্চে অবতীর্ণ হন তখন তাঁকে আলাদা আলাদা মানুষ বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু রূপসজ্জা ছিল সামান্য। এই সকল টুকরো টুকরো অভিজ্ঞতা শম্ভু মিত্র তাঁর মনের মধ্যে সঞ্চয় করে রাখেন।

শম্ভু মিত্রের শ্রী অরবিন্দ দেশপাণ্ডের নির্দেশিত ‘শান্ততা, কোর্ট চালু আছে’-র নাটক দেখে খুব ভালো লেগেছিল। কলকাতায় যখন ঐ নাটকের বাংলা অনুবাদ ‘চোপ আদালত চলছে’ এর অভিনয় কথা ভাবেন তখন তিনি চেয়েছিলেন অরবিন্দ দেশ পাণ্ডেকে নির্দেশক হিসাবে। কিন্তু তিনি চাকরিজীবী ছিলেন তাই আসতে পারেননি।

শম্ভু মিত্র জানান, বোম্বাই শহরে সবচেয়ে বেশী নাট্যচর্চা হয়। কারণ সেখানে প্রচুর প্রেক্ষাগৃহ গড়ে উঠেছে এবং এর ভাড়াও খুব কম আছে। আর প্রেক্ষাগৃহগুলো কোনো সংস্থার নিজস্ব ছিল না ফলে ভাড়াটা সহজেই পেত সকলে। মারাঠী নাট্যগোষ্ঠীর দল সব চেয়ে বেশী অভিনয় করত এবং তাঁরা নানা জায়গায় যেত অভিনয়ের জন্য। আর তাঁরা কলকাতার শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের চেয়ে বেশী টাকা রোজগার করত। নাট্যচর্চায় মারাঠীরা অনেকটা সাফল্য লাভ করেন। শম্ভু মিত্র বলেন মারাঠীর সাফল্যের কারণ মারাঠীরা নৈতিক দলের support এবং মারাঠী নেতারা থিয়েটারেই প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিল। আর মহারাষ্ট্র সরকারও এর জন্য নানা রকম উদ্যোগ নেন। যেটা খুব কম নাট্যসংস্থা এ রকম সাহায্য পায়।

শম্ভু মিত্র জানান মারাঠী নাট্যসংস্থার পাশাপাশি গুজরাটী নাট্যসংস্থাগুলোও কমে যায়নি গুজরাতে নাট্যসংস্থার একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ছিল শ্রী জয়শঙ্কর সুন্দরী। তিনি পুরুষ হলেও নারী চরিত্রে অভিনয় করতেন, তিনি সেই সময় মহিলাদের কাছে অনেকটা ‘ideal’-এ পরিণত হয়েছিলেন। অনেক মহিলা তাঁর কাছ থেকে শিখে ছিলেন কিভাবে হাঁটতে হবে, কিভাবে সাজতে হবে। শম্ভু মিত্র জানিয়েছেন তিনি নাকি বলতেন—

“আমি মেয়েদের দিক থেকে নাটকে পুরুষদের দেখেছি। তাই পুরুষরা যে কেমন হয়—আমাদের অহঙ্কার, আমাদের ছেলেমানুষি, সব খুব স্পষ্ট করে বুঝতে শিখেছি।”^৫

শম্ভু মিত্র এই সকল লোকনাট্য অভিজ্ঞতাগুলো তিনি পাঠকদের জানান। এর পাশাপাশি জানান এই অভিজ্ঞতা অর্জনের ফলে তিনি খুব উপকৃত হন। কারণ তখন বুঝতে পেরেছিলেন

ভারতীয়দের নিজস্ব নাট্য পদ্ধতিটা। ‘হেঁড়া তার’ নাট্যের মধ্যে এরূপ রূপের একটা সচেতন প্রচেষ্টা ছিল এবং ‘রক্তকরবী’তে সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভারতীয়ত্বের প্রকাশ খোঁজার পথে তিনি আরোও বুঝতে পারেন—

“ভারতীয়ত্বটা কেবল ওপরকার পোশাক নয়। এটার ভিত্তি বোধহয় অনেক গভীরে। চলনে, বলনে আমাদের খুশীর মুহূর্তে এ জীবনে সঙ্কটের মুখোমুখি হওয়ার সময়ে আমাদের, যাকে বলে world view তাই বোধ হয় প্রকাশ পায়।”^৬

আর অভিনয়ের ওপর world view নির্ভর করে। অভিনয় যত দীপ্ত হবে world view ততই প্রকাশ পাবে—এটাই শম্ভু মিত্রে মনে হয়।

শম্ভু মিত্র অনেক নোঁটফ্লি, তামাসা এবং অনেক দেশীয় নাট্য প্রকার দেখেছেন। এইগুলি দেখে তাঁর মনে হয়েছিল এই সকল অভিনেতারা কত সহজেই নিজেদের রূপটা প্রকাশ করছে। প্রত্যেক বিষয় সহজ ও সিরিয়াস ঠিক মূর্তি পূজার মতো মনে হয়েছে। কিন্তু এটা ছিল মনের অনেক গভীর উপলব্ধির প্রকাশ। এই ঘটনাকে শম্ভু মিত্রের আশ্চর্য sophistication মনে হয়। তিনিও এই সকল কৌশল ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছেন তাঁর নাট্যক্ষেত্রে।

শম্ভু মিত্র বলেন পুরানো দিনের যাত্রা, কথকতা, হরিকথার যে রূপ দেখা যেত, কিংবা নোঁটফ্লি, ভাওয়াই, তামাসা, যক্ষগান ইত্যাদি দেখা যেত এগুলোর মধ্যে একটা মিল। এরা ঠিক নিজেদের সময়ে প্রকাশ পেয়েছে। নাট্যচর্চা নিয়ে তিনি যথেষ্ট ভাবেন এবং বলেন এমন একটা নাট্যক্ষেত্র তৈরী করতে হবে যেখানে হেসে, কেঁদে, নেচে, গেয়ে গভীর উপলব্ধিগুলিকে প্রকাশ করতে পারবে সহজ সরল ভাবে অভিনেতারা।

আলোচনার শেষে এসে, শম্ভু মিত্র জানান, তিনি ভারতবর্ষের নানা স্থানে ঘুরে নানা জায়গার অভিনয় দেখে একটা জিনিস তিনি গভীরভাবে অনুভব করেছেন। উপমহাদেশের প্রত্যেক দিকে দিকে প্রচুর শিল্পী আছে। তিনি এই সকল শিল্পীদের সঙ্গে ডুবে যেতে বলেছেন। কারণ তাঁর মনে হয়েছে এই ডুবে যাওয়ার মধ্যে সাফল্য লুকিয়ে আছে।

পিতৃতর্পণ (১৯৭২):

শম্ভু মিত্র এই প্রবন্ধটি যখন লিখেছেন তখন বহুরূপী নাট্যদলটির বয়স ২৫ বছর হতে চলেছে। এই বহুরূপী নামটি মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের দেওয়া। তিনি মারা গেলেও তাঁর কথা শম্ভু মিত্র কোনো দিন ভুলতে পারেননি। তাঁরা যখন তিনদিন ধরে ‘নবান্ন’ নাটকের পুনরাভিনয় করছেন, তখন অনেকের গণনাট্য সংগ ত্যাগ করার ইচ্ছা দেখা যায়। অনেকে চলে যায়, যাঁরা পড়ে রইল তাঁদের নিয়ে একগোষ্ঠী তৈরী করে ‘পথিক’ নাটকের মহলা দেয়। কিন্তু তখনও নাট্যগোষ্ঠীর কোনো নাম দেওয়া হয়নি।

‘পথিক’ নাটকের মহলা একবছর চলেছিল। কারণ তাঁদের দলে অনেক নতুন ছেলে ঢুকেছিল। যারা মহর্ষি ও তুলসীবাবুর সঙ্গে অভিনয় করার যোগ্য ছিল না। একবছর ধরে মহলা হওয়ার জন্য নাট্যদলের কিছু ব্যক্তি ছিল যারা পরিচিত পাওয়ার জন্যই নাট্য দলের জন্য যুক্ত থাকতেন তাঁরা দল ছেড়ে চলে যায়। আর যারা পড়ে রইল তারাই দলের নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠল। সংখ্যায় কম হলেও তাঁদের দিয়েই কাজটা হল।

নাট্যদলটির নাম হল বহুরূপী। এই প্রসঙ্গে শম্ভু মিত্র বলেন—

“আহা আমরা অ্যাকটাররা তো সব বহুরূপীই বটে। এক এক নাটক এক এক রূপ।”^১

‘বহুরূপী’ বলতে আমরা বুঝি সারা গ্রামে গ্রামে নানারকম সেজে ঘুরে বেড়ান। সেই অর্থে ‘বহুরূপী’ নামটি রাজনৈতিক মহলে নিন্দা অর্থে ব্যবহৃত হবে বলে অনেকে মনে করেছিলেন। প্রথম দিকে শম্ভু মিত্র ভেবে ছিল নামটি হয়তো সংস্কৃত ঘেঁষা হবে। কিন্তু যখন এই নামটি শুনলেন তখন মনে মনে কিন্তু একই আপত্তি থাকলেও মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের দেওয়া নামটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল।

বহুরূপী নাট্যদল খুব সহজেই গড়ে ওঠেনি। তাঁর জন্য প্রথম দিকে দলের প্রত্যেককেই অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল। তাঁদের এই কষ্টের জন্য তাঁদের দলনেতা মহর্ষি

কিছুটা হলেও দায়ী ছিলেন। মহর্ষি প্রথম দিকে অসুস্থ হয়ে পড়েন (স্ট্রোক হয়)। তবু এই বয়স্ক ব্যক্তিটি নানা রকম বাধার সম্মুখীন হয়েও হাসি মুখে সবাইকে উৎসাহ দিয়ে গেছেন। শম্ভু মিত্র জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে মহর্ষিকে স্মরণ করেন। তিনি মহর্ষির জীবনের একটি ঘটনা আমাদের বলেন সেটি হল—মহর্ষি অসুস্থ হওয়ার পর ট্রেনের থার্ডক্লাসে করে যাওয়ার সময় ঠাসাঠাসি গাদাগাদির মধ্যে তাঁর শোবার জন্য জায়গা করে দলের ছেলেরা। সেই মুহূর্তে তাঁর ঘুমের খুব প্রয়োজন ছিল। তিনি একা শুয়ে উঠে পড়েন এবং সবার সঙ্গে গল্প শুরু করেছেন। আবার বহরমপুরের দায়িত্বহীন সংগঠনের জন্য অভিনয় করতে আসেন কিন্তু সারা রাত তাদেরকে টেলের উপর বসে কাটতে হয় সেই মুহূর্তে মহর্ষি তাদের কষ্টটা লাঘব করার জন্য একটা সভা জমিয়ে ফেলেন।

শম্ভু মিত্র জানিয়েছেন, মহর্ষি না থাকলে তাঁর এই পথ চলা, জীবনকে উপলব্ধি করা কোনো মতেই সম্ভব হত না।

শম্ভু মিত্র নিজের কাজের বিষয়ে খুব সিরিয়াস ছিলেন। মহর্ষি যখন তাঁকে সিরিয়াস না নেওয়ার জন্য বলেন। তখন তিনি বলেন—

“কাজটা সিরিয়াসলি নিই বলেই নিজেকে সিরিয়াসলি নিই ...।”^২

মহর্ষি তাঁর কথা শুনে বলেন—

“বয়স হলে দেখবে এতো সিরিয়াসলি সবকিছু নেবার দরকার নেই।”^৩

প্রথম দিকে তিনি এই কথাটি বুঝতে না পারলেও জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তার মানেটা টের পেয়েছিলেন। মাথা যেমন আমাদের দেহের সব অংশের উপরে অবস্থান করে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুলিকে পরিচালনা করায় সবরকম অনুকূল ও প্রতিকূল পরিবেশে সেইরকম ছিলেন তিনি। শম্ভু মিত্র বলেন দলের মধ্যে যখন বারবার সঙ্কট ঘনিয়ে আসে তখনই মহর্ষির কথা মনে পড়ে সকলের।

মহর্ষি ছিলেন শম্ভু মিত্রের Friend, Philosopher and Guide. যৌন জীবন থেকে

শুরু করে মহত্বের অনুভব পর্যন্ত। সমস্ত কিছুই তিনি তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছেন, তাঁর বাস্তব জ্ঞানের উপলব্ধি তিনি খুব কাছে থেকে পেয়েছেন বলেই নিজেকে ধন্য মনে করেন।

‘রক্তকরবী’ নাটকে অধ্যাপক চরিত্র অভিনয় করার কথা ছিল মহর্ষির। কিন্তু অভিনয় করা আগে তিনি মারা যান। এর ফলে ‘রক্তকরবী’তে নানা রকম প্রতিকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ‘রক্তকরবী’ অভিনয় হলেও তার মধ্যে কিন্তু প্রতিকূলতা থেকেই গেল। মহর্ষির মৃত্যুর পর, পরই দিল্লীতে নাট্য অভিনয়ের জন্য ডাক এসেছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে তাঁরা পিতৃহীন হয়ে পড়ায় তাদের যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়।

‘রক্তকরবী’র পর যখন ‘পথিক’ নাটক অভিনীত হয় তখন রাজনৈতিক সংশ্লিষ্ট দলেরা ব্যক্ত করে বলেন—

“পথিক তুমি কি পথ হারাইলে?”^৪

‘চার অধ্যায়’ নাটক অভিনয়ের পরেই নানা রকম নিন্দা, প্রতিবাদ হতে থাকে।

মহর্ষির অনুপস্থিতিতে অনেক দিন পর তাঁরা আবার দিল্লী গেলেন এবং সেখানে গিয়ে তাঁরা যথেষ্ট সম্মান পান। ইংরেজ শাসনের ফলে গ্রাম ও শহরের মধ্যে যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল সেই বিভেদ দূর করার জন্য ‘বহুরূপী’ নাট্যগোষ্ঠীর সদস্যরা ঠিক করেছিল সেখানে একটা গ্রামের নাটক একটা শহরের নাটক অভিনয় করবে যার ফলে বাংলা সংস্কৃতির একটা কেন্দ্র খুঁজে পাওয়া যাবে। আর এই সকল মাথায় রেখে উলুখাগড়ার পর ‘ছেঁড়াতার’ অভিনীত করেছিল।

নাটকের অভিনীত হবার শেষে প্রধান যে ব্যক্তি বিরাট নাট্যব্যক্তিত্ব নিয়ে সকলের সঙ্গে দাঁড়ানোর কথা সেই ব্যক্তিটি আর কোথাও মেলে না অপর উচ্ছ্বাসিত প্রসংশার পর টীপ্পনী কাটতে আর পাওয়া যায় না। আর এই ব্যক্তিটি আর কেউ নন মহর্ষি। তাঁকে প্রতিমুহূর্তে বহুরূপীর সদস্যরা Miss করে।

গ্রামে সম্পর্কিত নাটক অভিনীত করতে চাইলেও যে সকল নাটক পাওয়া গেল সেখানে জীবনের গভীরতা কম ছিল।

আমরা সেই মুহূর্তে শহরে জীবনে অনেক পরিবর্তন দেখতে পায়। শহরের মানুষ ইংরাজিতে কথা বলার চেষ্টা করছে এবং ছেলে মেয়েদের ইংরেজি মিডিয়ামে পড়াচ্ছে। এই পরিবর্তনের টেড নাট্যদলগুলিকে ছুঁয়ে যায়। অনেক স্বচ্ছল পরিবারের লোকেরা নাট্যদলে যোগদান করেন। কিন্তু ইংরাজি মিডিয়ামে পড়া ইংরাজি জানা ছাত্ররা কেউ নাট্যদলে যোগদান করে না। এ থেকে একটা ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সমাজের মধ্যে আলাদা যে শ্রেণী গড়ে উঠেছে সেটা।

কোনো জিনিস শুরু পিছনে যেমন ফ্যানাটিক উৎসাহের প্রয়োজন হয়, আবার শেষ পর্যন্ত এই উৎসাহ যদি সংযত করা না হয় তাহলে দল ভেঙে যেতে বাধ্য। এই ফ্যানাটিকের প্রভাবে দলের ব্যক্তিদের মধ্যে আধুনিক চিন্তা ভাবনার প্রসার ঘটে না তারা পুরাতনপন্থী হয়ে থেকে যায়। এই ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য দলের মধ্যে নানান vested interest জমে ওঠে এই interest টা বেশির ভাগ painting-এর Position-এর আবার এই কাঠামো বদলে নতুন করে আত্মীয়তা করতে দেখা যায়।

নাট্যশিল্পীদের নিয়ে একটা বড় ভয় হল যখন তাঁরা খ্যাতি সম্পন্ন হয়ে ওঠে, তখন দলের মধ্যে তাঁদের বায়না বেড়ে যায়। তখন তাঁর পাশাপাশি আরো সদস্যরা সমান সুবিধা নেবার চেষ্টা করে। কিন্তু চলচ্চিত্র জগতে এমনটা হয় না। যেমন—উত্তমকুমার যে পরিমানে টাকা ও সুবিধা পাবে অন্যরা কিন্তু তা পাবে না। তার জন্য তারা যতই মালিকের মুড়ুপাত করুক না কেন? কিন্তু নাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে এটা হয় না। কারণ এখানে সবার অবাধে সমান অধিকার থাকে।

শুধুমাত্র বড় বড় অভিনেতা অভিনেত্রী (যেমন শিশিরবাবু, অহীনবাবু, ছবিবাবু) দের নিয়ে দল করব এ রকম ভাবেই কোনো দিন সেটা সম্ভব হবে না। একটা নাট্যদল গঠনে ছোটো বড় সকলশিল্পীর সমান ভূমিকা থাকে।

ডিমোক্রাসি শব্দটিকে বহুরূপী নাট্যদল তাঁদের নিজেদের মতো করে ব্যবহার করেছিলেন। না হলে এই শব্দটি অপপ্রয়োগে দেশের পাশাপাশি নাট্যদলগুলোর ক্ষতি হচ্ছিল।

তাই বহুরূপী দলের মধ্যে বড়ো সম্মান দেওয়া অর্থাৎ মহর্ষির প্রতি সম্মান ব্যবহার এগুলি দেখতে পাওয়া যায়। এর ফলে তারা নিজেদের মধ্যে একটা আত্মীয়তা অনুভব করেন।

নাট্যদলের মধ্যে আমরা যে আত্মীয়তা সৃষ্টি হতে দেখছি সেটা কিন্তু আমাদের সমাজ থেকে দিনে দিনে হ্রাস পাচ্ছে। চোখের সামনে শম্ভু মিত্র দেখছেন সমাজ থেকে প্রেম হারিয়ে যাচ্ছে, সেটি সহানুভূতিহীন দানবে পরিণত হচ্ছে। তৎকালীন সমাজটা গুণামিতে ছেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এর বীজটা বপন হয়েছিল অনেকদিন আগে। সমাজের মানুষ সেটাতে প্রশ্রয় দিয়েছে এর ফলে সেটি হাতের বাইরে চলে গিয়ে ব্যাপক আকার ধারণ করছে। আর ফল স্বরূপ বঙ্গ-সংস্কৃতির দিনে দিনে উলঙ্গ রূপ দেখা দিচ্ছে।

শম্ভু মিত্র ‘বহুরূপী’ দলের বাস্তবজ্ঞানহীন রোমান্টিক ব্যক্তি হিসাবে যাকে চিহ্নিত করেছেন তিনি হলেন মহর্ষি। তিনি এরকম চরিত্রের ছিলেন বলেই দলের সকলেই তাঁকে পিতার সমান মনে করতেন।

শম্ভু মিত্র জীবনের প্রত্যেক ধাপে ধাপে মহর্ষিকে স্মরণ করে পথ চলেছেন। আর তিনি তাঁকে এতটা কাছে থেকে জানতেন যে, এই প্রবন্ধটি পড়লে তিনি কি বলতে পারে সেটাও তিনি আন্দাজ করেছেন। তাই বলেছেন—

“আমি বেশ কল্পনা করতে পারি যে, আজ যদি তিনি আমার এই লেখা পড়তেন তাহলে মুচকি হেসে কী বলতেন। এমন বন্ধু আমি পাইনি। তৃপ্তি পায়নি, বহুরূপী পায়নি। এতো মানবিক জ্ঞান, এতো সংস্কারবর্জিত মুক্ত মন, আমি আর দেখিনি। বলেছিলেন সারা জীবন খালি ভাঙাই দেখলুম, গড়ো গড়ো কিছু একটা গড়ে তোলো।”^৫

পঁচিশ বছর ধরে বহুরূপী নাট্যদল কিছু গড়ে তুলেছে বলে কারোর মনে হয় তাহলে তিনি যেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যকে মনে মনে স্মরণ করে প্রণাম জানান এটাই হবে তাঁর পিতৃতর্পণ। শম্ভু মিত্র তাঁকে সব সময় পিতার আসনে বসিয়ে রেখেছিলেন।

কীভাবে রবীন্দ্রনাথে পৌঁছানো গেল:

নট-নাট্যকার-নাট্যপরিচালক ও প্রাবন্ধিক শম্ভু মিত্র ১৯৭৬-৭৮ সালে কয়েকটি বক্তৃতাকে ভিত্তি করে তিনি রচনা করেন উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ ‘কীভাবে রবীন্দ্রনাথে পৌঁছানো গেল।’ পরে এই প্রবন্ধটি ‘সম্মার্গ-সপর্যা’ নামক প্রবন্ধ গ্রন্থে সংকলিত হয়।

প্রবন্ধের শুরুতেই প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন যে, তিনি একজন নাট্যকর্মী হিসাবে ও হাতে কলমে কাজ করতে গিয়ে কীভাবে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি নাটকের মঞ্চরূপ তৈরি করলেন তা নিয়ে অনেকের যে কৌতুহল রয়েছে তারই প্রশমনের জন্য তিনি এই প্রবন্ধটি রচনা করেন।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট ধারণা তৈরির পর্যায়গুলি সম্পর্কে বলতে গিয়ে শম্ভু মিত্র বিজ্ঞানীদের একটি বক্তব্যকে প্রথমে উল্লেখ করেছেন—

“আমরা যখন কোন জিনিস দেখি, বা জানি, বা অনুভব করি, তখন নম্বর ওয়ারী হিসেবে সেটা উপলব্ধি করি না। আমাদের বোধ যেন স্পঞ্জের মত বিষয়টাকে সম্পূর্ণ শুষ্ক নিয়ে আত্মসাৎ করে নেয় আমাদের উপলব্ধিতে এবং তারপরে প্রয়োজন মতো আলাদা আলাদা স্তর থেকে সেই বোধ আসতে থাকে আমাদের চেতনায়।”^১

অর্থাৎ প্রাবন্ধিক বলতে চেয়েছেন যে, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর বোধ যখন ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছিল বা বিবর্তিত হচ্ছিল যেভাবে, এতদিন পরে তাঁর বিবৃতি দেওয়া যে তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, তা তিনি জানিয়েছেন। তবে তিনি তাঁর খানিকটা আন্দাজ করতে পারেন বলে জানিয়েছেন।

প্রাবন্ধিক শম্ভু মিত্র নিজেই বলেছেন যে, ‘সাধারণ মঞ্চ’ হল তাঁর নাট্যজীবনের দ্বিতীয় পর্যায় এখানে প্রথম ফ্যাসিবিরোধী লেখক গোষ্ঠী ও শিল্পী সংঘের উদ্যোগে ও তাঁর প্রথম নির্দেশনায় রবীন্দ্রনাথের ‘ল্যাবরেটরী’ অভিনীত হয়। এই কাজে তাঁর বেশ কিছু মজার অভিজ্ঞতাও রয়েছে। এরপর ‘জবানবন্দী’ মহলার সময়ে সমস্ত অভিনয়ের গ্রন্থনার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবার চেষ্টার কথা তিনি জানিয়েছেন। এর কারণ হিসাবে তিনি বলেছেন যে, শৌখিন বা সখের

ন্যাটোশালায় অভিনয়ের এই দিকগুলিই অত্যন্ত অগোছালো থাকে। ফলে সেখানকার নাটকে হাঁটা-বসা ও সংলাপ বলার মধ্যে দিয়ে দৃশ্যের নাটকীয়তা প্রকাশ পায় না।

শম্ভু মিত্র জানিয়েছেন যে, ‘জবান বন্দী’ নাটকের মহলা দেবার সময় থেকেই এই নাটকের মঞ্চসজ্জা নিয়ে তাঁর কল্পনা ছিল বাস্তব কুঁড়েঘর, বাস্তব পার্কের ধারের রাস্তা ও খানিকটা সাধারণ মঞ্চের দৃশ্যসজ্জা। কিন্তু এই মঞ্চসজ্জার জন্য যে পরিমাণ টাকার প্রয়োজন তা গণনাট্য সংঘের নেই। ফলে শেষ পর্যন্ত যে থিয়েটারে অভিনয় করা হয়েছিল, সেই থিয়েটারেরই পুরানো ফ্ল্যাটগুলোকে উন্টে করে দাঁড় করিয়েছেন। পাইন কাঠের এই ফ্ল্যাটগুলো নানারকম রঙে ও ময়লা পড়ে দেখতে হয়েছিল অন্যরকম। নাটকে পরাণ মন্ডলের প্রতি সমাজের ঔদাসীন্যকে যেন এই ফ্ল্যাটগুলো দর্শকদের কাছে প্রকাশ করে। তাই প্রাবন্ধিকরা পরান মন্ডলের নাতির মৃত্যুর দৃশ্যে মঞ্চের সমস্ত আলো জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। এই প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক বলেছেন—

“কী হয়েছিল ঠিক জানি না। তবে কিছুটা খ্যাতি বোধহয় হয়েছিল। অনেকবার অভিনয় করবার সুযোগ হয়েছিল। মানে, তখনকার হিসেবে অনেকবার। আর আমারও অনেক প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা হোল মঞ্চ দৃশ্য সজ্জার ও আলোর আচরণ সম্পর্কে। কিছু ভুল ভাঙলো, কিছু নতুন জ্ঞান হোল।”^২

তবে ‘নবান্ন’ নাটক অভিনয়ের খরচের জন্য কমিউনিষ্ট পার্টির তৎকালীন প্রধান সম্পাদক শ্রী পি.সি. জোশীর আগ্রহে ও সুপারিশে প্রাবন্ধিকরা অর্থাৎ ‘বহুরূপী’ নাট্য সংস্থা বেশ কিছু টাকা পেয়েছিলেন। ‘নবান্ন’ নাটকের দৃশ্য সংখ্যা বেশি হওয়ায় এর নাট্য প্রয়োগের পদ্ধতি ছিল ভিন্ন। তাকে বলা হত কভার-ডিসকভার পদ্ধতি। তবে এই পদ্ধতি চালু ছিল ঘূর্ণমঞ্চ আসার আগে। তিরিশের দশকের প্রথমদিকেই শ্রীসতু সেন আমেরিকা থেকে এসে ঘূর্ণমঞ্চ তৈরি করেন। এই মঞ্চের গোল চাকাটিতে মোট তিনটি দৃশ্য সাজানোর জায়গা ছিল। তবে সাধারণ মঞ্চের তুলনায় এর আয়তন ছিল বড়ই ছোটো। তা হলেও প্রাবন্ধিক শম্ভু মিত্র স্বীকার করেছেন যে—

“এসব ঘটনা পশ্চিমে এর অন্ততঃ একশো বছর আগে ঘটে গিয়েছে। এবং বাস্তবানুকৃতি হিসেবেও মঞ্চসজ্জায় এলাহি পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে।”^৩

শম্ভু মিত্র জানিয়েছেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে আমাদের দেশীয় মঞ্চের পরিবর্তে নতুন মঞ্চ ও দৃশ্যপট সম্বলিত আধুনিক থিয়েটারের পর্যায় শুরু হয়। এমন সময়ে কিছু না একে মঞ্চ কেবলমাত্র পর্দা টাঙানোর কথা প্রাবন্ধিকদের মাথায় এলো কীভাবে তা নিয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে। এর উত্তরে প্রাবন্ধিক বলেছেন—

“তখন কিন্তু মাথায় আসাটা এতেই স্বাভাবিক মনে হয়েছিল যে তার উৎপত্তির হিসেব করাটা কারোরই প্রয়োজন মনে হয়নি, পরে ভেবে মনে হয়েছে যে প্রভাব বোধহয় রবীন্দ্রনাথেরই। তাঁর অনেক অনুষ্ঠান নাকি পর্দা ঝুলিয়েই হোত। কিন্তু ‘তপতী’ নাটকের শুরুতে দৃশ্য-সজ্জা সম্পর্কে তাঁর লেখা তো পড়া ছিল বটেই।”^৪

এছাড়া পশ্চিমের দৃশ্য সজ্জার কিছু বর্ণনা ও ছবিও প্রাবন্ধিকেরা পেয়েছিলেন। ‘নবান্ন’ নাটকের দৃশ্যসজ্জার কথা মহর্ষিকে জানালে মহর্ষিই চট্টের পর্দার কথা বলেছিলেন। তিনি বললেন—

“চট্টের পর্দা দাও। আমরা গরীব দেশের লোক আমাদের ভেলভেট নেই। কিন্তু চট আছে, লাগাও, চট্টের পর্দা।”^৫

প্রাবন্ধিক বলেছেন যে, ‘নবান্ন’ নাটকের একটি দৃশ্যে ছিল দাতব্য চিকিৎসালয়ের। সেই দৃশ্যে একটি টেবিল, দু-একটি কাঠের চেয়ার ও একটি বেঞ্চ এবং স্থান বোঝানোর জন্য চট্টের পর্দায় লাল শালুতে সাদা অক্ষরে সাঁটা ছিল ‘দাতব্য চিকিৎসালয়’। এই দৃশ্যসজ্জা থেকে ‘পথিক’, ‘উলুখাগড়া’, ‘ছেঁড়াতার’, ‘চার অধ্যায়’ এমনকি ‘বিভাব’ নাটকের দৃশ্যসজ্জা পরিকল্পনা করেছেন। তবে ‘নবান্ন’-এর পর প্রোপাগান্ডা বনাম বিশুদ্ধ শিল্পকলার এই নিয়ে চরম তর্ক শুরু হয়।

‘নবান্ন’-এর অসামান্য সাফল্যের পর শম্ভু মিত্র বুঝতে পারেন যে, সমাজে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমাজ একটা সংঘবদ্ধতা পায়। আর এই অনুভূতি যে গানে যে লেখা বা যে অভিনয়ে ফুটে ওঠে সেটাই লোকের মনকে গভীর ভাবে স্পর্শ করে। সেই কারণেই বাংলাদেশে পঞ্চাশের মন্বন্তরে সমাজের ন্যায়-অন্যায় বোধের যে বিধৃত সেখানে যে গভীর ধিক্কার

আর বেদনাবোধ জেগেছিল তাই ‘নবান্ন’ নাটকে ফুঁটে ওঠায় মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো জেগে ওঠে।

প্রাবন্ধিকের মতে, সকল সংস্কৃতির কলাশিল্পের প্রয়োজনে distortion ও কিছু abstraction থাকেই থাকে। তবে প্রাবন্ধিক এবিষয়ে বলেছেন—

“আমাদের দেশে কীভাবে নাট্যে সেই বাস্তবাতিরিক্ত বিন্যাস আনা যায়, যাতে বাস্তবেরই গভীরতা উপলব্ধিতে আসে?”^৬

এই বিষয় নিয়ে কবি শ্রী বিষ্ণু দেবর কথ্য প্রাবন্ধিকের বোধকে জাগ্রত করেছে বলে প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন। বিষ্ণু দে বলেছিলেন—

“বাঁকুড়ার ঘোড়া তো বাস্তব ঘোড়া নয়, কিন্তু ওটা গড়েছে একেবারে গ্রামীণ শিল্পী। যাদের আমরা অশিক্ষিত বলে থাকি। আর কতো যুগ ধরে গ্রামের আপামর জনসাধারণ ওর মধ্যেই আসল ঘোড়াটাকে দেখতে পেয়েছে।”^৭

অর্থাৎ অভিনয়ে একটা চরিত্রকে যখন জীবন্ত করে তোলা হবে তখন তাকে যেমন বাস্তব বলে মনে হওয়া চায় তেমনি বাস্তবাতিরিক্ত একটা মাত্রাও তার মধ্যে থাকা চাই।

শম্ভু মিত্র জানিয়েছেন যে, অনেকের ধারণানুযায়ী ‘নবান্ন’ নাটক তৎকালীন দেশের অবস্থার এক বাস্তব চিত্রণ। তবে নাটকটি যদি ভালো করে পড়া যায় তাহলে দেখা যাবে যে, নাটকটি পুরোপুরি রিয়ালিটির নয় বরং নাটকের অনেক জায়গায় কাব্যসৃষ্টির বহু উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে। অনেক চরিত্র বাস্তবানুগভাবে রচিত হলেও কতকগুলি চরিত্রের সংলাপ অনেক বেশি কাব্যময়। তবে যাই হোক ১৯৪৬ সাল থেকে প্রাবন্ধিকদের জীবনে হঠাৎ করেই বিভিন্ন ঘটনা ঘটতে থাকে। ‘ধরতি কে লাল’ ছবির কাজ শেষ করে বোম্বে থেকে ফিরে এসে প্রাবন্ধিকরা ‘মুক্তধারা’ মঞ্চস্থ করলেও তা ব্যর্থ হয়। এর পর প্রাবন্ধিকরা ঠিক করলেন যে, রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে এমন নাটক তাঁরা অভিনয় করবেন যা আধুনিক কালকে জীবন্ত করে প্রকাশ করবে এবং তা হবে ভারতীয় নাট্যরীতিতে।

প্রাবন্ধিক বলেছেন যে, এরপর তিনি শ্রী পি.সি. জোশীর আমন্ত্রণে বোম্বে যান। ‘ধরতি কে লাল’-এর মতোই আর একটা ছবি করতে। ছবির গল্পটি ছিল বিজন ভট্টাচার্যের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ওপর লেখা। এই ছবির জন্য টাকা দেবে পি.সি. র ভক্ত কানপুরের এক যুবক শিল্পপতি। কিন্তু পার্টির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে পি.সি. জোশী অপসারিত হন। ফলে প্রাবন্ধিক শম্ভু মিত্র ও পৃথ্বী থিয়েটার্সের প্রধান অভিনেত্রী আজরার স্বামী হামীদের প্রচুর পরিশ্রমের পরও ছবির পরিকল্পনা বাতিল হয়ে যায়। ডিসেম্বরের শেষে কলকাতায় ফিরে আসেন এবং জানুয়ারীর শেষ দিকে গান্ধীজীকে হত্যা করা হয়, স্বাধীনতার ছয় মাস না হতেই। এর সাত দিন পরে গণনাট্য সংঘের এক মিটিঙের পরে ঐ সংঘ ছাড়তে হয়। এরপর শম্ভু মিত্র পুনরায় নতুন ছেলে-মেয়েদের নিয়ে কাজ শুরু করেন শ্রী তুলসী লাহিড়ীর ‘পথিক’ নাটক দিয়ে। এই নাটকের জন্য মহলা দেওয়া হয়েছিল এক বছর। আর এতদিন ধরে মহলার ফলে আধুনিক অভিনয় ভঙ্গীর রূপটি তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই নাটকের পর ‘উলুখাগড়া’ ও ‘ছেঁড়াতার’ দুটো নাটকেই প্রযোজনার ও অভিনয়ের একটা দিক পেয়ে যান।

প্রাবন্ধিক শম্ভু মিত্র জানিয়েছেন যে, তাঁরা ‘বিভাব’ নাটকে নিরস্ত্র মিছিলের ওপর পুলিশের গুলি চালানোর দৃশ্য উপকরণ বিহীন এক প্রয়োগ পদ্ধতির সাহায্যেও মানুষের মনে তীব্র অনুভব জাগিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। এরপর তাঁরা অন্যদের অনুরোধে ‘মুক্তধারা’ অভিনয় করলেও নিজেদের জন্য করলেন ‘চার অধ্যায়’। তবে ‘চার অধ্যায়’ অভিনয় নিয়ে প্রাবন্ধিক মহর্ষিকে জানালে উনি বলেছিলেন—

“ওটা করবে! ওটা নিয়ে আবার নানারকম কথা চালু আছে।”^৮

এই কথা শোনার পর প্রাবন্ধিক বললেন—

“আপনি পড়ুন, পড়ে যদি আপনার কোথাও কোনো অন্যান্য উক্তি আছে বলে মনে হয়, আর আমাদের যদি তা না মনে হয়, তাহলে তর্ক করবো, আর তর্ক যদি কোনো সমাধানে না পৌঁছতে পারি, তাহলে করবো না, বন্ধ করে দেব।”^৯

এরপর মহর্ষিকে বইটি দেওয়া হল। এবং পরেরদিন সকালে তাঁর বাড়ি গিয়ে হাজির হলেন প্রাবন্ধিক। মহর্ষি বললেন—

“না হে, কোথাও কোনো ভুল কথা, বা অন্যায় কথা তো নেই। তবু প্রথম যখন পড়েছিলাম তখন কেন যে মনে হয়েছিল! বোধ হয় চারিদিকে সকলে খুব বলছিল—তাতেই মনে একটা ইম্প্রেশন হয়ে গিয়েছিল। না, না করো। খুব করা যায়।”^{১০}

শম্ভু মিত্রের মতে, কোনো নাটক প্রথম পড়ার সময় যতটা বোঝা যায়, সেটি অভিনয়ের সময় আরো বেশি করে বোঝা যায়। এই জন্য ‘চার অধ্যায়’ অভিনয়ের সময় তিনি অনেক নিগূঢ় অর্থ স্পষ্টভাবে বুঝতে পারেন। তিনি আরো জানিয়েছেন যে, ‘চার অধ্যায়’ অভিনয়ের সময় এর সংলাপ বলতে তাঁদের বেশি অসুবিধা হচ্ছে না বরং কথা বলার মতোই সহজ বলে মনে হচ্ছে। তবে এর কারণ হিসেবে তিনি মনে করেন এর শহুরে ধাঁচের সংলাপ।

এরপর প্রাবন্ধিক ‘চার অধ্যায়’ এর অভিনয় প্রসঙ্গে আরো কিছু জানাতে গিয়ে বলেছেন যে, তাঁর ষোলো বছর বয়সে তার অভিনয় শেখার গুরু তাঁকে বলেছিলেন—

“উপন্যাসে লেখা থাকে যে, কথাটা শুনিয়া তাহার মুখটা কেমন যেন বিষন্ন হইয়া উঠিল। সে উঠিয়া জনালার সামনে যাইয়া কিছুক্ষন চুপ করিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল। পরে মুখ ফিরাইয়া আস্তে আস্তে বলিল ... ইত্যাদি। কিন্তু নাটকে এতোসব বিবরণ কিছুই লেখা থাকে না। শুধু যে বলছে সেই ডায়ালগটুকুই লেখা থাকে। বাকি সবটা অভিনেতাকে ভেবে তৈরি করে নিতে হয়।”^{১১}

তাই ‘চার অধ্যায়’ নাটকটিকে কেঁটে ছেঁটে যখন অভিনয়ের জন্য সাজানো হচ্ছিল তখন এর চিন্তার ধারাটা এর অনুভবের ধারাটা, জীবন্ত হয়ে তাঁর বোধের মধ্যে আসছিল। এই নাটকটির দৃশ্য সজ্জা নিয়ে তিনি বলেছেন যে এর দৃশ্যসজ্জা হয়েছিল তাঁদের পূর্বাপর ধারা অনুযায়ী।

এই নাটকের অভিনয় করতে গিয়ে প্রাবন্ধিকের মনে হয়েছে যে, আমাদের দেশে নানা জায়গায় ধর্মীয় উপলক্ষে নানা মেলা বসে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ধর্ম অনেক সময়ই মানুষকে মেলায় না। তাই যদি আমাদের দেশে কোনো সামাজিক ক্রিয়াকলাপকে কেন্দ্র করে মেলা হয় তাহলে সকল ধর্মের মানুষই সেখানে অনায়াসে যেতে পারে। আর এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ বৃক্ষরোপন, হলকর্ষণ, বসন্তোৎসবের মতো secular উৎসবের প্রচলন করেছিলেন। আর রবীন্দ্রনাথ সহ অন্যান্য কতো সাহিত্যিকরা যখন জীবনের কথা বলতে চেয়েছেন তখনই তাদের ভাষা যেন রূপকের ভাষায় পরিণত হয়েছে। এয়েন ঠিক ‘মীথ’-এর ভাষা। আর এই আধুনিক মীথের মতো বর্ণনা হল ‘রক্তকরবী’। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের নামকরণের ক্ষেত্রে রূপকের আশ্রয় নিতেন বলে প্রাবন্ধিক মনে করেন।

প্রাবন্ধিক এও মনে করেন যে, প্রত্যেক বড়ো লেখকের লেখা পড়তে গেলে মনোযোগের পাশাপাশি তাঁর বাক্ছন্দটাকেও ধরতে হবে। নাহলে তাঁকে কোনোমতেই বোঝা সম্ভব নয়। তাই ‘চার অধ্যায়’ এ পৌঁছবোর অনেক আগে তিনি বুঝেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ সাধারণ লোকের চেয়ে হাজার গুণ বেশি বুদ্ধিমান। সুতরাং তাঁর সংলাপের সেই ধারালো বুদ্ধিটা যদি লোককে বোঝানো যায়, যদি সেই সংলাপকে কাব্যিক সুরে পড়া হয় তাহলে প্রাবন্ধিকদের নিজেদের বুদ্ধিরই অপমান হবে। এরপর প্রাবন্ধিক বলেছেন—

“এই বোধ হয় মোটামুটি একটা বিবরণ। রবীন্দ্রনাথে পৌঁছবার। অনেকগুলো চিন্তা যা আমার মনে আবছা ভাবে ঘুরপাক খাচ্ছিল সেগুলো রবীন্দ্রনাথকে আশ্রয় করে স্পষ্টতর হোল।”^{১২}

সম্পৃক্তি (১৯৮৩):

‘সম্পৃক্তি’র এই প্রবন্ধটি শম্ভু মিত্র ১৯৮৩ খ্রি: রচনা করেন। এই প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে তিনি বলতে চেয়েছেন মানুষের জীবনে সম্পর্কের গুরুত্ব কতটা। কিন্তু সেটা শুধুমাত্র সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়। নাট্যক্ষেত্রে যে এর যথেষ্ট অবদান আছে তিনি সেটা এই প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন।

সমাজ বা অভিনয় ক্ষেত্র যেটার কথা আমরা বলি না কেন তার মূল ভিত নির্ভর করে সম্পর্কের ওপর। শব্দ মিত্র মনে করেন অভিনয়ের কেন্দ্রেও কিন্তু আছে সম্পর্ক। মানুষ যখন যেখানে যায় সেখানকার লোকজনের সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে তোলে। অর্থাৎ বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন রকম সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রত্যেকটা সম্পর্কের আলাদা আলাদা ভিত্তি আছে। যদি আমরা সমাজের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব, মানুষের সঙ্গে সমাজের সম্পর্কটা প্রতিদিনই প্রকাশ পায়। কোথাও সে মা বা বাবা আবার কোথাও সে স্বামী বা স্ত্রী আবার কোথাও সে সন্তান। এগুলোই হল একজন মানুষের সামাজিক ভূমিকা। সেই সম্পর্ক গুলোর প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের ভূমিকা আলাদা এবং আচরণ গুলিও আলাদা হয়। কিন্তু বর্তমানে সক্রিয় কিছু পরিবর্তনও ঘটছে। আবার বিভিন্ন দেশে এর ভিত্তি ও ভিন্ন হয়। তার উদাহরণ হিসাবে শব্দ মিত্র বলেন—

“এক দেশের ছেলে বাবার সামনে তামাক খায়, আর এক দেশে খায় না।”^১

এই যে সম্পর্কের এই কাঠামো গত ভিত্তি সেটা কিন্তু আচরণবিধি অনুযায়ী পাণ্টে যায়। এই জন্যই তো বিভিন্ন দেশে সম্পর্কের ভিন্নতা দেখা যায়। কারণ বিভিন্ন দেশের সামাজিক কাঠামো এক নয়।

শব্দ মিত্র জানান, এই সামাজিক সম্পর্কগুলো একটি স্রোতে বয়ে চলেছে। কোথাও থামে না শুধুমাত্র এটাই হয় যে এটা কোথাও পুষ্টি লাভ করে এবং কোথা বা বিকৃত হয়ে যায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তিত হয়ে চলে তীব্র স্রোতে। মানুষ জ্ঞানত বা অজ্ঞানত নিজের মধ্যের ভারসাম্যে পৌঁছতে চায়। শব্দ মিত্র বলেন যখনই তারা ভারসাম্য খুঁজে পায় না তখনই তাদের হ্যামলেটের কথা মনে পড়ে—

“To be or not to be that is the question।”^২

শব্দ মিত্র জানান নাট্যাভিনয়ের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দিয়ে সম্পর্কগুলো ধরা পড়ে একই ভাবে। আর কথা বলার ধরনের ওপর সম্পর্কগুলো বোঝা যায়। শব্দ মিত্রের বহুবার বলা একটা কথা উদাহরণ হিসাবে পাঠকদের কাছে তুলে ধরেছেন। সেটি হল—

“তুমি কাল সকালে আমার কাছে এসো।”

এই বাক্যটি খুব সাধারণ ও সহজ সরল। এটি পড়া মাত্র সকলেই বুঝতে পারে। কিন্তু এই বাক্যটি উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে মনের আবেগগুলি প্রকাশ পায়। যদি প্রথম শব্দটির (তুমি) উপর জোর পরে তাহলে একরকম শোণায় হয়, আবার যখন দ্বিতীয় শব্দ (কাল) এর উপর জোর পরে তখন একরকম। যখন যে শব্দের ওপর জোর পরে সেটার ওপর তার ওপর মানেটা নির্ভর করে।

শম্ভু মিত্র বলেন, এই বাক্যটি চিন্তা করতে করতে, হাসতে হাসতে, কাঁদতে কাঁদতেও বলা যায়। কিন্তু এই সকল অবস্থানে বলার ধরনটাও আলাদা হয় এবং মানেটাও আলাদা শোণায়। তাই শম্ভু মিত্র বলেন—

“সহজ সরল বাক্যটা এতোরকমের জটিল অনুভবের বাহন হয়ে উঠলো যা আমরা প্রথম পড়ে বুঝতে পারিনি।”^৩

সম্পর্কের ক্ষেত্রগুলি এমনই জটিল। অভিনয়ের মধ্যেও এই জটিল সামাজিক সম্পর্কগুলি প্রকাশ পায়। সেখানে বলার পাশাপাশি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আচরণ কণ্ঠের সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম বৈচিত্র্য এই সকলগুলি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আর তাই অভিনয় একটি বিশিষ্ট শিল্পকলা। তিনি একটা উদাহরণে বলেন—তারা কয়েকজন মিলে একটা ঘরে বসে আছে এমন সময় বেঁটে কালো, মোটা ভুরু, হলদেটে একজন লোক দরজার সামনে দাঁড়ায়। এই বিবরণ যখন অন্য কাউকে দেবে তখন ঠিক একই ভাবে দেবেন। লেখার সময়েও ঠিক একই ভাবে লিখবে। কিন্তু যখন মঞ্চে উপস্থিত হয় তখন সে সকল বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থিত হয়। এবং সেগুলি আমাদের চেতনায় গৃহীত হয়। তাই শম্ভু মিত্র বলেন—

“সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক, প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক, নিজের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক, জীবনের ন্যায় ও নীতি সম্পর্কে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস সবই এক সঙ্গে বহুস্তরে প্রকাশ পেতে পেতে চলে নাট্যের পদ থেকে পক্ষান্তরে।”^৪

শম্ভু মিত্র বলেন সমাজের মূলভিত্তি মানুষ এবং মানুষের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক

বহুস্তরের। তিনি মনে করেন সমাজ কোন ভৌতিকপিণ্ড নয়, এটাকে তিনিও নীহারিকা পুঞ্জের মতো আকার বিহীন বলেছেন। কারণ এখানে মানুষেরা গভীরতম আশা আকাঙ্ক্ষা, ন্যায় নীতি বোধ বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের প্রশ্ন নিয়ে অন্তর প্রকৃতিকে নির্মাণ করছে। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে এর ব্যাপ্তিটাকে বিপুল করেছে। যার ফলে সেটি অনিয়তকার হয়ে উঠেছে। আর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেটি উন্মাদের মতো ছুটে চলেছে।

শম্ভু মিত্র বলতে চেয়েছেন আমাদের সমাজ যে দ্রুত পরিবর্তনশীল সেটা আমরা ১৯৪৭ সালের সঙ্গে বর্তমান অবস্থার সঙ্গে তুলনা করলে বুঝতে পারব। স্বাধীনতার পর থেকে আমরা আশাকরি পৃথিবীর ধনী দেশগুলির মতো হয়ে উঠতে। ফলে সমাজ গঠনে দ্রুত পরিবর্তন দেখা যায়। সমাজে মধ্যবিত্তদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় কৃষি প্রধান সমাজ বর্তমানে শিল্পপন্যোৎপাদক সমাজে পরিণত হচ্ছে। এই আনুসঙ্গিক পরিবর্তন কিন্তু সমাজের স্তরে স্তরে হচ্ছে। তাই পরিবর্তনের পাশাপাশি কিছু ক্ষতিও হচ্ছে যেমন কৃষিনির্ভর সমাজের ঐতিহ্য বাহিত মূল্যবোধ পুরানো যে নৈতিক মানদণ্ড এই সকল মানুষ হারিয়ে ফেলছে। কিন্তু হারিয়ে ফেলার পাশাপাশি নতুন মূল্যবোধ, নৈতিক বিশ্বাস কিছুই স্থাপন করতে পারছে না। শম্ভু মিত্র বলেন—

“আমাদের চিন্তার মধ্যে অনেক গোলমাল। বাস্তবের কোনো ঘটনার রূপনির্ণয় বা মূল্যবিচার করার মধ্যেও যেমন গোলমাল, তেমনি গোলমাল আমাদের কাজে ও কথায়।”^৫

শম্ভু মিত্র বলেন, আমাদের সভ্যতা যন্ত্র নির্ভর পশ্চিমী সভ্যতার মতো হয়ে উঠতে চাইছে। যার ফলে মানবিক মূল্যবোধ হারাতে বসেছে। সব কিছু চেষ্টা করছে আশা করছে কিন্তু পূর্ণ হলেও কোথাও একটা লোভ আমাদের মধ্যে থেকে যাচ্ছে। এই সবগুলি বিবরণ দেওয়া মুখে সম্ভব হবে না শম্ভু মিত্র পাঠকদের তা বলেন। তিনি বলেন এই ক্ষেত্রের মূল অন্বেষণ করার এক অতুলনীয় মাধ্যম হল নাট্যাভিনয়। এই অভিনয়ের মাধ্যমে নেশা গ্রস্ত মানুষ বহুস্তর বাস্তবকে বুঝতে পারবে গভীর ও সূক্ষ্মভাবে।

শম্ভু মিত্রের এক বন্ধু পুল দেশপাণ্ডে একদিন তাঁকে একটা গল্প বলেছিল। সেটা হল পশ্চিমের লোক আঙুল গুনতে শুরু করে বুড়ো আঙুল দিয়ে। তাদের বুড়ো আঙুলে এক তর্জমাতে দুই হয়। আমরা শুরু করি তর্জনা থেকে তর্জনীতে আমাদের পয়লা নম্বর হয়। তাই শম্ভু মিত্র বলেন—

“একদেশের আচরণ, অনুভবের ধরন, অন্য এক দেশে সোজা তুলে এন চালানো যায় না।”^৬

আলোচনার শেষে এসে শম্ভু মিত্র বলেন, প্রত্যেক দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে সময়ের সঙ্গে পরিবর্তন হওয়াটা উচিত। অন্যদেশের সঙ্গে তাল মেলাতে গেলে সেটা সম্পূর্ণ হবে না। আবার তিনি দেশীয় হওয়ার জন্য প্রাচীনকালের রূপটা অবলম্বন করতে নিষেধ করেছেন কারণ সময়টাকে পিছিয়ে দেওয়া যায় না। আজকের বাস্তব আজকের চিন্তাধারা যেটা আমাদের মনের সঙ্গে আছে সেটা প্রকাশিত হবে না, নাটকের ক্ষেত্রেও বলেন যে নাট্য রূপটা আজকের চিন্তাধারা অনুযায়ী সৃষ্টি করতে। তাই তো কিছু অস্থির চিন্তা নাট্যশিল্পী আছে। গভীর অর্থময় নাট্যাভিনয়ের সম্মান করে চলেছে ভারতবর্ষের ভিন্ন জায়গায়। শম্ভু মিত্র বলেন তিনি তাদের অনুকরণ করছেন। কারণ তাঁর মনে হয়েছে সমাজের গভীর বাস্তবটা তারাই তুলে ধরতে পারবে জনমানস চক্ষে।

মহর্ষি (১৯৫৪):

‘পিতাতর্পণ’ প্রবন্ধের ন্যায় এই প্রবন্ধেও শম্ভু মিত্র মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের প্রতি তার শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছেন। শম্ভু মিত্র জানিয়েছেন, সেদিন ভোরবেলায় মহর্ষির একছেলে নরনারায়ন এসে জানালেন যে—‘আপনাদের সভাপতি মারা গেছেন’—খবরটা শোনামাত্র প্রাবন্ধিকদের সবকিছু যেন গোলমাল হয়ে যায়। এর আগেও ‘মহর্ষি’ বেশ কয়েকবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। তবে সম্প্রতি তাঁর শরীরটা একটু ভালোই ছিল বলে প্রাবন্ধিকের মনে হয়েছিল। ফেব্রুয়ারির শুরুতেই ‘বহুরূপী’-এর সাথে তাঁর দিল্লি যাওয়ার কথা ছিল অভিনয়ের জন্য। কিন্তু এরমধ্যেই এমন মমাস্তিক ঘটনা ঘটে গেল। দু-একজনকে প্রাবন্ধিক এই সংবাদটা জানাতেই সকলে

কেমন ভাবে যেন বলে ওঠে—‘মহর্ষি’। তাদের গলার স্বর শুনে মনে হয় এই মৃত্যুটা হওয়া যেন উচিত ছিল না। তারপর বজ্রাহতের ন্যায় ফ্যাল ফ্যাল করে তাঁকিয়ে থাকে।

এরপর প্রাবন্ধিক মহর্ষির বাড়িতে গিয়ে দেখলেন—তিনি শুয়ে আছেন, আর মুখটা যেন গম্ভীর। এই মুখ দেখে মনে করা শক্ত যে, তিনি আর নেই। এই মুখ প্রাবন্ধিকের জানা। যখন কোনো একটা বিশেষ কথা নিয়ে তিনি ভেবে ভেবে একটা মত স্থির করে তা বলবার আগে এমনই মুখের ভাব হয় তাঁর। শম্ভু মিত্র জানিয়েছেন কিছুদিন আগেই ‘বহুরূপী’ ওখানে গিয়ে মহর্ষি এমনই মুখের ভাব করে বলেছিলেন—

“যদি ডিসিপ্লিন থাকবে তদিনই ‘বহুরূপী’ থাকবে। আর এই ডিসিপ্লিনই যদি না থাকে তো দরকার নেই ‘বহুরূপী’র থাকবার।”^২

এই মহর্ষির মৃত্যুত ‘বহুরূপী’তে পিতৃ বিয়োগের কষ্ট। এই সংঘ গড়ার অনুপ্রেরণা প্রাবন্ধিকরা তাঁর থেকেই পেয়েছিলেন। নাট্যদলের নামকরণ ‘বহুরূপী’ তাঁরই করা। নাট্যদল গঠনের শুরুতে এক অন্ধকারময় পরিস্থিতিতে তিনি বলেছিলেন—

“What is the use of eating our hearts out. আমরা যেমন করে পারি, সেটা ভালো মনে করি, করতে শুরু করে দিই। আমাদের সঙ্গে তো ঝগড়া নেই কারোর। শুরু করো, একটা কিছু শুরু করো।”^২

কিছুক্ষণের মধ্যেই সাদা ফুলে ফুলে বিছানার চারধারটা ভরে যায়। আর এসব দেখে প্রাবন্ধিকের মনে হয় মহর্ষির মুখটি যেন একটু বেশিই গম্ভীর, যেন এসব তিনি বারণ করবেন। যে মানুষটি জীবনে শত দুঃখের মধ্যেও মুখের হাসিটিকে অল্লান রেখেছিলেন, যে মানুষটি জীবনের শেষক্ষণ পর্যন্ত দেবী ভারতীর পূজা করেছেন তাঁর শেষ শয্যা এই সাদা ফুলে রিন্ত দেখায়। তাই প্রাবন্ধিকের মনে হয়েছিল সাদা ফুল নয়, লাল ফুল, রঙিন ফুল দিয়ে তাঁকে সাজানো উচিত।

মহর্ষির সাদা সিল্কের মতো চুলের নীচের ঐ বিশাল মুখটা যে রসিকতায় টুইটুস্বর ছিল, তা ‘বহুরূপী’র সবার জানা। তাঁর উপস্থিতির মুহূর্ত কালীময় করে উঠত হাসিঠাট্টার বর্ণাঢ্যতায়।

এই সরসতাকে বাদ দিয়ে মহর্ষিকে মনে করা শক্ত। এক ছবিতে রামকৃষ্ণের চরিত্রে তাঁর অভিনয় দেখে একজন ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম করে বলেছিলেন, রামকৃষ্ণ ঠাকুরের সাথে নিশ্চয় তাঁর আত্মিক যোগাযোগ ছিল। নাহলে এমন চরিত্র রূপায়ন সম্ভব হত না। মহর্ষি তাকে বলেছিলেন—

“তা আমি তো কোনোদিন চোরের পার্টও করতে পারি আর সেটা ভালো হতে পারে। তাহলে কি বলবেন চোরের সঙ্গেও আমার আত্মিক যোগাযোগ আছে?”^৩

শম্ভু মিত্র আরো জানিয়েছেন যে, একবার এক যুবক রাস্তায় মহর্ষিকে দেখে বলে যে, তাঁর যেমন-তেমন ছবিতে অভিনয় করা উচিত নয়। কারণ তারা তাঁকে শ্রদ্ধা করে। তাঁর উচিত কেবলমাত্র শিল্পগুণ সমন্বিত ছবিতে অভিনয় করা। মহর্ষি তাকে উত্তর দিয়েছিলেন—

“আচ্ছা, এবারে যখন কেউ টাকা নিয়ে আমায় অভিনয়ের জন্যে ডাকতে আসবে, আমি বলে দেবো যে, না বাপু। তোমরা আমায় বাদ দিয়ে ছবিটা তুলে ফেলো। তারপর যদি দেখে ভালো মনে হয় তো তখন আমি ছবিতে ঢুকে যাবো, নইলে যারা আমায় শ্রদ্ধা করে তাদের বড়ো অসুবিধে হয়।”^৪

অনেকে বলে থাকেন, এমন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ রবীন্দ্রনাথের পরে আর কাউকে দেখা যায়নি। তাঁকে দেখলেই আপন বলে মনে হতো। মন ভরে যেত তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায়।

শম্ভু মিত্রেরও ছিল তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। রঙ্গালয়ের উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে যে কজন নিজেদের চারিত্রিক ভদ্রতা বজায় রাখতে পেরেছিলেন তাঁদের মধ্যে মহর্ষি অগ্রগণ্য। শম্ভু মিত্রের সাথে মহর্ষির প্রথম আলাপ হয় রঙমহল থিয়েটারে। নিজে থেকে এসে তিনি প্রাবন্ধিকের সাথে আলাপ করেন। থিয়েটারে নতুন কোনো লোক ঢুকলেই তিনি তাঁর সাথে আলাপ করে তাঁকে বাজিয়ে দেখতেন। তিনি সর্বদা খোঁজ করতেন তাঁরই মতো আশা নিয়ে, তাঁরই মতো আদর্শ নিয়ে থিয়েটারে যোগ দেবে এমন মানুষের। তিনি অনেককে স্নেহ দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে বিদ্যা দিয়ে, জ্ঞান দিয়ে উন্নত করতে চেয়েছিলেন যাতে থিয়েটারের ভালো হয়, আর তারাও যেন

নিজেরাও ভালো হয়। কিন্তু উন্নতির চরমচূড়া স্পর্শ করার আগেই খ্যাতির ফেনায় চমুক দিয়ে নিজের পিচ্ছল পথে পিচ্ছনে গেছে অনেক দূরে। এর জন্য তাঁকে কষ্ট পেতেও দেখেছেন প্রাবন্ধিক।

কিন্তু গণনাট্য আন্দোলন শুরু হতেই তিনি যেন একটা ভরসার জায়গা পেলেন। নানা পরামর্শ দিতে শুরু করেন প্রাবন্ধিকদের। একটা চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন—

“Individualism বা ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথায় কাঁচা আমিতেই তো যতো গোল! কিন্তু ও কাঁচা ঘুটিকে পাকিয়ে তুলে ‘পাকা আমি’ করে তোলা শুধু সাধনার কর্ম নয়। বিশ্বাসীদের পক্ষে, ভগবৎ কৃপার দরকার আর বিপ্লবীদের পক্ষে দরকার সমাজের আমূল পরিবর্তন চেষ্টা করা। ... কর্মের পথেই জ্ঞান শুদ্ধতর হয়, গভীরতর হয়। কর্ম যেমন জ্ঞানের মূল, দেহ তেমনি কর্মের মূল। তোমার দেহের গুণগুলির সঙ্গে লড়াই সমানে চালিয়ে যেয়ো সঙ্গে সঙ্গে, যতদিন না সে বেটারা সমূলে উচ্ছেদ হয়।”^৫

তবে যখন আর এই গণনাট্য সংঘের সাথে কাজ করা সম্ভব হল না। তখনই তাঁরই উদ্যোগে গড়ে উঠল ‘বহুরূপী’। তাঁর উদ্যোগ, উপদেশ না থালে নবনাট্য আন্দোলন এতটা সাফল্য অর্জন করতে পারত না। শম্ভু মিত্র জানিয়েছেন, পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের অস্বাভাবিক বাচনভঙ্গী ছেড়ে সে স্বাভাবিক অভিনয়ের চেষ্টা করেছেন তাঁর প্রথমেই রয়েছেন মহর্ষি ও যোগেশ চৌধুরী মহাশয়। ঐ দুজন অসামান্য অভিনেতা বাংলা আধুনিক অভিনয় ভঙ্গীর প্রবর্তক। ‘নবান্ন’ নাটকের অভিনয়ের সময় চট্টের পর্দার ব্যবহার মহর্ষির উপদেশেই করা হয়।

শেষ পর্যন্ত মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে প্রাবন্ধিক শম্ভু মিত্রের মনে একটা আক্ষেপ থেকেই গেল যে, তাঁরা মহর্ষির কাছ থেকে অনেক অভিনয় শিক্ষা পেলেও তাঁকে খুশি করতে বা শান্তি দিতে পারেননি। যদি তাঁরা মহর্ষির মৃত্যুর আগে নিজেদের একটা মঞ্চ তৈরি করে সেখানে সবাই এসে নাট্য প্রযোজনার নতুন নতুন রীতি নিয়ে পরীক্ষা করতে পারত তাহলেই মহর্ষিকে খুশি করা যেত, তাঁকে শান্তি দেওয়া যেত। যে মঞ্চ হত নবনাট্য আন্দোলনের নিজস্ব

মঞ্চ। এই মঞ্চ তৈরি নিয়ে প্রাবন্ধিকরা অনেকবার ভাবনা-চিন্তা-আলোচনা করলেও টাকার অভাবে তা বাস্তবায়িত করে তুলতে পারেননি। শম্ভু মিত্র বলেছেন—

“যারা আগ্রহশীল যারা দিয়ে আনন্দ পাবে, তাদের টাকা নেই। আর যাদের টাকা আছে তাদের এ ব্যাপারে আগ্রহ নেই। ... আমাদের তবু পারা উচিত ছিলো। পারা উচিত ছিল একটা মঞ্চ তৈরি করতে। মহর্ষির কাছে প্রমাণ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল যে, আপনার আশার সম্মান আমরা রাখবো, আমরা একেবারে অপদার্থ নই।”^৬

ঠিক করা হয়েছিল যে, মঞ্চ তৈরি হলে তার পেছনে একটা ঘরে মহর্ষি থাকবেন। তিনি বলতেন—

“বুড়ীটাকেও নিয়ে আসবো তোমাদের কমিউন ‘মাদার’ হবে। করো করো। ... অনেক ভেঙে যাওয়া দেখলুম, একটা কিছু গড়ে তোলো। এমন করে গড়ে তোলো যা থাকবে।”^৭

তবে এখন আর শম্ভু মিত্রের ভাবনার বা বলবার কিছু রইল না। শ্মশানের চিতার আগুনে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই এই মহৎ মানুষটির অস্তিত্ব চিরদিনের মতো হারিয়ে গেল। বাড়ি থেকে যাকে আনা হল সে আর কোথাও নেই, কোথাও না।

শিশির কুমার (১৯৫৯):

প্রাবন্ধিক শম্ভু মিত্রের মহান অভিনেতা শিশির কুমার ভাদুড়ির স্মরণে লেখা ‘শিশির কুমার’ নামক প্রবন্ধের শুরুতেই প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন, আমাদের জীবনে কখনই কোনো বড়ো কিছু ঘটে তখনই আমরা আবেগের বশবর্তী হয়ে শান্তি পাওয়ার জন্য চেনা কথার, চেনা গণ্ডীর মধ্যে কথা দিয়ে তাকে বাঁধতে চাই। তাই প্রাবন্ধিকের মতে শিশিরকুমারের মৃত্যুতে হয়তো বলা হবে—

“শিশির কুমারের সঙ্গে সঙ্গে একটা যুগ অন্তিমিত হলো।”^১

অনেকে হয়তো বলবে, বাংলার রঙ্গমঞ্চ থেকে সশ্রুট আলমগীর বেরিয়ে গেলেন বা এযুগের নাট্যা আচার্য ভারতের তিরোধান ঘটল।

কিন্তু চেনা এই মানুষটিকে কেবলমাত্র বাছাই করা কতগুলি বিশেষণ দিয়ে তাঁর মূল্য চুকিয়ে দেওয়া সম্ভব নয় বলে শম্ভু মিত্র মনে করেন। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক ‘দিগ্গিজয়ী’ নাটকে নাদির শাহের ভূমিকায় অবতীর্ণ শিশির কুমারেরই একটি উক্তি তুলে ধরেছেন—

“তোমার কল্পনার চেয়ে আমি বৃহৎ, তোমার আদর্শের চেয়ে আমি মহৎ,
তোমার কল্পনার সাধ্য কী তার সংকীর্ণ গপ্তীর মধ্যে আমাকে বেঁধে রাখে।”^২

শম্ভু মিত্র জানিয়েছেন, শিশিরকুমারের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হতো, যেন অনেকগুলো ব্যক্তিত্বের একটা জটিল সংমিশ্রনেই এই অনন্য মানুষটির সৃষ্টি হয়েছে। তাই তাঁর সাথে বাগড়া, রাগারাগি হলেও তাঁকে আত্মীয় বলেই ভাবতেন। পেশাদার লোলুপতার মধ্যে একমাত্র তিনিই ছিলেন যিনি পা দিয়ে পয়সা ছুড়ে ফেলতেও দ্বিধা করতেন না, তাঁর এই আচরণে অনেকে তাঁকে দাম্ভিকও বলতেন। অথচ সে মানুষটা নিজের সমস্ত কিছু দিয়ে যা সৃষ্টি করেছেন, সেই সৃষ্টির ফল যখন তাঁর জীবদ্দশাতেই জাতীয় উত্তরাধিকারে পরিণত হয়েছে, তখন সার্থক শ্রম মানুষটি, আত্মবিশ্বাসে ভর করেই বলেছেন—

“কষ্ট আর কদিন? যে কদিন বাঁচবো, এই তো? কিন্তু তারপরে? এই
তোমাদেরই শোকসভা করতে হবে। দল বেঁধে চাঁদা তুলে মূর্তি গড়িয়ে সভা
করে তার গলায় মালা দিতে হবে।”^২

কিন্তু যারা এমন মানুষের কথা বুঝতে পারেন না, সেই হীন মানুষেরাই তাঁর কথার হীন অর্থ করে বলে প্রাবন্ধিক মনে করেন।

প্রাবন্ধিক শিশিরকুমারের সংস্পর্শে রয়েছেন প্রায় ১৯ বছর। অল্প বয়সে উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর অভিনয় দেখে আশ্চর্য হয়ে প্রাবন্ধিক ভাবতেন, এমন জীবনীশক্তি একটি মানুষের থাকে কীভাবে? একজন বিরাট মানুষের বিরাট আবেগ ও অনুভূতি প্রকাশ করতে অভিনেতার

প্রবল জীবনীশক্তির প্রয়োজন। একই সাথে অভিনেতাকে দেহের ও মনের একাগ্রতাকে ব্যবহার করতে হয়। এই একাগ্রতাকে ধরে রাখতে যে শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্যের প্রয়োজন তা যে শিশির কুমারের মধ্যে লক্ষ্য করতে পারেনি তাঁকে প্রাবন্ধিক ‘হতভাগ্য’ বলেছেন।

এমন দুর্দমনীয় শক্তি ছিলো বলেই শেষ পর্যন্ত জীবনের মাথায় পা দিয়ে তিনি বাঁচলেন। আবার যেদিন তাঁর যাবার সময় হলো তখন তিনি তুড়ি মেরে চলে গেলেন। প্রাবন্ধিক উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া শিশিরকুমারের এই স্পর্ধিত বাঁচার মানসিক ঔদ্ধত্য কখনও ভুলতে চান না। শিশির কুমার বদলে দিয়েছিলেন তাঁর যুগের থিয়েটার, যাতে প্রাবন্ধিকরা তাঁদের যুগের কাজ করতে পারেন। তাই প্রাবন্ধিক শম্ভু মিত্র বলেছেন—

“কাজের শেষে এমনি স্পর্ধিতভাবে যেন আমরাও বলতে পারি যে কষ্ট আর কদিন, যে কদিন বাঁচবো, এই তো?”^৪

গঙ্গাদা (১৯৭১):

প্রাবন্ধিক শম্ভু মিত্র জানিয়েছেন যে, এই গঙ্গাদার সাথে তাঁর পরিচয় ১৯৪৩ সাল থেকে। তবে এই চেনাটা বাইরের আর পাঁচটা লোককে চেনার মতো নয়। শম্ভু মিত্র বলেছেন—

“এটা কাজের ক্ষেত্রে চেনা। অনেক সুখে, অনেক দুঃখে অনেক প্রশংসা অভিনন্দনের মধ্যে, অনেক অপমানের মুহূর্তে, আমরা পরস্পরকে চিনতুম। আমারও একটা পরিচয় গঙ্গাদা জানতেন, তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমার সে পরিচয়টাও মরে গেল।”^১

এমন পরিচয় তৈরি হয় অনেক দিন একত্রে অনেক নাটকে অভিনয় করতে করতে। ইংরাজিতে এই পরিচয়কে বলা হয় *under standing*। এর ফলে যারা অভিনয় করে ও যারা অভিনয় দেখে তাঁরা সকলেই যেন এক অনন্য রসের আস্বাদ পায়। আর এই রসের আস্বাদ যে পেয়েছে তার কাছে অভিনয়ের গিমিক তুচ্ছ বলে মনে হয়।

তবে প্রাবন্ধিক এও মনে করেন যে, পরিচয়ের গভীরতার ভেতরের যাওয়া সকলের

পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ হিসেবে তিনি বলেন যে, পরিচয়ের গভীরতায় যেতে হলে নিজেকে উন্মোচিত করার প্রয়োজন থাকে। তাই সমস্ত তুচ্ছতা দীনতা নিয়েও নিজেকে সম্পূর্ণ মানুষ এবং অপরজনও যে তাই এই উপলব্ধি নিজের মধ্যে জেগে ওঠে। আর এই উপলব্ধি থেকেই গঙ্গাদার সাথে প্রাবন্ধিকের পরিচয়।

প্রাবন্ধিক শম্ভু মিত্র বিশ্বাস করেছিলেন যে—‘শিল্পকলার দ্বারাও লড়াই করা যায়।’ তাইতো সততার হাত ধরে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন নিজেদের সংস্থাকে। কুড়ি বছর আগে ‘চার অধ্যায়’ অভিনয় করে প্রাবন্ধিকরা মানুষকে সচেতন করতে চেয়েছিলেন। এর জন্য পরবর্তীতে ‘দশচক্র’, ‘বিসর্জন’ অভিনয় করলেন। কিন্তু বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী, নীতিহীন, অসহিষ্ণু প্রতিপক্ষরা তাদের অর্থবল, বাহুবল, নীচতার বল ও প্রচার যন্ত্রের ব্যাপক কৌশলের দ্বারা প্রাবন্ধিকদের হারিয়ে দিয়েছে। তাই শম্ভু মিত্র আক্ষেপের সাথে বলেছেন—

“দেশকে আমরা যে দুর্ভাগ্য থেকে বাঁচাবো ভেবেছিলুম তা পারিনি।”^২

তবে তিনি এও জানতে চেয়েছেন—

“অতো বড়ো হিটলার যার দাপটে পৃথিবীর সর্বত্র ত্রাহি ত্রাহি ডাক উঠেছিল, কটা বৎসর রইল সে। মাত্র কত ক’টি বৎসর। তাই যারা আমাদের এই বাংলাদেশকে সর্বনাশের পথে টেনে নিয়ে যেতে পেরে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে তারাও কি সত্যিই জিতলো? জিতবে?”

জিতলো যে সে জিতলো কিনা / কে বলবে তা সত্য করে”^৩

১৯৪৪ সাল থেকে ব্যাপ্ত এই লড়াই এর একজন যোদ্ধা গঙ্গাদার মৃত্যুতে তীব্র মর্মান্বিত হয়ে প্রাবন্ধিক বলেছেন—

“এবার যখন বড়ো ক্লান্ত লাগবে, যখন ভীষণ একটা আতঙ্ক চারদিক থেকে ঘিরে ধরবে, তখন আমার কাছে গঙ্গাদা থাকবে না। এক ধরনের কথা কইবার সুযোগ আমার আর রইল না।”^৪

পৃথ্বীরাজ জী:

শম্ভু মিত্র জানিয়েছেন, ১৯৪৪ সাল থেকে পৃথ্বীরাজজীর সঙ্গে তাঁর পরিচয়। বাংলার মতান্তর পীড়িত লোকদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে ছবি তোলায় জন্য একাধারে নট-নাট্যকার, নাট্যপরিচালক ও প্রাবন্ধিক শম্ভু মিত্র ও তাঁর সংস্থা বিজন ভট্টাচার্যের ‘নবান্ন’ নাটকের হিন্দি অনুবাদ ‘অন্তিম অভিলাষ’ অভিনয় নিয়ে পাড়ি দিয়েছিলেন বোম্বে। সেখানে প্রতিটি সন্ধ্যায় অভিনয়ের পর নিজে এসে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের জন্য চাঁদা তুলেছেন পৃথ্বীরাজ জী। তখন থেকেই নিয়মিত অভিনয় করার ইচ্ছা ছিল তাঁর। এরপর শম্ভু মিত্র ‘ধরতি কে লাল’ ছবি করার জন্য পুনরায় বোম্বে গিয়ে পৃথ্বী থিয়েটারের নাট্যাভিনয় ‘গদার’, ‘শকুন্তলা’, ‘দিওয়ার’ দেখেন। শম্ভু মিত্র পৃথ্বী থিয়েটার সম্পর্কে জানিয়েছেন—

“তখন কলকাতায় যেসব পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ চালু ছিল তাদের তুলনায় ঢের বেশী আধুনিক, ঢের বেশী সমাজ সম্পৃক্ত বলে মনে হয়েছিল তাঁর নাটক চয়ন, তাঁর প্রয়োগ পদ্ধতি। বিশেষ করে ‘গদার’ আমাকে মুগ্ধ করেছিল।”^১

প্রাবন্ধিক শম্ভু মিত্রের মতে, পৃথ্বীরাজ জী ছিলেন একজন অনন্ত যৌবন, প্রাজ্ঞল, উন্মুক্ত ও হৃদয়বান ব্যক্তি। তাঁর মতো স্নেহ প্রবন, বিষয়ী ও সদাচারী লোক খুব কমই রয়েছে। তাঁর আত্মীয়তায় প্রাবন্ধিক পৃথ্বী থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। প্রাবন্ধিক বলেছেন, পাঠান বলতেই যে বিশাল দেহ, উদার হৃদয় ও অতিথি বৎসল ব্যক্তির ছবি ভেসে ওঠে পৃথ্বীরাজ জী যেন তেমন ব্যক্তি। আর তাই তাঁর মৃত্যু শম্ভু মিত্রের কাছে যেন আপন আত্মীয় বিয়োগের সমান কষ্টের।

প্রথমবার যখন পৃথ্বীরাজ জী তাঁর থিয়েটার্সের সঙ্গে কলকাতায় এলেন তখন তাঁর সম্মানার্থে একদিন ‘ছেঁড়াতার’ নাটকের অভিনয় করেছিলেন প্রাবন্ধিকরা। এরপর একদিন একটি বাগানে আমন্ত্রণে গিয়ে অমর গাঙ্গুলি, কুমার রায়, শোভেন মজুমদার, অশোক মজুমদারদের তিনি বলেন—

“ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তোমাদের চাকরি গুলো যেন তাড়াতাড়ি চলে যায়, তাহলেই বহুরূপীর কাজ আরো জোর হবে।”^২

শম্ভু মিত্র তাঁর স্মৃতিচারণ করে জানিয়েছেন একবার বোধেতে অভিনয় করতে গেলে পৃথ্বীরাজ জী তাঁর পুরানো একটা ছোট গাড়িতে করে তাঁদের নিয়ে যান একটি গুদাম বাড়িতে। সেখানে পৃথ্বী থিয়েটার্সের সমস্ত জিনিসপত্র জড়ো করে রাখা আছে। সেখানে পৌঁছে পৃথ্বীরাজ জী সমস্ত ঘুরিয়ে দেখাতে দেখাতে বললেন—

“এইখানে একটা মঞ্চের মতো করে রেখেছি। একলা এসে মাঝে মাঝে আমি একাই অভিনয় করি। নানান চরিত্রে নিজেকে কল্পনা করি।”^৩

এরপর সেখান থেকে মাতৃঙ্গার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খাওয়ালেন। ফেরার সময় পৌঁছে দেবার জন্য তিনি প্রাবন্ধিকদের সাথে সিড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন। তাঁকে অণুনের সাথে নামতে নিষেধ করা হলে তিনি ফিক করে হেসে বলেন—

“না নামলে তো ওঠবার সুযোগ পাওয়া যাবে না।”^৪

জীবনের শেষ দিনগুলি তিনি জুহুতেই কাটিয়েছেন। যখন তিনি নিয়মিত জুরে ভুগছিলেন তখন শম্ভু মিত্র দেখা করতে গেলে ঐ অসুস্থ শরীরেই ‘অয়দিপাউস’ দেখতে আসবেন বলে জানিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর ছেলে ঘরের দরজা বন্ধ করে তাঁকে আটকান। তবে শশী কাপুর অভিনয় দেখেছেন শুনে বলেছিলেন—‘দেখেছেন কি বদমাস।’

শেষে প্রাবন্ধিক শম্ভু মিত্র জানিয়েছেন যে, পৃথ্বীরাজ জী সমগ্র ভারতবর্ষের অধিবাসী ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন ভাষা তিনি শিখেছিলেন। তবে ইউরোপীয় ভাষা নয়, দেশকে ভালোবেসে দেশের মানুষকে ভালোবেসে শিখেছিলেন ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় ভাষা। এমনকি জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে শিখেছিলেন তামিল ভাষা। এমন এক মহান ব্যক্তিকে শতবার প্রণাম জানিয়েছেন শম্ভু মিত্র।

বটুকদা, বিজন ও আমি (১৯৭৮):

প্রাবন্ধিক শম্ভু মিত্র জানিয়েছেন যে, তিনি বটুকদা ও বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবেই কাজ করেছেন। এঁদের সঙ্গে একত্রে কাজ করার জন্য তিনি যে প্রশংসাও পেয়েছেন

অনেকের কাছে তাও শব্দ মিত্র স্বীকার করেছেন। তবো কোনো কমিটিতে বসে শিল্পকর্ম সম্বন্ধে আলোচনায় তাঁদের তিন জনেরই আতঙ্ক ছিল। এই তথাকথিত এই ‘ডিমোক্র্যাটিক মিটিং’ সম্পর্কে তাঁরা অনেক ঠাট্টাও করতেন। কিন্তু প্রাবন্ধিক স্বীকার করেছেন যে, তত্ত্ব হিসাবে ডিমোক্র্যাটীতে তাঁর বিশ্বাস ছিল। তাই বলে যাঁরা শিল্পকলা সম্পর্কে কোনো দিন কিছু ভাবেনি, তাঁদের শিল্প সম্পর্কে কোনো বোধ নেই, অথচ মার্কসীয় শিল্পতত্ত্বের গালভরা তত্ত্ব জানা আছে, তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছনো প্রাবন্ধিকের ক্ষমতায় কুলোত না। বরঞ্চ তাঁরা তিনজনে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে দ্রুত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে কারো কোনোও অসুবিধা হত না। আর এই দ্রুত আলোচনাই তাঁর বুদ্ধিকে আরো উজ্জীবিত করতো বলে প্রাবন্ধিক শব্দ মিত্র জানিয়েছেন।

তবে ‘ডিমোক্র্যাটী’ মানে যে কেবল তিনজনে মিলে সিদ্ধান্ত নেওয়া নয়, এর সূত্র যে আরো বিস্তৃত ও ব্যাপক হওয়ার প্রয়োজন তা প্রাবন্ধিকরা জানতেন। কিন্তু কীভাবে যে এই সংগঠন গড়ে উঠবে তা নিয়ে তাঁদের মধ্যে সংশয় থেকে যায়। অথচ তিনজনেরই তখন ‘dare’ করার জন্য উন্মুখ আগ্রহ। প্রাবন্ধিক বলেন, বাগবাজারের কোনো এক বাড়িতে এক সভায় তিনি ‘মধুবংশীর গলি’ আবৃত্তি করেন। সেখানে এক রাজনীতির ভদ্রলোক যিনি খ্যাতিমান বোদ্ধা হিসেবে পরিচিত ছিলেন তিনিও উপস্থিত ছিলেন। তবে কবিতা পাঠ করার পর প্রাবন্ধিকরা সেই ‘বোদ্ধা’ ও তাঁর সঙ্গ পঙ্গদের মুখ দেখে নিজেকে বোকা বলে বোধ হয়েছিল। তবে গৃহস্বামী জগদ্ধাত্রী বাবু তাঁদের কবিতা পাঠের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। এরপর প্রাবন্ধিক ও তাঁর বটুকদা এই পৃথিবীতে কারো কিছু না বোঝা নিয়ে কথা বলতে বলতে সেই রাত্রিতেই অনেক ক-মাইল হেঁটে ফিরে গেলেন।

পরবর্তীতে ‘মধুবংশীর গলি’ কবিতা নিয়ে অনেক হৈ হৈ হলে সেই ‘বোদ্ধা’ ব্যক্তি ভূয়সী প্রশংসা করে প্রাবন্ধিক ও বটুকবাবুর অনেক প্রশংসা করলেন। প্রাবন্ধিক বলেছেন—

“এসব ঘটনা কিছু নতুন নয়। অতীতেও নিশ্চয় অনেক ঘটেছে। এবং চিরকাল বোধ হয় এই রকমই ঘটতে ঘটতে যাবে। এই এক বড়ো মজা।”^১

তবে প্রাবন্ধিক মনে করেন, যদি তিনি এই ‘বোদ্ধা’ লোকের সঙ্গে মিটিং করে আলোচনা করতেন সেদিন তাহলে ‘বোদ্ধা’ ব্যক্তি সদলবলে প্রমাণ করে দিতেন আবৃত্তি করা উচিত হয়নি। তাই মিটিং না করাই তিনি বেঁচে গেছেন। তবে ‘মিটিং’ না করা ব্যাপারে যে সবচেয়ে গোঁয়ার প্রাবন্ধিক ছিলেন তা তিনি স্বীকার করেছেন। তবুও নাটক যেহেতু একটি সংঘের বিষয় তাই পাঁচজনের সাথে ভাবের আদান-প্রদান না থাকলে সংঘের টিকে থাকা অসম্ভব। এই সমস্যা দেখা দিয়েছিল প্রথমে গণনাট্য সংঘে। আর এই সমস্যার সমাধান বারবার খুঁজতে হয়েছে ‘বহুরূপী’ নাট্যসংঘকে বিভিন্ন স্তরে। কারণ জীবন একটা স্তর থেকে অন্যস্তরে সর্বদা ভ্রাম্যমান। তাই এক স্তরের সমস্যার সমাধান অন্যস্তরে খাটে না। ফলে নতুন করে আবার সমস্যাটাকে দেখতে হয়। প্রাবন্ধিক বলেছেন—

“তাই বটুকদা আর বিজনের সঙ্গে একত্রে এক সময়ে কাজ করেছি বলে আমি বড়ো কৃতজ্ঞ। অনেক বুঝেছি, অনেক শিখেছি। এবং দুজনেই তো জাত শিল্পী ছিল।”^২

প্রাবন্ধিক বেশি মর্মান্বিত বটুকদার জন্য। কারণ বিজন ভট্টাচার্য আকাদেমি বা অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে সম্মান পেলেও বটুকদা তাঁর গদ্য কবিতাকে সুসজ্জিত শব্দের ছকে বাঁধলেও তিনি কোনো বিশেষ সম্মান পান নি। শম্ভু মিত্রের মতে, গদ্য কবিতায় এমন কথার শব্দের ছক দেখা যায় কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের ‘পরিশেষ’ এর একটি কবিতায়। তবে রবীন্দ্রনাথের তুলনায় বটুকদার বলার ভঙ্গী আধুনিক। অথচ তাঁর লেখার এমন অনন্যগুণ সম্পর্কে বিশেষ কোনো আলোচনাই হয়নি—আর তাতেই প্রাবন্ধিক দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

বিজন (১৯৭৮):

প্রাবন্ধিক শম্ভু মিত্র জানিয়েছেন ১৯৪০-এর দশকে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠিত হলে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে অভিনয় করার একটা প্রবনতা শুরু হয়। তবে যে নাটকগুলো সেই সময় পাওয়া যাচ্ছিল সেগুলো অরুণ মিত্র, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, বিনয় ঘোষ, বিজন ভট্টাচার্য ও প্রাবন্ধিকের অভিনয়ের জন্য পছন্দ হয়নি। তাই একদিন একজন প্রস্তাব দেয়

যে, নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে একটি নির্ধারিত আলোচনা সভায় উপস্থিত সকলে একটা করে নাটিকা লিখে এনে পাঠ করবেন। তার মধ্য থেকেই একটিকে নির্বাচিত করা হবে অভিনয়ের জন্য। সেই নির্ধারিত সন্ধ্যায় বিনয় ঘোষের ‘ল্যাবরেটরি’ ও বিজন ভট্টাচার্যের ‘আগুন’ নাটক দুটি নির্বাচিত হয়।

বিজন ভট্টাচার্য তাঁর ‘আগুন’ নাটকটিতে অভিনয়ের জন্য একটি চরিত্রের কথাগুলো শম্ভু মিত্রকে দিয়ে বলান। এর আগে শিশিরকুমার, অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখদের সাথে শম্ভু মিত্র বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করলেও জীবনযুদ্ধে বিব্রত সামান্য, এক কেরানী বা চাষীর কথাগুলো তিনি কিছুতেই বলতে পারলেন না। অথচ অভিনয়ে অনভিজ্ঞ কয়েকজন ছেলে দিব্যি সেগুলো বলে দিল। এর আগে ‘নীল দর্পণ’ নাটকে এই রকম শব্দের ছক কিন্তু গ্রাম্য লোকের কথায় তাকলেও বিজন ভট্টাচার্যের লেখার সমস্তটাই এই ছকে বাঁধা। অভিনয়ের আদর্শ হিসেবে যখন পশ্চিমী নাটক, পশ্চিমের সাজসজ্জাই প্রাধান্য পাচ্ছে তখন অনেকে গ্রাম্য অবস্থাকে ‘রিভাইড্যাল’ করা হচ্ছে না বলে প্রশ্ন তোলেন। সেই সজ্জিত পর্যায়ের প্রথম পদক্ষেপ হল বিজন ভট্টাচার্যের ‘আগুন’। তারপর ‘জবানবন্দী’ ও তারপর ‘নবান্ন’।

শম্ভু মিত্র জানিয়েছেন বিজন ভট্টাচার্যের অগোছালোপনা তাঁকে পীড়িত করত। তার জন্য তিনি বিজন ভট্টাচার্যকে বোঝবার চেষ্টা করেছেন। এমনকি বকাবকিও করেছেন। তবে ক্রমশ প্রাবন্ধিক বুঝতে পারলেন যে, বিজন ভট্টাচার্যের এই অগোছালো স্বভাবের মধ্যেই লুকিয়ে আছে তাঁর কলা প্রতিভা। তাই যদি তাঁর এই অগোছালোকে জোর করে বাইরে থেকে সুবিন্যস্ত করার চেষ্টা করা হয়, তাহলে তাঁর প্রতিভা যাবে শুকিয়ে। আর এমনই হবে সবচেয়ে বড় ক্ষতি। শম্ভু মিত্র এখানে এক মনীষীর উক্তি উল্লেখ করেছেন—

“যে পারে সে করে, আর যে পারে না শেখায়। অর্থাৎ তারা শেখাতেও পারে না। তারা শুধু মূর্খব্রিয়ানা করে।”^১

আসলে প্রাবন্ধিক বুঝতে পেরেছেন যে, বিজন ভট্টাচার্যই পারেন তাঁর কলা প্রতিভাকে ফুটিয়ে তুলতে। আর এই পারার ক্ষমতা সকলের থাকে না। তাই বাইরে থেকে ‘নির্বোধ পণ্ডিতের’ মতো

শুধু উপদেশ না দিয়ে বোঝার চেষ্টা করা উচিত। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে শব্দ মিত্র বলেছেন, বিজন ভট্টাচার্যের ‘মরাচাঁদ’ নাটকের একটি দৃশ্যে দেখা যায়, একটা ধাক্কায় তিনি পড়তে পড়তে আতর্নাদ করে ওঠেন। আর এই আতর্নাদই গানের সুরে রূপান্তরিত হয়। প্রাবন্ধিক শব্দ মিত্রের কথায়—

“এমন একটা জিনিস কল্পনা করতে পারাটাই একটা দুর্লভ ক্ষমতা। ... অনেক অনুভব আমাদের চেতনার গভীরতম স্তরে পর্যন্ত আলোড়ন জাগাত, এমন করে আতর্নাদকে একজন গানে রূপ দিতে পারছেন বলে। বাস্তবের সমস্ত নির্মমতার বিরুদ্ধে এই তার প্রতিবাদ।”^২

—আসলে বাস্তবের বিপরীতেই বিজন ভট্টাচার্য দাঁড় করাতেন তাঁর অনুভবের তীব্রতাকে। আর এখানেই তাঁর সমস্ত জোর।

প্রাবন্ধিক ‘নবান্ন’ নাটকে এক ছোকরা ডাক্তারের সামনে বুড়ো প্রধান সমাদ্দারের দৃশ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যিনি ডাক্তার সাজলেন তিনি বাস্তবিক ডাক্তারি পেশায় রত ছিলেন। তাঁর কথাগুলো চাঁচাছোলা আবার কণ্ঠস্বরও তেমন। সেই ডাক্তারবাবু প্রধান সমাদ্দারের পরীক্ষা করে বলেন—

“ব্যথা-ট্যাথা কিছু নেই। ওসব ভুলে যাও।”^৩

এরপর ‘ভুলে যাও,-তোমার ব্যথার কথা ভুলে যাও’—কথাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে বলতে বুড়ো বেরিয়ে যায়। প্রাবন্ধিক শব্দ মিত্র মনে করেন কথাগুলো বিজন ভট্টাচার্য নানান অর্থে বলতেন। প্রথমত, ব্যথাটা কাল্পনিক, তাই তাকে ভুলে যেতে হবে। দ্বিতীয়ত, যেহেতু লেখা পড়া জানা ডাক্তার কথাটি বলেছেন, সুতরাং তার কথা মানাই উচিত। শেষ অর্থ হিসেবে প্রাবন্ধিকের মনে হয়েছে, কথাগুলির মধ্যে কোথায় যেন একটা ব্যঙ্গের সুর রয়েছে। কেউ কী করে জানবে যে, তাঁর কোথায় কষ্ট, আর বা কতটা কষ্ট! তিনি আরো জানিয়েছেন যে, বিজন ভট্টাচার্য যতবার এই কথাগুলো বলতেন তাতে তাঁর সত্তার এমন গভীর প্রকাশ ঘটত যে, মানুষেরা সেই জটিল অনুভবে হতবাক হয়ে যেত। এখানেই শব্দ মিত্র বলেছেন—

“প্রাকটিক্যাল বোধবুদ্ধির বিপরীতে বিরাট হয়ে দেখা যেত বিজনের তীব্র অনুভব। এখানেই, আমি একদিন বুঝলুম, বিজনের সমস্ত শিল্পসৃষ্টির উৎস। তার এখানেই সে অতুলনীয়।
সে মানুষ আর কারোর হিসেবের ছকের মধ্যে বিন্যস্ত হবে কী করে?”^৪

॥ তিন ॥ কাকে বলে নাট্যকলা (১৯৯১ খ্রীঃ)

শম্ভু মিত্র ড. শ্রী আবীরলাল মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহে যান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘জলসাঘর বক্তৃতামালা’র বক্তৃতা দিতে ১৬ই জুন ১৯৯৮। এই বক্তৃতার কোনো লিখিত রূপ ছিল না। স্নেহ ভাজন শ্রী গৌতম হালদারের সহায়তায় একটি ক্যাসেট থেকে গ্রন্থটি লিপিবদ্ধ করা হয়। ‘জলসাঘর সংস্থা’র শ্রীরবীন পাল আগ্রহ সহকারে আনন্দ পাবলিশার্স এর সঙ্গে কথা বলে ছাপানোর বন্দোবস্ত করেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জলসাঘর বক্তৃতামালায় নাট্যকার শম্ভু মিত্র বক্তৃতা দিয়েছিলেন নাট্যকলা সম্পর্কে। সাহিত্য, চিত্র, নৃত্য, সঙ্গীত ইত্যাদিকে যেমন কলা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, তার পাশাপাশি নাট্যকলা বাদ পড়ে না। নাট্যকলাকে ও কলা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কিন্তু এর মধ্যে একটা পার্থক্য থেকে যায়। পার্থক্যটা হল এটাই যে, একজন সাহিত্যকার, বা একজন চিত্রকার বা একজন গায়ক যখন কোন কিছু সৃষ্টি করেন তার পিছনে তাঁর একটা উদ্দেশ্য থেকে যায়। তাঁর উদ্দেশ্যটা হল দর্শক-পাঠক বা শ্রোতার কাছে পৌঁছে দেওয়া তারা তাদের সৃষ্টি গুলিকে সরাসরি দর্শক-পাঠক-শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দিতেও পারে। কিন্তু নাট্যকলা কলা হলে সেটা সরাসরি পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস লাগে যেটা (সাহিত্য চিত্র সঙ্গীতের) অন্যগুলিতে প্রয়োজন হয় না। নাট্যকলাকে সবার মাঝে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য লাগে একটা নাটক, অভিনেতা ও মঞ্চ। তাছাড়া সঙ্গীতশিল্পী ও বাদ্যযন্ত্রের শিল্পীতো অবশ্যই চাই এ থেকে বোঝা যাবে নাট্যকলা হচ্ছে সাহিত্য, চিত্র, নৃত্য ও সংগীতের মিশ্রণ। কিন্তু তবুও নাট্যকলা নিয়ে একটা প্রশ্ন থেকে যায়—এই কলার অষ্টাকে? এবং সৃষ্টিটা কোনখানে?

নাট্যসৃষ্টির যে গন্ডগোল সেটা কিন্তু শুধু নাট্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আধুনিক যুগে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটা দেখা দিয়েছে। বর্তমানে একটা গান দর্শকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য অনেক ব্যক্তির ভূমিকা থাকে। যেমন—কেউ গানটা লেখে, কেউ লেখায় সুর দেয় আবার কেউ গেয়ে সেটা পরিবেশন করে। ফলে এখানেও প্রশ্ন উঠে আসে আসল কলাকারকে?

আগে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এমনটা ছিল না। বলা যেতে পারে যেমন—কবীর যখন গান

বাঁধতেন তখন তিনি নিজের কথায় নিজে সুর বসাতেন এবং সোজাসুজি সেটা শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দিতেন। আমরা যদি আবার রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, নজরুল, অতুলপ্রসাদ ইত্যাদি ব্যক্তিদের দিকে তাকায়, তাহলে দেখব প্রত্যেকেই তাই করে গেছেন। ‘নিজেরা নিজেদের গান বেঁধেছেন।’ রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্যক্তির গান বাঁধতেন তখন তার সময়টা একটু অন্যরকম ছিল। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই ভাগটা চলচ্চিত্রের জন্য এসেছে। বর্তমানে ‘কলার স্রষ্টা’ নিয়ে যে প্রশ্নটা আসছে তার পিছনে চলচ্চিত্রে প্রভাবটা বেশী। কিন্তু একটা প্রশ্ন আসছে সেটা হল, যে গীতিকার সে গানটা লিখছে, যে সুর সে সুর দান করছে এবং যে গায়ক সে গাইতে—এরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাজ করছে কিন্তু এদের মধ্যে সৃষ্টি কর্তা বা এদের প্রধান কে?

বর্তমানে বা আধুনিক কালে গানের ক্ষেত্রে যে সমস্যাটা দেখা দিয়েছে নাটকের ক্ষেত্রে এই গোলমালটা অনেক দিনের বা শুরু থেকেই। আমরা বলি নাটক আর অভিনয় এর মিশ্রনই হল নাট্যকলা। সেই জন্য অনেক এই নাট্যকলাকে বলে থাকেন ‘Composite art’ বা ‘সংযুক্ত শিল্প কারণ এখানে অনেকগুলি জিনিস (যেমন—গান, অভিনয়, চিত্র) এনে যোগ করে এই শিল্প কলাটি তৈরি হয়।

নাটককে যদি সংযুক্ত শিল্প বা Composite art বলা হয় তাহলে আধুনিক গানকে কী সংযুক্ত শিল্প বলা যাবে? কারণে সেখানেই তো গীতিকার, সুরকার ও গায়কের এই তিনজনের পরিশ্রম ফলেই তো গানটি সম্পূর্ণ হয়? পৃথিবীর যে বিখ্যাত শিল্পী চলচ্চিত্রকার সিনেমা তৈরি করেছেন তাঁদের কি বলা যেতে পারে যে, আপনি যে ছবিটা তৈরি করেছেন তার পিছনে অবদান আপনার একার নয়, এই ছবির ভাগীদার অনেকে যেমন—অভিনেতা, গায়ক, মেকাপম্যান, স্ক্রিপ্ট রাইটার ইত্যাদি ব্যক্তিদের। কিন্তু তাই বলে এটি সংযুক্ত শিল্প বলা যাবে? আবার যখন একটি গল্প বা উপন্যাস ছাপানো হয়, তখন সেখানে পাত্র-পাত্রীদের ছবি আঁকা থাকে, তাই বলে কি ওঠাও সংযুক্ত শিল্প? এই ভাবে যদি প্রত্যেক বিষয়ের ক্ষেত্রে আমরা উলটো উলটো প্রশ্ন তুলি তাহলে একটা গোলমাল থেকে যাবে। আমরা প্রত্যেকেই জানি প্রত্যেক কলাশিল্পের একটি গঠনগত সম্পূর্ণতা থাকে। তাকে সেই গঠন গত দিকে বিচার করে কলা হিসাবে স্বীকার হয়।

তখন আমরা দেখি না ওই গল্পের মধ্যে ছবি আছে কিনা সঙ্গীতের মধ্যে সারেসঙ্গী বাজছে কিনা, গল্পের মধ্যে ছবি আছে কিনা? এবিষয়ে বলতে গিয়ে শম্ভু মিত্র জানিয়ে যে—

“যেমন কোনো জিনিস গড়বার সময়ে এরকম বলা হয়ে থাকে যে তিলে তিলে
রূপ আহরণ করে তিলোত্তমার সৃষ্টি হয়েছে।”^১

আমরা যদি তিলোত্তমা সৃষ্টির দিকে তাকায় তাহলে দেখব যে তিল তিল করে রূপ আরোহন করে তিলোত্তমার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তখন সে একটাই প্রাণী হয়েছে। তিল তিল করে সৃষ্টি হয়েছে বলে য় আলাদা আলাদা প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে তা নয়। আবার তিলোত্তমার চোখ, নাক, কান, বুক নিয়েও আমরা আলাদা আলাদা বিচার করি না। কারণ সেগুলি সংযুক্ত হয়ে যায় সম্পূর্ণ তিলোত্তমার মধ্যে তিলোত্তমার অংশ রূপে। নাট্যকলার ক্ষেত্রে নাটক, অভিনেতা, সঙ্গীত ইত্যাদি হল নাটকলার একটি অংশ মাত্র। এই উপকরণগুলি প্রত্যেকটি সম্পূর্ণ নয়। যখন এইগুলি যুক্ত হয় তখনই সম্পূর্ণ হয়।

ইউরোপে অর্থাৎ প্রথম বিশ্বের দেশগুলিতে মানুষ নাটক পড়ার পাশাপাশি অভিনয় এরও স্বাদ পেয়ে গিয়েছিল। তার ফলে সেখানকার কিছু ব্যক্তি যখন অভিনেতা কেন্দ্রিক নাট্য রীতির প্রচলন করে ছিল তখন দর্শকদের তা ভালো লাগেনি। কারণ আসলে তো তারা আসেই অভিনয় ও নাটকের যুগ্ম স্বাদ পেয়েছিল।

আমরা আমাদের চারিপাশের মানুষদের মধ্যে দেখতে পায় প্রত্যেকেই চেষ্টা করছেন নিজে কিছু করে দেখাতে। নিজের প্রতিভাটা সকলের সম্মুখে আনতে। যে সকল ব্যক্তির সাহিত্য রচনা করেন তাদের মধ্যে এই প্রকাশ দেখা যায়। নাটকের ক্ষেত্রে যে সকল ব্যক্তির নাট্য অভিনয়ের কথা না ভেবে, অভিনয়কে নাট্যকলা থেকে বাদ দিয়ে নাটক রচনা করেছেন কিংবা ‘পুতুল নাচের পুতুলে’র মতো করে নাট্য সৃষ্টি করতে গেছেন তারা কিন্তু তলিয়ে গেছেন।

শম্ভু মিত্র আলোচনায় সভায় অনেক প্রকার নাট্যের কথা বলেছেন যেমন—ছায়া নাট্য, পুতুল নাট্য, মুকাভিনয় ইত্যাদি। নাট্যকলার ক্ষেত্রে একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে নাটক টাই হল নাট্যশিল্পের একটি বিশেষ অংশ।

যে সকল নাট্যকার নাটক লেখে, যাঁদের নাটক দিয়ে পুরো নাট্য শিল্পটা তৈরি হচ্ছে তাহলে তাঁদেরকে কি আসল স্রষ্টা বলা যাবে না? তাহলে একটা প্রশ্ন এসে যায় শেকস্পীয়র, রবীন্দ্রনাথ এরা কি আসল স্রষ্টা নন? আমরা যদি নাট্যকলাকে দুটো ভাগে ভাগ করি (যেমন— ১) মুখ্য ২) গৌণ) তাহলে নাটক হল মুখ্য ভাগেরই অংশ। আর নাটককাররা কলার সৃষ্টি করছেন তাহলে এটা স্বীকার করে নিতে হবে যে নাট্যকাররাই মূল কলার স্রষ্টা। তারপর সেটা অভিনয় হোক বা না হোক, সেটা গৌণ।

যদি নাটকটা নাট্যশিল্পের মুখ্য অংশ হয় তাহলে নাট্যশাস্ত্রে নটনটী সম্পর্ক যে কথাগুলি আছে সেটা থাকত না। নাটক বাদে আমরা যখন গল্প-উপন্যাস পড়ে সেগুলি সহজে বোঝা যায়। কিন্তু একটা নাটক পড়ার পর সেটা সম্পূর্ণ বোঝা সম্ভব হয় না। অভিনয় এর মাধ্যমে এর প্রকাশের দিয়ে সেটা স্পষ্ট হয়। তাহলে এক্ষেত্রে শম্ভু মিত্রের একটি জিজ্ঞাসা প্রকাশ করাটা একটা শিল্প নয়?

যদি প্রকাশ করাটা এমন একটা শিল্প হিসাবে মেনে নিই তাহলে একটা গোলমাল হয়। কারণ মহৎ সাহিত্য পড়া মাত্র বোঝা যায় শুধুমাত্র নাটক ছাড়া। নাটকে সহজে বোঝার জন্য এবং নাট্যপ্রেমী মানুষদের তৃপ্তি দেবার জন্য অভিনয় করতে হয়। শম্ভু মিত্র বলেছেন—যদি বোঝার জন্য অভিনয় করা হয় তাহলে কিছু কিছু সাহিত্য আছে যেখানে দুর্বোধ্য কিছু থাকে না। আবার ইতিহাসে অনেক সাহিত্য আছে যেগুলি সময় কালে বোঝা যায়নি বুঝতে অনেক সময় লেগেছে। তাহলে সেটা বোঝার জন্য কি অভিনয়ের দরকার? শম্ভু মিত্রের কথায়—

“মানে ধরা যাক রবীন্দ্রনাথের পূরবী বলাকা, শেষ লেখা পুত্রপুট এগুলো অভিনয় করে যেতে হবে?”^২

মানুষের নাটক নিয়ে যে আতঙ্ক আছে, সেটা তিনি দূর করতে চাইছেন। তিনি বলতে চাইছেন অভিনয় ছাড়া বোঝা সম্ভব। আর অভিনয়টা যদি বোঝার জন্য হয়, আরো তখন সেটা মানে বইয়ের মতো হয়। তাহলে তাকে শিল্পকলা বা শিল্প সৃষ্টি নাম দেওয়াটা একটু বেশী স্নেহের প্রকাশ ঘটে। তিনি একটা উদাহরণ দিয়েছেন—

“এখনকার অভিনেতা অনুপকুমার ওর বাবা ছিলেন শ্রী ধীরেন দাস। তিনি একদিন আমাকে বলে ছিলেন শম্ভুবাবু আপনি দেখেছেন কি কিছু কিছু লোক পঞ্চাশ বছর বয়স হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তখনও তাকে বাড়িতে কেউ খোকন বা খোকাবাবু বলে ডাকে, দেখেছেন?”^৩

আসলে শম্ভু মিত্র বোঝাতে চেয়েছেন শুধুমাত্র মানে বোঝার জন্যেই যদি নাট্যভিনয় তৈরি হয় তাহলে তাকে নাট্যকলাটা বলা অতি আদরের বা স্নেহের প্রকাশ হয় না।

প্রত্যেকটা কলা শিল্পের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। যা অন্য কোনো কলা শিল্পের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। যেমন—যখন কেউ গান করেন তখন গানটা শুনে আমাদের মনের ভেতরে একটা অনুভবের সৃষ্টি হয় সেটা আমরা ছবি এঁকে বা লিখে বা নেচে কোনো ভাবেই বোঝাতে পারি না। গেয়ে বা বাজিয়ে ছাড়া।

প্রত্যেক শিল্পের একটা নিজস্ব প্রকাশ আছে যা অন্য কিছু দিয়ে বোঝা যায় না। নাটকের ক্ষেত্রেও ঠিক একই। না হলে নাটক নাট্যকলাকে ছাড়িয়ে যাবে। শম্ভু মিত্র বক্তৃতা সভায় শিশির কুমার ভাদুড়ী মশায়ের ‘দিগ্বিজয়ী’ নাটকের অভিনয়ের কথা তুলে ধরেছেন। শ্রী যোগেশ চৌধুরী ও অমলেন্দু লাহিড়ী মহাশয় যখন পরস্পর অভিনয় করতেন তখন একটা আশ্চর্য সৃষ্টি হত। সেটি হল—তাদের অভিনয়টা বাস্তবায়িত হয়ে ফুঁটে উঠত। যখন মঞ্চসজ্জা, আলো, নেপথ্য সঙ্গীত ও মঞ্চে অভিনয় এক সঙ্গে ঘটত। এর ফলে যেন একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটত।

নাট্যকলার একটি অংশ হল অভিনয় যা মন্ত্র মুখের মতো মানুষকে আকর্ষণ করে। অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে নাটকে উল্লিখিত ঘটনাগুলি দর্শকের সামনে স্পষ্টভাবে দেখানো সম্ভব হয়। তাই তিনি আলোচনা সভায় একটা অভিনয়ের উদাহরণ দিয়েছেন—

“একজন বৃদ্ধ যার কেউ নেই প্রায় তিনি তাঁর মেয়েকে দেখতে এসেছেন। এসে শুনলেন মেয়ে মারা গেছে।”^৪

এখানে বৃদ্ধ মেয়ে মৃত্যু সংবাদ শুনে বসে পড়েছিল। এই বসা পড়াটা বইয়ের খুব সহজভাবে

লেখা আছে। কিন্তু অভিনয়ের মাধ্যমে মঞ্চের উপর এই ঘটনাটা ঘটাতে হবে যাতে দর্শক ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর তবে মনের অবস্থাটাও বুঝতে পারবে। শোকাহত অবস্থায় বসে পড়ার ঘটনাটা সবচেয়ে কঠিন। প্রত্যেক অভিনেতা অভিনেত্রী যখন অভিনয় করেন তখন অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে নাটকের অন্তর্নিহিত ভাবটাকে তুলে ধরেন অন্যকোনো ভাবে বোঝালে সেখানে অন্তর্নিহিত ভাবটি সম্পূর্ণ ফুটে ওঠে না।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি, যে নাট্যকলা এমন কিছু অনুভূতির সঞ্চার করে মানুষের মনে যেটা আর অন্যকোন কলায় সম্ভব হয় না। বহু ব্যক্তি আছেন যারা জীবনে অনেক নাট্যাভিনয় দেখেছেন যে তারা কখন ভুলতেও পারেন না। সেগুলি নাট্যাভিনয় মানুষের মনে আটকে রাখা মঞ্চের ওপর যেটা অভিনয় ছাড়া সম্ভব না। শম্ভু মিত্র অভিনয় কলার উদাহরণ দিয়েছেন—

“আপনারা সকলেই জানেন যে খোলা তলোয়ারের মতো বাকঝকে আওয়াজ যদি হয় কয়েকজন লোকের মঞ্চের এই পাশ থেকে ওই পাশ থেকে রণ রণ করে উঠছে তাদের আওয়াজ—হয়ত নেপথ্যে একটা শব্দ হচ্ছে—বা কিছু লোকের দাঁড়ানোর ভক্তি বা কিছু চলনের ভক্তি।”^৫

এই ঘটনা বা অনুভূতিগুলি মানুষের মনের মধ্যে Suspense বা উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করে যেটা আর কোনো রকমভাবেই সম্ভব নয়।

নাটকের যে লিখিত রূপ সেই লিখিত রূপের উপর নির্ভর করে যে অভিনয় হয় সেই অভিনয়টা যে কতটা জীবন্ত, তিনি তার উদাহরণ সহকারে আলোচনা করেছেন বক্তৃতা সভায়। যেমন—কিছু গুন্ডালোক তার বিপক্ষ দলের একটা ছেলেকে মারতে মারতে অন্ধকারে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। দুজন পথচারীর দেখতে পেয়ে একজন উত্তেজিত চাপা স্বরে বলে—“মেরে ফেলে দেবে নাকি?” অপর জন তাড়াতাড়ি তার হাতটা ধরে চলে যাবার সময় বলেন—“দেবে দেবে! তুমি চলে এসো”—এখানে দেবে দেবে বলাটা যতটা সহজ লেখাটা ততটা সহজ নয়। লিখার সময় দ এর সঙ্গে ও ব এর সঙ্গে একার যোগ করতে হয়। ‘দেবে দেবে’ এর মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে

যে নিশ্চয় মেৰে দেবে। কিন্তু নাট্যকাৰ যখন দেখে লিখে সঠিক ভাবে প্ৰকাশ পাচ্ছে না তখন তিনি ‘দেবে দেবে’ ৰ মাৰে একটা ‘তো’ যোগ কৰল। তখন ভাবটা কাছে যায়। কিন্তু প্ৰথম যে ‘দেবে দেবে’ টা ব্যবহাৰ হয়েছে তাৰ মধ্যে একটা জ্যান্ত জীবনের প্ৰতিৰক্ষণ ছিল। দ্বিতীয়টায় ‘তো’ যোগ কৰায় একটু ম্যাডমেডে ভাব প্ৰকাশ পাছিল। ‘দেবে দেবে’ এই টা লেখাৰ মধ্যে দিয়ে কোন ভাব প্ৰকাশ পায়নি। পড়লে সেটা সাধাৰণ মনে হয়। কিন্তু যখন অভিনয়ৰ সময় ওটাই ব্যঞ্জনাৰ সৃষ্টি কৰে বলার মধ্যে দিয়ে। ভাবটা সম্পূৰ্ণ ফুটে ওঠে।

নাট্যকলা শিল্পেৰ নাটকেৰ মূলভিত্তি হল দৈনন্দিন কথপোকথন। কথা বলার ভঙ্গিৰ উপৰ লিখিত ভাষাটা তৈরি হয়। যতই মুখেৰ কথাৰ উপৰ ভিত্তি কৰে লেখা হোক না কেন, যখনই লিখিত ভাষায় ৰূপ দেওয়া হয় তখনই তাৰ মধ্যে কিছু শৃঙ্খলগত বাধ্যবাধকতা চলে আসে। আমৰা লিখিত ৰূপটা স্পষ্টভাবে পড়ি না সেটা পড়ার মধ্যে একটা নিজস্বতা থেকে যায়। আমৰা মুখে যেটা বলি সেটা কিন্তু লিখি না আৰ যেটা লিখি সেটা কিন্তু বলি না।

এই নিয়ে শঙ্কু মিত্ৰ একটা উদাহৰণ দিয়েছেন—

“যেমন আমৰা মুখে বলি হেসো না। কিন্তু যখন লিখি তখন টা বাদ দিয়ে লিখি। আবার সেই লেখাটা যদি নিজে পড়ি, মনে মনেও পড়ি, তাহলে টা যোগ কৰে পড়ি, যে হেঁসো না’।”^৬

এই আলোচনা থেকে বোঝা যায় এই লিখিত ভাষাটা যখন মুখেৰ ভাষায় প্ৰকাশিত হয় দৈনন্দিন জীবনে তাৰ ৰূপটা পাল্টে যায়। নাটকেৰ ক্ষেত্ৰেও ঠিক তাই। কোন অভিনেতা অভিনয় কৰাৰ সময় নাটকেৰ লিখিত ৰূপটাকে তিনি কথপোকথনেৰ মাধ্যমে দৈনন্দিন ভাষায় প্ৰকাশ কৰেন কৰতে চান। কথপোকথন উল্লিখিত ঘটনাগুলি এমনভাবে পৰিবেশন কৰেন যাতে বাস্তবতাৰ ৰূপে সমসাময়িক ঘটনা সম্পৰ্কে মনেৰ মধ্যে একটা দাগ কেটে দিয়ে যাবে।

শেকসপীয়ৰ আজ থেকে কয়েকশো বছৰ আগে লিখে গেছেন। ৰবীন্দ্ৰনাথ শেকসপীয়ৰেৰ পৰেৰ হলেও তাঁৰও অনেকটা সময় কেটে গেছে। ৰবীন্দ্ৰনাথ ও শেকসপীয়ৰেৰ

লেখা নাটকগুলি যদি আজকের দিনের মতো অভিনয় করতে চাই তাহলে সেটাকে আজকের বাস্তবতার মধ্যে দিয়ে কল্পনার গড়ন থাকে সেই ছকের মতো করে অভিনয় করতে হবে। তবেই সেটা জীবন্ত হবে। নাটকে দর্শকের মন ও দৃষ্টি আকর্ষণের পিছনে অভিনেতাদের অবদানটা অনেক। তাই আগের নাটকগুলির স্ক্রিপ্টটাকে অভিনেতারা এমন ভাবে তৈরী করেন, তার মধ্যে দিয়ে তাদের নিজস্বতার পাশাপাশি বাস্তবটাও উঠে আসত। অভিনেতার নিজস্বতার প্রকাশের মধ্যে দিয়ে বোঝা যায় যে নাটকটা শিক্ষানবিশের স্তর থেকে শিল্পে পরিণত হল। অভিনেতাদের নাটকের স্বরলিপি নিজেকেই তৈরী করে নিতে হয় তা না হলে যে সকল দর্শক নাটক দেখতে এসেছেন তাদের সেটা সত্য বলে মনে হবে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ‘রক্তকরবী’ নাটকের একটা চরিত্র নিয়ে শম্ভু মিত্র আলোচনা করেছেন। সেখানে দেখি একটা বিশেষ চরিত্র গোকুল নন্দিনীকে দেখে এক জায়গায় বলেছে—‘ও তাই এতো সাজ?’ তারপর পরে আছে ওরে ভয়ঙ্করী। ‘ওরে ভয়ঙ্করী’ এই শব্দটা পড়া মাত্রই মনে আসবে রবীন্দ্রনাথ আগেকার যাত্রা বা থিয়েটারের মতো করে লিখেছেন। কিন্তু শম্ভু মিত্র ঐ শব্দটাকে বর্তমান সময়ের বাস্তবতার মতো করে উচ্চারণ করা যায় কিভাবে সেটা বলেছেন। বর্তমান সময়ের সঙ্গে উচ্চারণ করলে তার মধ্যে বাস্তবতার ছাপ ফুটে উঠবে। আমাদের দৈনন্দিন কথোপকথনের মতো করে যদি উচ্চারণ করি তাহলে দেখব—‘ওরে ভয়ংকরী’ কথাটায় এক অর্ধস্মুট স্বরবর্ণকে ছুঁয়ে রে-টাকে পুরো উচ্চারণ করা হয়েছে। শম্ভু মিত্র ‘ওরে ভয়ংকরী’ কথাটাকে দৈনন্দিন কথোপকথনের মতো উচ্চারণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন বক্তৃতা সভায়।

ওপরে আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে অভিনয় কালে নট নটীরা সীমিত বর্ণের গভীটাকে পার করে যায়। না হলে দর্শকরা তাদের মাছি মারা করানি ভাববে।

একটা প্রশ্ন এসে যায়, নাট্যকলার সৃষ্টি কবে হয়েছিল? আমরা আগে দেখেছি ইউরোপে একটা সময় অভিনেতাকেন্দ্রিক নাট্যরীতির প্রচলন হয়েছিল কিন্তু সেটা বেশিদিন টেকেনি। যখন খুব ভালো করে একটা দৃশ্য সাজানো হয় উঠে নাটকের বিষয় অনুসারে এবং অভিনয়ের সময় মঞ্চে পর্দাটা সরে গেলে দর্শকরা তালি দেয়। তার মানে হাততালি দিয়ে মঞ্চ সজ্জাকে অভিনন্দিত করল।

মঞ্চ সজ্জা তো নাট্যকলার একটা অংশ আবার দৃশ্যের ভাব অনুযায়ী নেপথ্য সঙ্গীত রচিত হয় এটাও একটা অংশ। চিত্রকলা, সঙ্গীতকলা এ কিন্তু শিল্পকলার এক একটা অংশ। কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে যখন ব্যবহৃত হয় তখন তাদের আলাদা স্বাধীনতা থাকে না। তারা নাটকের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয় এবং নাটকে যতটুকু প্রয়োজন ততোটুকুই ব্যবহৃত হয়। এগুলি নাট্যাভিনয়ের অঙ্গ নয় আবার অংশ নয়। নাটকের মধ্যে যেমন ধরনের ঘটনার উল্লেখ থাকে সেই অনুযায়ী চিত্রের প্রয়োজন হয়। শম্ভু মিত্র এখানে একটি বিয়ের ঘটনাকে উদাহরণ হিসেবে দেখিয়েছেন। যেমন—এমন একটা বিয়ে, যেখানে বিয়ের অনেকগুলি ব্যাপার থাকে, বৌকে ভালো জামা কাপড় পরানো হয়, লোক খাওয়ানো হয়, পুরোহিত ডাকা হয় ইত্যাদি। আবার এমন বিয়ে হয় যেখানে এই উপরের ঘটনাগুলো কেনো উল্লেখ থাকে না। তখন দেখা যাচ্ছে দুটো ঘটনার ক্ষেত্রে মঞ্চসজ্জায় দু রকম হবে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কাপড় বা পর্দা টেনে মঞ্চটা ভাগ করে নিলেই হবে—কোনো চিত্র করার প্রয়োজন হবে না এক্ষেত্রে কিন্তু নাট্যাভিনয়ের কোনো বাঁধার সৃষ্টি হবে না। আবার যদি সঙ্গীতের ক্ষেত্রে দেখি, তাহলে দেখব এমন নাট্য হতে পারে যেখানে সঙ্গীতের কোনো প্রয়োজন নেই। তাহলে বাকি থাকল শুধু নাটক আর অভিনয়।

নাটক আর অভিনয়কে আলাদা করে ভাবা যায় না। কারণ নাটকটা অভিনয়ের জন্য লেখা একটা বিশিষ্ট শৈলী। সামনের যে স্ক্রিপ্টগুলো লেখা হয় সেগুলি স্বয়ং সম্পূর্ণ থাকে না, সেগুলি চলচ্চিত্রে গৃহীত হবার পর সম্পূর্ণতা পায়। নাটকও মঞ্চাভিনয়ের উদ্দেশ্যেই লেখা, এমন অনেক নাটক আছে যেখানে অভিনেতা বা অভিনেত্রী প্রত্যেকেই একই চরিত্রে ভিন্ন ভিন্ন গতিতে চিত্র তৈরি করেছিলেন। নাট্যসাহিত্যটা কলা সৃষ্টির একমাত্র ক্ষেত্রে সুতরাং একই চরিত্রের দুটো মানে হতে পারে না। সমস্ত ব্যাপারটা স্পষ্ট ভাবে হিসেব করে দেখতে হবে।

একটা কথা বলা খুবই অপ্রয়োজনীয় কিন্তু বলে দেওয়া ভালো—এখানে আমরা আলোচনা করছি—ভালো নাটকের ভালো অভিনয় সম্পর্কে শম্ভু মিত্র বলেছেন—

“ভালো নাটকে ভালো অভিনয় বা খারাপ নাটকের ভালো অভিনয় বলছি না।”^৭

নাট্যকলা যুগ্ম হলে জীবনের যে জটিলতা প্রকাশ পায় তার আলোচনা শম্ভু মিত্র উদাহরণের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। যেমন—

“ধরুন আমরা কয়েকজন একটা ঘরে বসে আছি এমন সময় দরজায় একজন লোক এসে দাঁড়াল। আমরা যদি বিবরণ দিই তাহলে বলব—লোকটা বেঁটে, কালোমতন চোখ দুটো ভাঁটার মতো গোল, আর কপালের ভুরু দুটো যেন একজোড়া গৌফের মতো।”^৮

এই যে লোকটির প্রত্যেকটি অংশের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু অভিনয়কালে লোকটি তার সকল বৈশিষ্ট্য এক সঙ্গে নিয়ে দাঁড়াবে ঐ লোকটি যখন আসে এবং দর্শক হিসাবে যখন তাকে দেখা যায় তখন সেই দেখাটা বাস্তবের মধ্যে দিয়ে দেখা হয়ে ওঠে। বাস্তবের মধ্যে আমাদের চারিপাশের বহু জিনিস দেখি সেই রকম। বহুমাত্রা বহুস্তর দিয়ে আমরা বাস্তবকে আমাদের সামনে দেখি। যেমন—আমাদের প্রত্যেক দিন অনেক লোকের মুখোমুখি হই এবং অনেক সময় তার সঙ্গে পরিচয় হয়। কিংবা নিয়ন্ত্রন বাড়ি গিয়ে দেখা হলে আমরা মনে মনে লোকটি সম্পর্ক একটা Assessment করি, যে লোকটি ভালো না খারাপ, তার সঙ্গে পটবে কিনা ইত্যাদি। এই Assessment করা কিন্তু আমরা নিজের অজান্তে সব সময় করি। যার বুদ্ধি একটু বেশি থাকে যে তাড়াতাড়ি বোঝে। এখানে কিন্তু পুঁথিগত বিদ্যার প্রয়োজন হয় না। বুদ্ধিটা বড়। কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে একই। বুদ্ধি না থাকলে নাটকের ছোটো ছোটো ঘটনা বোঝা সম্ভব হবে না।

শম্ভু মিত্র আগের উদাহরণের পরিপ্রেক্ষিতে বলেন দরজায় দাঁড়ানো লোকটিকে ধরুন জিজ্ঞাসা করল—‘সুবোধ বাবু আছে/ন?’ ‘আছে’র পরে ‘ন’ টা লাগিয়েছে কিনা ঠিক বোঝা গেল না। ঘরে মধ্যে বসে থাকা ব্যক্তির বললেন—‘না তিনি তো আসেননি’। সে চারিদিকে তাকিয়ে ‘অ আচ্ছা’ বলে বলে গেল। ‘অ আচ্ছা’—এই কথাটার মধ্যে দিয়ে বোঝা যায়, লোকটা নিজের রূপটা লোকের কাছে দেখাতে চায়। রূপটা দেখিয়ে তিনি সমাজের সঙ্গে একটা সম্পর্ক করতে চায়। আমরা নিজেকে যেভাবে Project (নিষ্কোপ) করতে চাই সেটা সেখানে ধরা পড়ে। আবার একটা রোগা ফ্যাকাসে লোকটিকে যখন সংস্কৃতি ভাবে ওই একই প্রশ্ন করেন তখন ঠিক

একই উত্তর পান ‘না তিনি তো আসেননি’—তখন তিনিও বলেন ‘ও আচ্চা’। এখানে আমরা দেখতে পায় দুটো লোক দুভাগে নিজের পরিচয়টা দেখাতে চাইছেন। দুজনের প্রশ্নটা একই হলেও প্রশ্নের ধরনটা আলাদা ছিল। এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে দুটো জিনিস প্রকাশ পাচ্ছে, এই যে প্রশ্নটা করছে তার মধ্যে অন্য ব্যক্তি কিভাবে আচরন করবে সেই প্রত্যাশাটা থাকছে। সমাজের সামনে ব্যক্তি দুটির যে চেহারা দেখাচ্ছে তার মধ্যে দিয়ে তাদের এই প্রত্যাশা থাকে সমাজ তাকে কিভাবে গ্রহণ করবে।

প্রত্যাশার কথাটা শব্দ মিত্র বুঝিয়ে দিয়েছেন শ্রোতাদের উদাহরণ দিয়ে। তিনি বলেছেন—

“অভিনয়ের মধ্যে একজন লোক বললে—‘দেখো সূর্যাস্ত কি সুন্দর লাল হয়েছে’। তাতে অপর লোকটা যাকে বলল—সে তাচ্ছিল্য করে না তাকিয়ে বললে,—‘এরকম রোজই হয়।’”^৯

‘এরকম রোজই হয়’ এই কথাটা শুনে বক্তৃতা সভায় উপস্থিত সকল দর্শক এক সঙ্গে হেসে ওঠে। তখন শব্দ মিত্র তাদের বলেন নাটকের এই দৃশ্যের অভিনয়ের সময় সকল দর্শক একই ভাবে হাসবেন। কারণ প্রথম ব্যক্তি প্রত্যাশা করে ছিলেন যে তার দ্বিতীয় ব্যক্তি সহমত দেবেন। যখন তিনি তা করেননি তখন তিনি অপ্রস্তুত বোধ করেন। কিন্তু দর্শকরা ঐ ব্যক্তির অপ্রস্তুত ভাব প্রকাশ করল তা দেখে হাসলেন তা নয়। দর্শকরা বুঝে ছিল যে, ওর প্রত্যাশাটা হচ্ছে অন্য ব্যক্তি তার কথার মত উত্তর দেবে এবং দেয়নি বলে প্রথম ব্যক্তি বিব্রত ও অপ্রস্তুত হবে সেটা তারা আগেই বুঝে ছিল। তাই তারা তখনই হেসে ওঠে। এই কথাটি যদি কোনো সুন্দরী মেয়ে বলত তাহলে দর্শকরা দ্বিগুণ হাসত।

শব্দ মিত্র শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলেন যে—

“আপনারাই জানেন কেন দর্শক বেশি হাসবে, তাতে আপনারা আবার হেসে উঠলেন।”^{১০}

আমরা সকলেই জানি এই ঘটনাগুলো। আমাদের ছোটো আচরণের শিকড়গুলো প্রতি মুহূর্তে

কোনো একজনের আচরণের মধ্যে দিয়ে জাল বুনে চলেছে। পরেই আবার অন্য একজনের আচরণের মধ্যে দিয়ে ওই বিস্তৃত জাল জটিল হয়ে বেড়ে যাচ্ছে। নাটক ও অভিনয় সব সময় চলছে। চলার ওই জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে একটা জালের মতো, যেটা বাস্তবজীবনে ঘটে থাকে। ওই প্রথম দুটি লোক সুবোধ বাবু সম্পর্কে জানতে চান আর দ্বিতীয় লোকটি সূর্যাস্ত দেখে আনন্দিত হয়েছিলেন—এই দুটো ঘটনা থেকে বোঝা যাচ্ছে তারা তাদের পারিবারিকের সঙ্গে কিভাবে সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইছেন। নাটকের সংলাপ যাই হোক তাতে কিছু এসে যায় না। সংলাপের মধ্যে দিয়ে চরিত্রদের আবেগ প্রকাশিত হয়। সংলাপটা ভাসমান চূড়ার মতো অনেকটা। যেটুকু ওপরে থাকে সেটুকু বলা যায় আর নীচে অনেকখানি। আর অনেকখানিকটা হল ভালো অভিনয়। তাহলে বোঝা যাচ্ছে—নাট্যকলার মূলকথা হল সমাজের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটা কি আর নিজের সঙ্গে সম্পর্কটা কি। আর এ কথাটা নাট্যে প্রকাশ পায়।

সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক বললে আমাদের মনে নানারকম প্রশ্ন উঠে আসে। যেমন—উঁচু শ্রেণির লোকের সঙ্গে নিচু শ্রেণির লোকের লড়াই, কিংবা মালিকের সঙ্গে মজুরদের লড়াই ইত্যাদি। হয়তো এক একটা সামাজিক সম্পর্ক। কিন্তু তা নয়। আমাদের বাবা-মা-ভাই-বোন এই সকল ব্যক্তিদের সঙ্গে যে সম্পর্ক সেটা হল সামাজিক সম্পর্ক। কিংবা আমরা যেভাবে কাজ করি কিংবা যেখানে বাস করি তার আশেপাশে লোকজনের সঙ্গে যে সম্পর্কটা গড়ে ওঠে সেটাই সামাজিক সম্পর্ক। এই সম্পর্কগুলির ভিত্তিতে আমাদের সমাজটা টিকে আছে আবার ভেঙে যাচ্ছে।

এই সম্পর্কগুলির মধ্যে কিছু আচরণ বিধি আছে, যে আচরণগুলি আমরা সকলের সামনে সবসময় করতে পারি না। কিছু আচরণ আছে সেটা বাবা মায়ের সঙ্গে করা যায় না। আবার কিছু পরিহাস যেটা স্ত্রী সঙ্গে করা যায় ইত্যাদি। আমাদের আচরণগুলি যে সুছন্দে চলে কিংবা কোথাও ছন্দপতন ঘটছে সেটা কথাবার্তার ও ছোটো ছোটো আচরণের মধ্যে দিয়ে বোঝা যায়।

এটা হল সমাজের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক। আর একটা হল নিজের সঙ্গে নিজের। এটা নির্ভর করে অনেকটা মনের ওপর। প্রত্যেকটা মানুষ চায় তার মনে যেন শান্তি থাকে কোনো রকম বিপরীত দ্বন্দ্ব যেন না থাকে। নাটকের প্রত্যেকটা চরিত্রও তাই-ই চায়। কিন্তু আমাদের সামনে

সত্য ও মিথ্যায় এবং কল্পনায় ও বাস্তবে যা দেখি এবং নানা রকম অনুকূল ও প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে যখন পড়ি তখন ভীষণ সংঘাত লেগে যায়। আমাদের অপরের প্রতি যে কর্তব্য কিংবা যেটা আমরা নীতিগতভাবে মানি তখন এই দুটোর মধ্যে খুব বঙ্কট লেগে যায়। এই গোলমালের মধ্যে দিয়ে নিজেদের সঙ্গে নিজের গোপন সম্পর্ক স্থির হয়। নিজের সঙ্গে নিজেদের দ্বন্দ্ব নিয়ে হ্যামলেটে একটি বিখ্যাত উক্তি আছে সেটি হল—

“To be or not to be that is the question.”^{১১}

শম্ভু মিত্র নিজের সঙ্গে নিজের দ্বন্দ্ব এই নিয়ে সাহিত্যের বিভিন্ন অংশ থেকে উদাহরণ টেনেছেন। যেমন—‘বিসর্জন’ নাটকে যেখানে জয় সিংহ বলেন—‘দেবী আছো আছো তুমি, দেবী থাকো তুমি’—দেখা যায়। কিন্তু সেটা স্বগতোক্তির সাহায্য বোঝানো হয়েছে। আবার এমন কিছু নাটক আছে যেখানে স্বগতোক্তির ব্যবহার নেই। যেমন—‘রক্তকরবী’ নাটকের রাজা ও অধ্যাপক চরিত্র এবং ‘চার অধ্যায়’ এর অন্তর চরিত্রের মধ্যে আছে। নিজের মধ্যে দুটো বিপরীত মনোভাব যখন একই ছন্দে আসে না তখনই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এই দ্বন্দ্বময় সম্পর্ক দুটি গভীরভাবে নাট্যকলার প্রকাশ পায়। কিন্তু এই দ্বন্দ্বময় ঘটনা তখন শুধু নাটকের উপর নির্ভর করে আর শুধু অভিনয়ের ওপর নির্ভর করে না। নাটক ও অভিনয়ের দুইয়ের মিশ্রণে এটা সম্ভব হয়। আকাশে যখন দুটো যুগ্ম তারা পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করার সময় তাদের মধ্যে যেমন সম্পর্ক নাট্যকলার ক্ষেত্রে অভিনেতা ও নাট্যকারদের মধ্যে ঠিক তেমনি সম্পর্ক। নাট্যকারের নাটক লেখার কারণ হল, অভিনয়ের মাধ্যমে অভিনেতার নাটকের একটা বিরাট আকাশ খুলে দেয় যেটা তাদের খুব ভালো লাগে। আর এই ভালো লাগা তৈরি করার জন্য নাটকটা তৈরি করেন। আর অভিনেতার নাট্যকারের তৈরী করা পরিস্থিতি এবং ভীষণ মুহূর্তে চরিত্রগুলির মুখ দিয়ে যে কথাগুলি বেরিয়ে আসে তাঁরা তার প্রেমে পড়ে যায়। এ থেকে বোঝা যায় দুজন দুজনকে কেন্দ্র করে ঘোরে। মানুষের সম্পর্কের যে জটিল জাল সেটা আধুনিক নাট্যের অন্তরে অন্তরে একটা টেনশন তৈরি করে।

আমরা যদি ইবসেনের ‘ডলস হাইস’ এর দিকে তাকাই তাহলে দেখব দৃশ্যের শুরুতেই নরা তার স্বামীর কাছে মিথ্যে কথা বলছে। বাস্তবে দেখা যায় স্বামীর কাছে বা স্ত্রীর কাছে সকলেই

একটু আধটু মিথ্যা কথা সকলেই বলে। আমরা যদি ভাবতে যায় স্বামীর কাছে বা স্ত্রীর কাছে মিথ্যা কথা বলেন এমন ব্যক্তিদের কথা হয়তো তাদের পাবো দূরে কোনো পল্লীতে যেখানে আদি বাসীরা থাকে। অবশ্য শিক্ষিত, প্রগতিশীল সমাজের Saphisticated ব্যক্তি তাদের মধ্যে সত্য বাদীতার আশা করা অসম্ভব।

আমরা সকলেই মিথ্যা কথা বলতে পারদর্শী কারণ মিথ্যা কথা বলার কোনো বাঁধা ধরা ছক নেই। এই বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম। যে বলে এবং যাকে বলে তাদের দুজনের ক্ষেত্রেই কিন্তু ধরনটা আলাদা। যখন কোনো বোকা লোককে মিথ্যা কথা বোঝাব তখন তার ধরনটা যেমন হবে বুদ্ধিমান লোকের ক্ষেত্রে বোঝানোর ধরনটাও আলাদা হবে। এই দুই ব্যক্তিকে দু'রকম বলার মধ্যে দিয়ে বোঝা যাবে লোকটার সম্পর্কের ধারণা। সেই রকম কে কাকে কি ধরনের মিথ্যা কথা বলবে সেটা কিন্তু আগে থেকে ঠিক থাকে না। নাটকের ক্ষেত্রেও তাই। সেটা ঠিক হয় অভিনয়ের মধ্যে ওই অভিনয় তৈরি করার মধ্যে। তাই নরা তার স্বামীর কাছে কি মিথ্যে বলবে এবং কিভাবে বলবে সেটা আগে ঠিক ছিল না। সময় ও পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল ছিল।

আমরা সকলেই জানি জগতের মধ্যে যদি কোনো জটিল জিনিস বা সম্পর্ক থাকে সেটা স্বামীর স্ত্রীর সম্পর্ক। কারণ হয় দুটো আলাদা জটিলতাও সজীবতা (Organism) বস্তু নিয়ে অবস্থান করে তাদের অজস্র স্তর ও অজস্র পাশ আছে যাকে ইংরাজিতে বলে Multi-Level ও Multi Faceted। এই দুই Organism pice-এর পারস্পরিক আচরণের মধ্যে দিয়ে জটিল ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় সেটা অবচেতন স্তর থেকে সচেতন স্তর পর্যন্ত। তাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়াগুলি দৈহিক অনুভব থেকে মানসিক অনুভব পর্যন্ত বৈদ্যুতিক তরনের মতো সঞ্চার হয় এবং পরে তা ব্রেন নামক কম্পিউটারের মধ্যে নথিবদ্ধ হয় (Save)। সেই Computer-এর হিসাবে দুজনের সম্পর্কটা দিনে দিনে তৈরি হতে থাকে। অভিনয়ের ক্ষেত্রে অভিনেতারা যত তাদের বাস্তবের স্মৃতির ভাড়া থেকে উপলব্ধি সংগ্রহ করে পটভূমি রচনা করতে পারেন ততই অভিনয় সত্য হয়। আর যখনই সেটা সত্য হয়ে ওঠে তখনই গভীর ও জটিল হয়।

অনেকে মহলা কথাটির মানে কী জানেন না? কারণ মহলা থেকে রিহার্সেল কথার সঙ্গে

বেশি পরিচিত। এই মহলা কিন্তু সংলাপ মুখস্থ করার জন্য বা কে কোথায় দাঁড়াবে বা কিভাবে ঘুরে যাবে এই সব তৈরি করার জন্য নয়। এই প্রক্রিয়ায় দুটি চরিত্রের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য তৈরি করে। যেমন যখন কোনো অভিনেতা একটি স্বামীর চরিত্রের অভিনয় করবে তখন এবং একটি অভিনেত্রী স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করবে তখন দুজনকেই পারস্পরিক চরিত্র সম্পর্কে একটা ভিন্নরূপ কল্পনা করে নিতে হবে। যে স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করবে তাকে স্বামীর চরিত্রের পাশাপাশি স্বামীর একটি বিশেষ রূপ কল্পনা করে নিতে হবে। স্বামীর চরিত্রে অভিনীত ব্যক্তিকেও স্বামীর পাশাপাশি স্বামীর রূপ কল্পনা করতে হবে। এই দুটি ভিন্ন প্রক্রিয়া সামঞ্জস্য বিধান করে মহলার প্রক্রিয়ায়। দুজন অভিনেতাই চেষ্টা করে একে অপরের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে। এই প্রক্রিয়াই সম্পর্কের যে ভিন্ন রূপ গড়ে ওঠে যাতে নট নটীরা একটা আবিষ্কারের শক্তি পায়। এইগুলো হল মহলার বিশেষ উদ্দেশ্য।

শম্ভু মিত্র বলেছেন—

“অন্য চরিত্রের সঙ্গে আবার কী সম্পর্ক হবে সেটা তো বাইরে থেকে অন্য কেউ শুকনো ভাবে বলে দিলে হয় না। অভিনেতার নিজের মধ্যে থেকে সেটা তৈরি হতে হয়।”^{১২}

আমরা জানি টরভাল্ড ছিলেন আত্মসর্বস্ব, অবিবেচক, অহঙ্কারী। কিন্তু তাতে করে অভিনয় করা যায় না। যখন কোনো নট ঐ চরিত্রে অভিনয় করবে তখন তাকে ঐ বৈশিষ্ট্যগুলি এমন ভাবে আত্মসাৎ করতে হবে, যাতে দর্শক ঐ লক্ষণগুলি তার মধ্যে আবিষ্কার করতে পারবে। আর নাট্যাভিনয়টা বোঝার জন্য কোনো মাস্টার থাকে না দর্শককে সেটা একাই করতে হবে। আমরা আগে একজন কালো বেঁটে, চোখ দুটো ভাঁটার মতো, ব্রু-জোড়া গোঁফের—ব্যক্তির বিবরণ পায়। এইটা কিন্তু Objective বিবরণ নয় এর একটি Impucation (বা তাৎপর্য) আছে। এই বর্ণনার মধ্যে দিয়ে পাঠক ঐ চরিত্রকে কিভাবে দেখবে তার খানিকটা পথ তৈরি হয়ে যাচ্ছে। নাটকের ক্ষেত্রে এমনটা হয় না। প্রত্যেক দর্শককে তার নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী বুঝে নিতে হবে ব্যক্তিটি কেমন।

আমরা যদি শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে তাকাই দেখব, অনেকের কাছে মুখস্থ করাটা প্রথম এক প্রধান প্রক্রিয়া। তারা বইয়ের কথার সঙ্গে জীবনের কথাটা মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করে না। বইয়ের কথাগুলো মুখস্থ করে দিতে পারলেই তাকে বিদ্বান বলে ছাপ মেরে দেওয়া হয়। এই সকল বিদ্বান লোকের ক্ষেত্রে নাট্যাভিনয় বোঝা খুব কষ্ট। কিন্তু যারা বিদ্বান বলে pretension পায় না তারা নাট্যাভিনয়টা ভালো বুঝতে পারে। যারা ছাপ মারা বিদ্বান তাদের ক্ষেত্রে বোঝা ভয়ানক কারণ সেখানে তাদের guardian থাকে না। নাটকটাকে নিজের বুদ্ধি ও উপলব্ধি দিয়ে বুঝতে হয়। সেই জন্য তারা তখন হাতড়ায় এই নাটক সম্পর্কে কে কী বলছে। নাটক সম্পর্কে যে যাই বলুক সেটা কিন্তু জোর করে আলোচনায় আরোপ করার কথাই নয়। এখনকার দিনে যারা রবীন্দ্রনাথ, শেকসপীয়র, ইবসেনের নাটকে অভিনয় করতে যায় তখন তারা নিজেদের মতো করে একটা মানে বের করে নেয় ওই নাটকের ওপর অভিনয় করে একটা নতুন quality সৃষ্টি করছে। সেটা খুব দুঃখের কারণ ঐ সকল লোকের বাড়াবাড়িতে ভালো দর্শক মারা যায়।

শম্ভু মিত্র আলোচনা সভায় তাঁর নিজের জীবনের কিছু অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন সেটি হল ‘গ্যালিলিওর জীবন’ নাটকটি অভিনয় হবার পর এক ব্যক্তি এসেছিল শম্ভু মিত্রের কাছে, একজনের মারফতে। লোকটিকে শিক্ষিত ও লেখে-টেকে বোধহয়। কোথাও পড়াতেন এ কথা তিনি বুঝেছিলেন। ব্যক্তিটি তাঁর কাছে ব্রেঘট সম্পর্কে কিছু জানতে চেয়েছিল তখন তিনি কি বলবেন একথা জানতে চান। তা শুনে ব্যক্তিটি বলেন ব্রেঘট যে অন্যরকম নাট্যকার সে সম্পর্কে যেন কিছু বলে। শম্ভু মিত্র এই অন্যরকম কথাটা শুনে অবাক হয়ে যান এবং কেমন অন্যরকম জানতে চাইলেন বলেন—

“ওই যে বুদ্ধিকে appeal করে, মানে আবেগ দিয়ে তো মানুষকে ভোলাতে চায় না।”^{১৩}

শম্ভু মিত্র ঐ ব্যক্তিকে বলেছেন—তাহলে রবীন্দ্রনাথ শেকসপীয়র, বার্নার্ড শ প্রমুখ ব্যক্তির শব্দ আবেগ দিয়ে লিখেছেন আর ব্রেখট বুদ্ধিকে appeal করে সেটা পূর্বে কেউ করেননি। লোকটি তাঁর কথা শুনে চুপ মেরে যান এবং পরে আবার বলেন—‘ব্রেখট এর লেখা তো অন্যরকম।’

এবং ‘Dall’s House’ আট গল্প আছে ‘Life of Gallileo’-তে তো নেই। তিনি তাঁকে বলেন গ্যালিলিওতেও আঁট গল্প আছে। তাকে তিনি আরো বলেন যদি আঁট গল্প একটা বৈশিষ্ট্য হয় তাহলে ‘রক্তকরবী’তেও আঁট গল্প আছে। সে ব্যক্তি স্বীকার করেছেন যে তা নাই। শম্ভু মিত্র তাকে বলেন—

“তা যদি না তা হলে তোমার তেমন লেখবার সাহস হবে যে এই ধরনের নাটকের যে রীতি এই যে ব্রেস্ট করবার অনেক আগে এরকম না আঁটো গল্পে নাটক লিখেছেন একজন বাঙালি Anticipating Brecht পারবে।”^{১৪}

তাঁর এই কথা শুনে ঘাবড়ে গিয়ে আবদারের সুরে বলেন—‘আপনি বলে দিন না।’

সমাজে কিছু মানুষ আছে যারা মাথা টাকে একটা appendage বলে মনে করে। কোনো সময় নিজের যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে কিছু বিচার করেন না। একজনের শোনা কথা অন্যজনকে গিয়ে বলে না বুঝে। এবং নিজেরাই অপদস্ত হয়। এই সকল ব্যক্তিদের জন্য শম্ভু মিত্র দুঃখ প্রকাশ করে বলেন—

“পৃথিবীটাতে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা যদি দেখতেই না শেখে, তা হলে আমরা যে বলছি আমাদের বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া চাই, জীবনকে বোঝা চাই সে সব হবে কী করে? কোথায় একটা গোলমাল ঘটে যাচ্ছে না?”^{১৫}

টরভান্ডকে দর্শকদের সামনে স্পষ্ট করতে হলে তাঁর আত্মসর্বস্ব অহঙ্কারী ইত্যাদি বিশেষণগুলিকে অভিনেতার নিজের মধ্যে আত্মসাৎ করতে হবে। তাঁকে সুদক্ষ যন্ত্রীর মতো সঠিক সুরটি দিয়ে বাজাতে হবে। আর একটা আশ্চর্যের জিনিস অভিনেতা নিজেই যন্ত্রী এবং নিজেই যন্ত্র হয়ে দুইয়ের ভূমিকা পালন করে। কিন্তু সে যে যন্ত্রের ভূমিকা পালন করে সে সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণা থাকে না। সে জানে না তাঁর অঙ্গভঙ্গিতে, সাধারণ প্রকাশভঙ্গিতে, কী অনুশঙ্গ বহন করে। তাঁকে কি কমিক দেখায় না গ্রাম্য দেখা সে সম্পর্কে কিছুই জানে না। আবার নাটকের সংলাপগুলোকে যথার্থ সুরে বলার জন্য যে স্বরলিপিটা হওয়া দরকার সেটা কিন্তু অভিনেতারা নিজেরা তৈরি

করে। কিন্তু সেটা সহ অভিনেতা বা অভিনেত্রী সকলের গলায় খাপ খাইয়ে তৈরি করতে হয়। কিন্তু শ্রোতা সেটা নিজের অজান্তে বুঝতে পারে কিরকম Harmony-এর মতো কাজ হচ্ছে। এমন ভাবে বাজাতে হবে যাতে দর্শক বিশ্বাস করে তাঁকে। কিন্তু এই বিশ্বাস করানো খুব কঠিন। শুধুমাত্র মহলা দিতে এটা সম্ভব হয় না। তাই অভিনেতারা যতক্ষণ জেগে থাকে ততক্ষণ সে তার তীব্র সচেতনতা ও অনুভূতি দিয়ে অন্ধকারে ডুব দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে বোঝার চেষ্টা করে। এটা সকল কলা শিল্পীর ক্ষেত্রেই ঘটে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে নাট্যটাকে জীবন্ত করে রাখে। রাখার পিছনে অভিনেতা-অভিনেত্রীর ভূমিকা অনেকটা বড়।

শব্দ মিত্র বলেছেন, সকল নাট্যকলার ক্ষেত্রে আছে মানুষ। সেটা কিন্তু বিমূর্ত মানুষ নয় রক্তমাংসে তৈরী মানুষ। যার সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক আছে। আছে নিজের সঙ্গে গোপন সম্পর্ক। আমরা যদি গভীরভাবে ভাবি তাহলে দেখতে পাব মহৎ নাট্যকলার প্রত্যেক চরিত্রের মধ্যে একটা জীবন দর্শন আছে। তারা এককভাবে জীবনকে দেখেছে এবং দেখাচ্ছে। প্রত্যেকটা চরিত্রই এক একটা গল্পের মতো। কিন্তু তাই বলে পুরো নাটকের একটা গল্প নয়। আমরা আলোচনার গোড়াতে দেখি সুবোধ ঘোষের খোঁজ করতে যে দুজন ব্যক্তি এসেছে তাদের ইতিহাস আমাদের জানা নেই। কিন্তু তাদের সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা আছে কিংবা একটা আন্দাজ আছে। ঐ লোক দুজনের সমাজ সম্পর্কে আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি আছে সেটাও বোঝা যায় এটাতে গল্পের যে বিশেষ অনুভব তৈরী হয় সেটা অনেকটা বড়। কোনো একটি বিশেষ ঘটনায় যদি কোনো ব্যক্তিকে আমরা দেখি তখন তাকে দেখা মাত্রই যেন তার সম্পর্কে আমরা সব কিছু বুঝে নিতে পারি। সেই বোঝাটা কিন্তু একটার পর একটা বোঝা নয় বিজ্ঞানীর বালেন স্পঞ্জের মতো বোঝা। যেন জল শোষার মতো একসঙ্গে অনেকগুলি স্তর শুষে নেওয়া। কিন্তু তাতে অনেক নাজানা স্তর থেকে যায়। এবং সেগুলি জেগে ওঠে নাড়া দেয়। যদি এভাবে দেখা যায় ‘রক্তকরবী’র মানুষগুলো সকলে জীবন্ত হয়ে উঠবে। আর নন্দিনী, মেজো সর্দার তারা ছোটো পরিধির মধ্যে থেকে সমাজের মধ্যে কিভাবে নিজেকে Adjust করছে সেটা বোঝা যায়।

এই সকল আলোচনার মধ্যে আমরা নির্দেশকের কাজটিকে এড়িয়ে যাচ্ছি। কিন্তু প্রশ্ন

হতে পারে কলা সৃষ্টিটা কি নির্দেশকের হাতে? এইটা শব্দ মিত্র এড়িয়ে গিয়েছেন। চলচ্চিত্রে দেখে সকলের মধ্যে একটা ধারণা আছে নির্দেশকরা অসীম ক্ষমতার অধিকারী। চলচ্চিত্রে অভিনেতারা কিভাবে কথা বলবে, সেটা কিভাবে দেখানো হবে এবং কোন Angle এ দেখানো হবে সেগুলি সবই ঠিক করে নির্দেশক। শুধু তাই নয় শুটিং এরপর কোন অংশ থাকবে কোন টুকু বাদ দেওয়া হবে সেটাও নির্দেশক করে থাকেন। কিন্তু মঞ্চ নাট্যে সেটা ঘটে না। কারণ মঞ্চনাট্যে অভিনয়টা সরাসরি দর্শকদের সামনে ঘটে। চলচ্চিত্রের মতো এখানে কোনো দৃষ্টিকোণ থাকে না। যে দর্শক যেখানে বসে থাকেন সেখান থেকেই সমস্তটা দেখে নেন। আর অভিনেতারা যখন নেপথ্য ছেড়ে মঞ্চে চলে যায় তখন আর সেখানে নির্দেশকের কোনো ভূমিকা থাকে না। তখন সবটাই অভিনেতাদের হাতে চলে যায়। মহলার সময় নট নটীরা কয়েকদিনের মধ্যে সমস্ত চরিত্রগুলোকে নিজের মতো তৈরি করে নেয়।

নির্দেশকের কাজ হচ্ছে ভেতর থেকে ভালো অভিনয়টাকে টেনে বার করে আনা। এখন ‘অন্য থিয়েটার’ বলে যেটা তৈরি হয়েছে সেখানে ভালো অভিনেতা তৈরি হয়নি। সেখানে একজন শিল্পী হিসাবে তৈরীর গুরুগিরি করেন আবার কেউ মাস্টার মশাই গিরি করেন। নির্দেশক যদি গুরুগিরির কাজ করেন তাহলে হয়তো অপটু অভিনেতারা পটু হয়ে উঠবে। কিন্তু গুরু বড় ক্ষতি করে। যদি নির্দেশকের কাজের পরিধি সম্পর্কে আলোচনা করি তাহলে দেখব প্রত্যেকটি অভিনেতাই শিল্পী। আগে অভিনেতার কাজ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তাতে বোঝা গিয়েছে উচ্চমানের শিল্পীদের নিয়েই যেন নির্দেশক কাজ করছে। কিন্তু বাস্তবটা ঠিক তা নয়। আদর্শ অবস্থায় নির্দেশক ও অভিনেতাদের মধ্যে কি সম্পর্ক তারা কিভাবে কাজ করেন এবং কোন স্তর থেকে কোন স্তরে যায়—এই সব আলোচনা শব্দ মিত্র বক্তৃতা সভায় আলোচনা করেন বায়বীয় লাগবে বলে। কারণ সূক্ষ্মতা সম্পর্কে ধারণা সকলের থাকে না। হয়তো এমন ব্যক্তি আছেন যারা নাট্যক্রিয়ার মনে যুক্ত তাদেরও এই ধারণা খুব স্পষ্ট নয়।

নাট্যকলার আর একটি বিশেষ অঙ্ক দৈহিক ভঙ্গি। সব ক্ষেত্রে একই রকম দৈহিক ভঙ্গি হয় না। শব্দ মিত্র আলোচনা সভায় অনেক বার দৈহিক ভঙ্গির কথা বলেছেন। সংলাপ অনুযায়ী

দৈহিক ভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। যেমন—সুজাতা বুদ্ধের সামনে এসে প্রণাম করছে প্রণামের এই ভঙ্গিটা অভিনেতাকে জানতে হবে এবং কেমন করে প্রকাশ করবে সেটাও জানতে হবে। নাটকে এই সকল ছোটো ছোটো জিনিস আছে যেগুলি চোখে পড়ে না কিন্তু এগুলির অবস্থান নাট্যকলার ক্ষেত্রে যথেষ্ট।

নাট্যকলার আর একটা জিনিস হল সাজানো বা Make up ও Dress up এখানে শম্ভু মিত্র ‘পুতুল খেলা’ নাটকের একটি ঘটনা তুলে ধরেছেন। যেমন—নরা তার স্বামীর দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে কিন্তু তার মধ্যে একটা বড় গোছের ভাব দেখা যায়। তার স্বামী সামনে বসে না। এই রকমভাবে চলে নাটকটা। শেষে দেখা যায় এরা যেখানে বসে আছে তার স্বামী তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে আছে হয়তো বা নীচে এসে বসেন। এই যে সম্পর্কটা পাল্টিয়ে গেছে, আর এই রকম মানেটা অভিনেতাদের সাজানোর মধ্যে দিয়ে তৈরি হয়ে যায়। শম্ভু মিত্র আরো উদাহরণ দিয়েছেন যেমন—যেখানে মা ও স্ত্রী চরিত্রে একই ব্যক্তি অভিনয় করছে, সেখানে সে যখন স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে তখন তার বসাটা একরকম। আবার যখন ঐ অভিনেতা মার ভূমিকায় অভিনয় করছে তখন তাদের অভিনয় ও সাজগোজ দেখে মা ও ছেলের সম্পর্কটা সকলের সামনে চলে আসে। এ রকম অনেক ছোটো ছোটো জিনিস অভিনয়ে তৈরী হয়। সেগুলি শুধুমাত্র নাটক আর অভিনয়ে তৈরী হয়। সেগুলি কোনো দাগ দিয়ে দেখানো দরকার হয় না। বুদ্ধিমান দর্শকেরা দেখামাত্রই সেটা অনুভব করে ফেলেন।

একটা নাটকের মধ্যে দিয়ে আগের আলোচনার বিষয়গুলি ছাড়াও আরো অনেক জিনিস থাকে যেগুলি সব সম্ভব নয় সেগুলিও নাটকে প্রকাশ পায়। তিনি ‘রক্তকরবী’ নাটকের উদাহরণ দিয়ে একটু আধটু বলেছেন। যেমন—নন্দিনীর সঙ্গে একটা কিশোর বয়সের ছেলে কথা বলছে এবং বলছে সে নন্দিনীকে এতটা ভালো বাসে, যে সকল বাধা বা মারের মুখের ওপর দিয়ে গিয়ে নন্দিনীর জন্য ফুল এনে দেবে। কিন্তু সে তার বারন কিছুতেই শোনে না। তার পর অধ্যাপকের বৃদ্ধ গলার আওয়াজ শোনা যায় এবং বৃদ্ধ কথা বলে চলে যাবার পরে গোকুল এর ঘ্যান ঘেনে গলা শোনা যায়। আবার রাজার খুব জোরাল গলা শোনা যায়—‘কে? নন্দা?’—এই

নাটকের ভূমিকা দিয়ে প্রথম সূত্রপাত হয় এবং তার পাশাপাশি চারটে চরিত্র আসা ও যাওয়া করে। এই চরিত্রদের মাঝখানে অবস্থান করছে নন্দিনীর কণ্ঠ। আমরা যদি লক্ষ্য করি দেখব প্রত্যেকটা কণ্ঠ আলাদা আলাদা করে আছে এবং সেগুলি যেন ঠিক যন্ত্রের মতো কাজ করছে। প্রত্যেকের কণ্ঠস্বরগুলি মিলে মিশে যেন একটা Orchestration বা বাদক দল তৈরী হয়ে যাচ্ছে। এই রকম অনেক ছোটো ছোটো জিনিস নাট্য অভিনয়ের সময় তৈরী হয়। যার জন্য অভিনেতাদের আলাদা কোন প্রস্তুতি নিতে হয় না। এই Orchestration গুলি অনেক সময় দর্শকদের সচেতন জ্ঞানের মধ্যে আসে না। এগুলি অচেতনভাবে তাদের মনের ভেতর প্রবেশ করে এবং এর কাজ একটা হয় এবং ফল আর একটা হয়। আর মহৎ শিল্পকলাকেই চেতন ও অবচেতন নানা স্তরের মধ্যে আমরা দেখতে পায়। আর এগুলি একত্রে মনকে নাড়া দেয়। এটাকেই বলে নাট্যকলা।

বক্তৃতার শেষে তিনি বলেন অল্পের মধ্যে নাট্যকলা সম্পর্কে এটাই তার বক্তব্য। আর এই বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে নাট্যকলার ধারণাটা তিনি স্পষ্ট করেছেন।

তথ্যসূত্র:

অভিনয়-নাটক-মঞ্চ

- ১। ‘অভিনয় নাটক মঞ্চ’, সপ্তর্ষি প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ. ৯
- ২। প্রস্তাবনা, পৃ. ২১
- ৩। যুদ্ধোত্তর যুগে বাংলা মঞ্চ সংকট, পৃ. ২৩-২৪
- ৪। তদেব, পৃ. ২৫
- ৫। তদেব, পৃ. ২৭
- ৬। তদেব, পৃ. ২৭
- ৭। তদেব, পৃ. ২৯
- ৮। কয়েকটি অভিনয়ের জন্মকথা, পৃ. ৪২
- ৯। তদেব, পৃ. ৫১
- ১০। তদেব, পৃ. ৫২
- ১১। পপুল্যারিটি, পৃ. ৫৩
- ১২। তদেব, পৃ. ৫৫
- ১৩। তদেব, পৃ. ৫৬
- ১৪। তদেব, পৃ. ৫৭

- ১৫। তদেব, পৃ. ৬০
- ১৬। দর্শকের দায়িত্ব, পৃ. ৬৩
- ১৭। তদেব, পৃ. ৬৩
- ১৮। তদেব, পৃ. ৬৩-৬৪
- ১৯। তদেব, পৃ. ৬৪
- ২০। তদেব, পৃ. ৬৫
- ২১। চরিত্রচিত্রণ স্ট্যানিস্ল্যাভস্কি থেকে, পৃ. ৬৬
- ২২। তদেব, পৃ. ৭০
- ২৩। তদেব, পৃ. ৭০
- ২৪। তদেব, পৃ. ৭১
- ২৫। তদেব, পৃ. ৭১
- ২৬। তদেব, পৃ. ৭২
- ২৭। আন্দোলনের প্রয়োজন, পৃ. ৭৩
- ২৮। তদেব, পৃ. ৭৪-৭৫
- ২৯। তদেব, পৃ. ৭৫
- ৩০। তদেব, পৃ. ৭৬
- ৩১। তদেব, পৃ. ৮০
- ৩২। তদেব, পৃ. ৮৩
- ৩৩। তদেব, পৃ. ৮৪
- ৩৪। তদেব, পৃ. ৮৫
- ৩৪ক। তদেব, পৃ. ৮৬
- ৩৫। তদেব, পৃ. ৯১
- ৩৬। অভিনয় কী, পৃ. ৯৪
- ৩৭। তদেব, পৃ. ৯৫
- ৩৮। তদেব, পৃ. ৯৫
- ৩৯। তদেব, পৃ. ৯৭
- ৪০। তদেব, পৃ. ১০০
- ৪১। তদেব, পৃ. ১০১-১০২
- ৪২। তদেব, পৃ. ১০৭
- ৪৩। তদেব, পৃ. ১০৯
- ৪৪। তদেব, পৃ. ১১৫-১১৬
- ৪৫। রক্তকরবী, পৃ. ১১৭-১১৮
- ৪৬। তদেব, পৃ. ১২১
- ৪৭। তদেব, পৃ. ১২৪

- ৪৮। তদেব, পৃ. ১২৫
 ৪৯। তদেব, পৃ. ১২৫
 ৫০। তদেব, পৃ. ১২৬
 ৫১। তদেব, পৃ. ১২৭
 ৫২। তদেব, পৃ. ১৩০
 ৫৩। তদেব, পৃ. ১৩১
 ৫৪। তদেব, পৃ. ১৩৩
 ৫৫। তদেব, পৃ. ১৩৫
 ৫৬। তদেব, পৃ. ১৩৫

সম্মার্গ সপর্ষা

- ১। ‘সম্মার্গ সপর্ষা’, শম্ভু মিত্র, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, মার্চ ১৩৯৬

নিবারণ পণ্ডিত (১৯৪৯)

- ১। তদেব, পৃ. ১
 ২। তদেব, পৃ. ১
 ৩। তদেব, পৃ. ২
 ৪। তদেব, পৃ. ৩
 ৫। তদেব, পৃ. ৪
 ৬। তদেব, পৃ. ৪

মাহেশে (১৯৪৯)

- ১। তদেব, পৃ. ৬
 ২। তদেব, পৃ. ৬
 ৩। তদেব, পৃ. ৮
 ৪। তদেব, পৃ. ৮

পৃথ্বী থিয়েটার (১৯৫০)

- ১। তদেব, পৃ. ১১

রক্তকরবী প্রসঙ্গে

- ১। তদেব, পৃ. ২০
 ২। তদেব, পৃ. ২০-২১
 ৩। তদেব, পৃ. ২১
 ৪। তদেব, পৃ. ২১
 ৫। তদেব, পৃ. ২১

সমস্যার একটা দিক (১৯৫৬)

- ১। তদেব, পৃ. ২৪
 ২। তদেব, পৃ. ২৪

৩। তদেব, পৃ. ২৫

ইতি কর্তব্য (১৯৫৭)

১। তদেব, পৃ. ৩৮

২। তদেব, পৃ. ৩৮

৩। তদেব, পৃ. ৩৯

৪। তদেব, পৃ. ৪০

৫। তদেব, পৃ. ৪০

৬। তদেব, পৃ. ৪১

৭। তদেব, পৃ. ৪২

৮। তদেব, পৃ. ৪২

৯। তদেব, পৃ. ৪২

অন্যোপায়

১। তদেব, পৃ. ৪৩

২। তদেব, পৃ. ৪৩

মধুসুজ্জার ভূমিকা (১৯৫৮)

১। তদেব, পৃ. ৪৭

২। তদেব, পৃ. ৪৭

আমাদের আকাঙ্ক্ষা ও আমরা (১৯৮৫)

১। তদেব, পৃ. ৪৯

২। তদেব, পৃ. ৫০

৩। তদেব, পৃ. ৫০

৪। তদেব, পৃ. ৫১

৫। তদেব, পৃ. ৫২

৬। তদেব, পৃ. ৫২

নবনাট্যের বিচার

১। তদেব, পৃ. ৫৩

২। তদেব, পৃ. ৫৩-৫৪

৩। তদেব, পৃ. ৫৪

৪। তদেব, পৃ. ৫৪

৫। তদেব, পৃ. ৫৪-৫৫

৬। তদেব, পৃ. ৫৫

৭। তদেব, পৃ. ৫৫

৮। তদেব, পৃ. ৫৫-৫৬

৯। তদেব, পৃ. ৫৬

১০। তদেব, পৃ. ৫৬

১১। তদেব, পৃ. ৫৬

১২। তদেব, পৃ. ৫৭

১৩। তদেব, পৃ. ৫৮

কিছু পুরনো কথা (১৯৬৩)

১। তদেব, পৃ. ৬০

২। তদেব, পৃ. ৬০

৩। তদেব, পৃ. ৬১

৪। তদেব, পৃ. ৬৩

৫। তদেব, পৃ. ৬৩

৬। তদেব, পৃ. ৬৩

একটি আলোচনা (১৯৫৩ / ১৯৬৪)

১। তদেব, পৃ. ৬৪

২। তদেব, পৃ. ৬৪

৩। তদেব, পৃ. ৬৫

৪। তদেব, পৃ. ৬৬

৫। তদেব, পৃ. ৬৬

৬। তদেব, পৃ. ৬৭

৭। তদেব, পৃ. ৬৮

৮। তদেব, পৃ. ৬৮

৯। তদেব, পৃ. ৬৮

১০। তদেব, পৃ. ৭০

১১। তদেব, পৃ. ৭০

১২। তদেব, পৃ. ৭০

১৩। তদেব, পৃ. ৭১

১৪। তদেব, পৃ. ৭২

ইয়োকাস্তে

১। তদেব, পৃ. ৭৩

২। তদেব, পৃ. ৭৩

৩। তদেব, পৃ. ৭৩

৪। তদেব, পৃ. ৭৬

৫। তদেব, পৃ. ৭৬

একটি অন্বেষণে (১৯৬৫)

১। তদেব, পৃ. ৮৪

- ২। তদেব, পৃ. ৮৪
- ৩। তদেব, পৃ. ৮৫
- ৪। তদেব, পৃ. ৮৫
- ৫। তদেব, পৃ. ৮৫
- ৬। তদেব, পৃ. ৮৫
- ৭। তদেব, পৃ. ৮৬
- ৮। তদেব, পৃ. ৮৭
- ৯। তদেব, পৃ. ৮৭

কিছু স্মরণীয় অভিনয়

- ১। তদেব, পৃ. ৮৮
- ২। তদেব, পৃ. ৮৯
- ৩। তদেব, পৃ. ৯০
- ৪। তদেব, পৃ. ৯০

ব্রেখট প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা (১৯৬৫)

- ১। তদেব, পৃ. ৯৬
- ২। তদেব, পৃ. ৯৬
- ৩। তদেব, পৃ. ৯৬
- ৪। তদেব, পৃ. ৯৬
- ৫। তদেব, পৃ. ৯৭
- ৬। তদেব, পৃ. ৯৮
- ৭। তদেব, পৃ. ৯৮-৯৯

শিশিরকুমারের প্রয়োগকলা সম্পর্কে

- ১। তদেব, পৃ. ১০০
- ২। তদেব, পৃ. ১০২

ব্রেখটের থিয়েটার (১৯৬৭)

- ১। তদেব, পৃ. ১০৩
- ২। তদেব, পৃ. ১০৫

‘রক্তকরবী’তে সঙ্গীত প্রয়োগ

- ১। তদেব, পৃ. ১০৮
- ২। তদেব, পৃ. ১০৯
- ৩। তদেব, পৃ. ১১০

ন্যাশনাল থিয়েটার

- ১। তদেব, পৃ. ১১১
- ২। তদেব, পৃ. ১১১-১১২

- ৩। তদেব, পৃ. ১১২
- ৪। তদেব, পৃ. ১১৩
- ৫। তদেব, পৃ. ১১৪
- ৬। তদেব, পৃ. ১১৪
- ৭। তদেব, পৃ. ১১৪-১১৫
- ৮। তদেব, পৃ. ১১৮-১১৯
- ৯। তদেব, পৃ. ১১৯

প্রেমের পরিশ্রম (১৯৬৮)

- ১। তদেব, পৃ. ১২০
- ২। তদেব, পৃ. ১২২
- ৩। তদেব, পৃ. ১২৪
- ৪। তদেব, পৃ. ১১২৪

একত্র অথচ স্বাধীন হওয়ার সভ্যতা (১৯৬৯)

- ১। তদেব, পৃ. ১২৫
- ২। তদেব, পৃ. ১২৬

বাংলা মঞ্চ ও অভিনয়ের বিবর্তন-রেখা

- ১। তদেব, পৃ. ১২৭
- ২। তদেব, পৃ. ১২৭-১২৮
- ৩। তদেব, পৃ. ১২৮
- ৪। তদেব, পৃ. ১২৮
- ৫। তদেব, পৃ. ১২৯
- ৬। তদেব, পৃ. ১৩০
- ৭। তদেব, পৃ. ১৩১
- ৮। তদেব, পৃ. ১৩২
- ৯। তদেব, পৃ. ১৩৩
- ১০। তদেব, পৃ. ১৩৪
- ১১। তদেব, পৃ. ১৩৪
- ১২। তদেব, পৃ. ১৩৭
- ১৩। তদেব, পৃ. ১৩৮
- ১৪। তদেব, পৃ. ১৪০
- ১৫। তদেব, পৃ. ১৪১
- ১৬। তদেব, পৃ. ১৪৩
- ১৭। তদেব, পৃ. ১৪৬
- ১৮। তদেব, পৃ. ১৪৮

১৯। তদেব, পৃ. ১৪৯

২০। তদেব, পৃ. ১৫০

ব্রাত্যের স্বপ্ন (১৯৭১)

১। তদেব, পৃ. ১৫২

২। তদেব, পৃ. ১৫৩

যা দেখেছি (১৯৭২)

১। তদেব, পৃ. ১৫৪

২। তদেব, পৃ. ১৫৫

৩। তদেব, পৃ. ১৫৫

৪। তদেব, পৃ. ১৫৬

৫। তদেব, পৃ. ১৫৭

৬। তদেব, পৃ. ১৫৮

পিতৃতর্পণ (১৯৭২)

১। তদেব, পৃ. ১৬০

২। তদেব, পৃ. ১৬১

৩। তদেব, পৃ. ১৬১

৪। তদেব, পৃ. ১৬১

৫। তদেব, পৃ. ১৬৪-১৬৫

কীভাবে রবীন্দ্রনাথে পৌঁছানো গেল

১। তদেব, পৃ. ১৭৩

২। তদেব, পৃ. ১৭৪

৩। তদেব, পৃ. ১৭৫

৪। তদেব, পৃ. ১৭৫

৫। তদেব, পৃ. ১৭৫

৬। তদেব, পৃ. ১৭৭

৭। তদেব, পৃ. ১৭৭

৮। তদেব, পৃ. ১৮১

৯। তদেব, পৃ. ১৮১

১০। তদেব, পৃ. ১৮১

১১। তদেব, পৃ. ১৮২

১২। তদেব, পৃ. ১৮৩

সম্পত্তি (১৯৮৩)

১। তদেব, পৃ. ১৮৪

২। তদেব, পৃ. ১৮৪

- ৩। তদেব, পৃ. ১৮৫
৪। তদেব, পৃ. ১৮৫-১৮৬
৫। তদেব, পৃ. ১৮৬
৬। তদেব, পৃ. ১৮৭

মহর্ষি

- ১। তদেব, পৃ. ১৯১
২। তদেব, পৃ. ১৯১
৩। তদেব, পৃ. ১৯১
৪। তদেব, পৃ. ১৯২
৫। তদেব, পৃ. ১৯৩
৬। তদেব, পৃ. ১৯৪
৭। তদেব, পৃ. ১৯৪

শিশিরকুমার

- ১। তদেব, পৃ. ১৯৫
২। তদেব, পৃ. ১৯৫
৩। তদেব, পৃ. ১৯৫
৪। তদেব, পৃ. ১৯৬

গঙ্গাদা

- ১। তদেব, পৃ. ১৯৭
২। তদেব, পৃ. ১৯৮
৩। তদেব, পৃ. ১৯৮
৪। তদেব, পৃ. ১৯৮

পৃথ্বীরাজজী

- ১। তদেব, পৃ. ১৯৯
২। তদেব, পৃ. ১৯৯
৩। তদেব, পৃ. ১৯৯
৪। তদেব, পৃ. ২০০

বটুকদা বিজন ও আমি

- ১। তদেব, পৃ. ২০২
২। তদেব, পৃ. ২০২

বিজন

- ১। তদেব, পৃ. ২০৪
২। তদেব, পৃ. ২০৪

- ৩। তদেব, পৃ. ২০৪
৪। তদেব, পৃ. ২০৪

কাকে বলে নাট্যকলা

- ১। 'কাকে বলে নাট্য কলা', শম্ভু মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৯১, পৃ. ১২
২। তদেব, পৃ. ১৫
৩। তদেব, পৃ. ১৬
৪। তদেব, পৃ. ১৮
৫। তদেব, পৃ. ২০
৬। তদেব, পৃ. ২২
৭। তদেব, পৃ. ২৯
৮। তদেব, পৃ. ২৯
৯। তদেব, পৃ. ৩২
১০। তদেব, পৃ. ৩৩
১১। তদেব, পৃ. ৩৭
১২। তদেব, পৃ. ৪৩
১৩। তদেব, পৃ. ৪৬
১৪। তদেব, পৃ. ৪৭
১৫। তদেব, পৃ. ৪৭